LION FEUCHTWANGER

রচিত জার্মান উপন্যাস

SIMONE

গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

অন্ধকার দিন

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স : কলিকাতা-১৪

প্রকাশক—মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
৫১, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা-১৪
মুদ্রাকর—প্রফুল্লকুমার বসু
দি প্রিন্টিং হাউস
১২৪ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬।
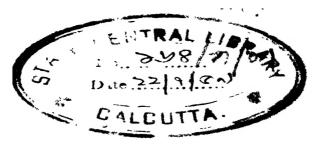
প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ১৩৬০

॥ দাম— সাড়ে চার টাকা ॥

প্রচ্ছদ শিল্পী : মণীন্দ্র মিত্র
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউ প্রাইমা প্রেস
ব্লক : ক্যালকাটা ফটোটাইপ স্টুডিও

॥ অন্ধকার দিন ॥

এই লেখকের

উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়

কালোরাত

একাকিনী নায়িকা

অগ্নিরথের সারথি

কান্নাহাসির দোলা

স্বপ্ন দেখা মানুষ

গল্প

নির্জন গৃহকোণে

যথাপূর্বং

সেই মেয়েটি

লাল-নীল মাছ

অনুবাদ

বিপ্লবী যৌবন

ওয়ান ওয়ার্ল্ড

মাদার রাশিয়া

ডোরিয়ান গ্রের ছবি

তুলি ও রঙ

প্রথম খণ্ড

প্রস্তুতি

উৎসর্গ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

পরিচিতি

ডাঃ লিঅন ফয়েটভানগার প্রসিদ্ধ জার্মান উপন্যাসকার। ১৮৮৪-র ৭ই জুলাই ম্যুনিকের ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম। বার্লিন ও ম্যুনিকে দর্শন অধ্যয়নন্তর নাটক, কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'জু স্যুস্', 'জোসেফস' আর 'আগলী ডাচেস' বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৩৩-এ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে জার্মান অধিকারের পর অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থায় আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। 'SIMONE'— [উচ্চারণ সীমঁ বা সীমা] যুদ্ধ ও অবরোধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় রচিত। সীমা কালের সীমানা পার হয়ে মিশেছে পাঁচশো বছর আগেকার বিপ্লবী নায়িকা জোন অব আর্কের জীবনে।

শরণাগতের দল

আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সংকীর্ণ গলিপথ সহসা বাঁক নিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। এইটুকু পথ শেষ করার জন্ম সীমার প্রত্যাশাভরা মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। বড় রাস্তার চৌমাথায় গতকাল সর্বপ্রথম ও শরণাগতদের মিছিল লক্ষ্য করেছিল, আজ এতক্ষণে তারা হয়ত ছোট খাটো গলি ঘুঁজির ভিতর ঢুকে পড়েছে!

তিন সপ্তাহ ধরে এই শরণাগতদের কথা শোনা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে আসছিল শুধু ডাচ আর বেলজিয়ানরা, এখন উত্তর ফ্রান্সের লোকেরাও অগ্রগামী শক্রসৈন্যের হাত থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চলে আসছে—আসছেত' আসছেই। সারা বার্গেণ্ডী শহরটাইত' এখন এই দুর্গত শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। প্রতিদিনকার মতো গতকাল যখন সাইকেলে বাজার যাচ্ছিল সেই সময় সীমাকে অতিকষ্টে ভিড়ের ভিতর পথ করে নিতে হয়েছে—আর আজ ত' সে সাইকেল্ বাড়িতেই রেখে এসেছে।

সীমা প্লানকার্ড্ যখন প্রথম এই শরণাগতদের কথা শুনেছিল তখন ওর কল্পনাপ্রবণ মনে একদল ভীত, সন্ত্রস্ত, পলায়মান লোকের ছবি জেগে উঠেছিল, সব বিষয়েই তাদের ব্যস্ততা আর ভয়। গত কয়েকদিনে যা দেখেছে তার ভিতর অবশ্য কিছু পরিমাণে স্বাভাবিকত্ব থাকলেও ভয়ংকরত্ব আছে। এই কথাই বারবার ওর মনে উদয় হয়েছে, ওকে উৎপীড়িত করে তুলেছে, রাতে ওর চোখে এতটুকু ঘুম নেই। যতবার শহরে যেতে হয়েছে ততবারই এই করুণ দৃশ্য সম্পর্কে মনে একটা

আতঙ্কের ভাব জেগেছে, কিন্তু প্রতিদিনই করুণা ও কোমলতায় বিগলিত হয়ে উৎকণ্ঠ আগ্রহে সীমা ওদের দেখেছে।

এতক্ষণে ও বাঁকের মুখে এসে পৌঁছেচে, রাস্তার কিছু অংশ এইখান থেকে দেখা যায়···অবহেলিত সরু পথ, চিরদিনই জনহীন ও পরিষ্কার, ও পথে মাত্র ছটি-বাড়িওলা পার্বত্যগ্রাম নোইরে ভিন্ন আর কোথাও যাওয়া যায় না। আজ কিন্তু যা ভয় করা গিছ্‌ল তাই হয়েছে—এ পথেও মানুষের ভিড়। বিশাল জনারণ্য এই পথেও এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

সীমা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল—পনের বছরের মেয়ে, সুন্দর দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, পরণে ফিকে সবুজ রঙের ডোরা কাটা ছিটের পোশাক, বাজার করবার সময় এই পোশাকটাই ও পরে থাকে। মুখঢাকা একটি বড় বেতের ঝুড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটানো, হাত ও পায়ের সুঠাম অনাবৃত অংশ পোশাকের বাইরে বেরিয়ে আছে সীমার চওড়া তামাটে মুখখানি ছাইরঙের চুলে ঘেরা। গভীর নীচু অথচ প্রশস্ত কপালের নীচে এক জোড়া কালো চোখ, ধূলিধূসর পথে যা কিছু বিচরণশীল সীমা পরম আগ্রহভরে সেই চোখে তাই দেখে। সেই পরিচিত দৃশ্য, মানুষ ও যানবাহনের হতাশভরা মিছিল—গৃহস্থালীর টুকীটাকী জিনিষপত্র বোঝাই করে গাড়ির পর গাড়ি চলেছে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ-শীল বিমানের মেশিনগানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে মোটর গাড়ির ছাদে বিছানার গদি বিছানো হয়েছে, পরিশ্রান্ত মানুষ আর পশু একই ভাবে, একই সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে চলেছে।

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে সুগঠিত ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে সীমা দেখ্‌ছে এই দৃশ্য। মেয়েটিকে সুন্দরী বলা অবশ্য ঠিক হবেনা, তবে ওর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকুল সুদৃঢ় মুখভঙ্গী আর কঠিন চোয়াল আর সুস্পষ্ট বার্গেণ্ডীয় নাক চেয়ে দেখার মতো। পুরো একমিনিট—তারও বেশীকাল ধরে,

অপরাহ্ণ বেলার উত্তাপ ও ধূলার ভিতর দাঁড়িয়ে সীমা এই পলাতকদের দেখতে লাগল।

অবশেষে ওকে পাশ কাটিয়ে সরে আস্‌তে হ'ল। অনেক কাজ ওর--মাদাম অনেকগুলি কাজের ভার ওর ওপর দিয়েছেন। প্লানকার্ড পরিবারের আবাসগৃহ "ভিলা মন রেপোয়" সব রকম জিনিষ মজুত রাখতে হবে, তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আর দু তিন দিনের ভিতর বাজার হাট করা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই কারণেই মাদাম সীমাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে তালিকা করে দিয়েছেন তা আকারে দীর্ঘ। এই উত্তেজনা ও হট্টগোলের ভিতর সব কাজগুলি সারা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না। এই দৃশ্যের ভিতর আর আটক না থেকে সীমা দ্রুত পদক্ষেপে সোজা শহরের দিকে চল্‌ল।

সরু গলিটা যেখানে শেষ হয়ে ৬নং রুটে এসে পড়েছে, সীমা, সেইখানে এসে পৌঁছল। সেণ্ট মার্টিনের পার্বত্য কেন্দ্রের পাশে অর্ধবৃত্তাকারে এই পথটি ঘুরে গেছে। এইখানটিতে যে দৃশ্য সীমার চোখে পড়ল, গত কয়েক দিনের ভিতর এতখানি করুণ দৃশ্য আর সে দেখেনি। পথের মোড়ে ঘুর্‌তে গিয়ে একদল মোটর দাঁড়িয়ে গেছে, অন্যদিক থেকে আর এক সার মোটর এসে পথ জুড়ে আছে, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকার, বাইসিকল, গাধা, পথচারী সবাই মিলে একটা অদ্ভুত খিচুড়ি পাকিয়েছে—অসহায় জনগনের অন্তহীন মিছিল। কেউ কিন্তু একটুও কটু কথা বলছেনা, এই জটিল গ্রন্থি খোলার চেষ্টা করছে না, অস্বস্তিকর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সবাই সেই উত্তপ্ত ধূলিমলিন পথের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে,—ছেলেবুড়ো, নর ও নারী, সামরিক বে সামরিক, আহত ও অক্ষত—সবাই স্বেদাক্ত কলেবরে হতাশাভরে বসে আছে।

গভীর করুণাভরা চোখ মেলে সীমা সেই ধূলিমলিন, নিশ্চল

ও বিস্ময়কর নীরব মিছিলের দিকে চেয়ে রইল, এই প্রাণহীন জনমণ্ডলী যেন একটি বিশাল ছবির অংশ বিশেষ। সীমার করুণার্দ্র মুখখানিতে যেন বয়সের ছাপ পড়েছে। পনের বছরের ভিতরেই সে অনেকখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; ভাবাবেগ সংবরণ করে নিজের কাজ সেরে নেবার কথা স্মরণ করে এই জনতা ভেদ করে রাস্তা পার হবার জন্য সীমা সচেষ্ট হ'ল। ঝুড়িটি হাতে করে তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গাড়ির শেষ প্রান্তের ভিতর দিয়ে আরোহীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে, সীমা অতি পথটি অতিক্রম করল—ওকে তারা লক্ষ্য না করে স্থাণুর মতো নীরবে বসে গরমে ধুঁকতে লাগল।

অবশেষে রাস্তা পার হয়ে ও প্রাচীন পাথরের পথ ধরলো। নবাগতের পক্ষে এ পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এই পথ এঁকে বেঁকে সর্পিল ভঙ্গীতে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে—এইখান থেকে এই প্রাচীন শহর বেষ্টনকারী দুর্গ-প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ও নিয়ত পরিবর্তনশীল তরুবীথিকা দেখা যায়। প্রতি বাঁকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সেরীণ নদীর তটভূমি দেখা যায়। উজ্জ্বল ও মনোহর দৃশ্যপট; বিস্তীর্ণ তটভূমি জুড়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জ জলপাই ও বাদাম গাছের ঝোপ প্রতি শৈলশিখরে কিছু না কিছু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান, আর পূর্ব দিকে ঘন অরণ্যাবৃত গর্বোন্নত পাহাড়। সুসময়ে অসংখ্য যাত্রী এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে আসত! সীমার কাছে যতই পরিচিত ও পুরাতন হোক না কেন, চিরদিনই সে গভীর মনোযোগ সহকারে রসবোদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে এই দৃশ্যাবলী দেখেছে। কিন্তু আজ আর এ সবের জন্য ওর মনে এতটুকু অনুভূতি নেই। আজ সে বড় রাস্তার উপর সদ্য-দেখা দৃশ্য ভুলে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, পাহাড়ের কংকরকঠিন পথের বিশৃঙ্খলার ভিতরে অখণ্ড মনঃসংযোগ করতে হ'ল, এই কারণে সীমা মনে স্বস্তি অনুভব করলো। এক এক জায়গায় ওকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছে, অত বড় ঝুড়ি নিয়ে

সে কার্য করা বড় সহজ নয়। এর পরে শহরে এলে সীমা পা-জামা পরে আসবে। অনেকে আবার এই যুদ্ধকালে মেয়েদের পক্ষে পা-জামা পরাটা অন্যায় মনে করেন, মাদাম নিজেই পাজামা পরা অপছন্দ করেন।

এইবার সীমা ওপরে পৌঁছে পোর্ট সেণ্ট-লাজার দিয়ে শহরের ভিতর ঢুকে পড়ল। গির্জার সামনেকার সরকারী পার্ক ওকে পার হতে হল। অন্য সময় এই ছোট্ট জায়গাটুকু জনশূন্য ও শান্তিপূর্ণ থাকে। মাঝে মাঝে ভ্রমণকারী যাত্রীদল এইখানে দাঁড়িয়েই গির্জাঘরের বিখ্যাত পাথরের মূর্তিগুলি দেখতেন!

আজ পার্কটি ভিড়ে পরিপূর্ণ। অনেক শরণাগত ওপরে উঠে এসেছে, তবে মূর্তির দিকে তাদের লক্ষ্য নেই; ওরা পেট্রোল, খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খুঁজছে। এইখানে ও অন্যত্র সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরস্পরের ভিতর বিনিময় করা হচ্ছে। তীব্র ও তিক্ত ওদের অভিজ্ঞতা। প্রায় সকলেরই সব কিছু নেই, আর সেণ্ট-মার্তিনেও কিছু পাওয়া যায় না, প্রায় সকলেরই মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে অল্পের জন্য অব্যাহতি মিলেছে। এইখানে এসে ওরা বসে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছে, আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শহরের অধিবাসীবৃন্দ (তার ভিতর সীমাও আছে) ওদের কাহিনী শুনছে।

পলাতকদের মন্দগতি মিছিলের ওপর জার্মান বিমান বহর বোমা ফেলেছে—বার বার জার্মান আক্রমণের মুখে ওদের পড়তে হয়েছে। যানবাহনবহুল পথের চৌমাথায়, ব্রীজের ওপর, বা রেল রাস্তার লেভেল-ক্রসিং-এর মুখে সর্বত্রই জার্মানরা ওদের বিব্রত করেছে। ওদের মধ্যে অনেকে হতাশাভরে বলল..."আমরা পালিয়ে এসে বড় ভুল করেছি, বাড়িতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে জার্মান বোমার জন্য প্রতীক্ষা করা ভয়ংকর বটে, কিন্তু পথের ভয়ংকরত্ব দশগুণ বেশী। এই পলায়নের সব কিছুই লোমহর্ষক।"

সীমা শুনতে লাগল, তবে এ সব কথা ও আগেও শুনেছে। প্রাচীন কালের সুন্দর বাড়ি "হল অফ্ জাস্টিস" ছাড়িয়ে সীমা চলল,—সে সহসা সেই প্রাসাদের দরজা দিয়ে লক্ষ্য করল, মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপর অসংখ্য পলাতক অসহায় ভঙ্গীতে ঘন হয়ে শুয়ে আছে। এ দৃশ্য থেকে সীমা ওর চোখ ফিরিয়ে নিল, অন্তরে একটা অপরাধীর ভাব নিয়ে পথের ধারের বাড়িগুলির গা ঘেঁষে সীমা রু ছ্য সভিনির দিকে চলল।

চমৎকার প্রাচীনবাড়িওয়ালা শহরের প্রাচীন অংশের এই সংকীর্ণ পথ রু ছ্য সভিনি শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। শরণাগতেরা দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দোকানে কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপন ঝুল্ছে, 'রুটী নেই', 'মাংস নেই', পেট্রোল নেই', 'তামাক নেই'। প্রায় সব দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ, যে সব দোকানের একটা আধটা পাল্লা খোলা আছে সেখানে কোনো বিজ্ঞাপনচিত্র নয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু সাজানো রয়েছে, যেমন চীনে মাটির 'লবণদানি', কিংবা বড় লণ্ঠন, তার ভিতরের বাতি পাওয়া যায় না। মঃ আর্মন্দের 'নাপিতের দোকানে' গন্ধ-দ্রব্যের একটি প্রকাণ্ড শূন্য বোতল সাজানো রয়েছে।

দোকান বন্ধ থাকলেও পিছনের প্রবেশ দ্বার বা কোন্ ইঙ্গিতে দোকানদারদের সাড়া পাওয়া যায় তা সীমার জানা আছে। আর কারো জন্য না হোক মাদাম প্লানকার্ড বা তাঁর দূত সীমার জন্য তাদের দরজা সর্বদাই খোলা, প্লানকার্ড পরিবারের জন্য কিছু না কিছু থাকবেই।

'ভিলা মনেরেপো'র মজুত দ্রব্যাদির ওপর নানা প্রয়োজনীয় বস্তু সীমা আসন্ন দুর্দিনের জন্য সংগ্রহ করলো। এখানকার দোকান "লা এগ্রিয়েবল্ এট্ লা উতিল" একেবারে ফাঁকা। "মঁসিয়ে লা উতিল" ব'লে পরিচিত মঁসিয়ে কার্পেণ্টিয়ার পর্যন্ত চলে গেছেন। 'মঁসিয়ে লা এগ্রিয়েবল' বলে খ্যাত মঁসিয়ে লা ফ্লেস শুধু উপস্থিত আছেন। সীমার

জন্য তিনি একজোড়া মোজা আর বাগানে জল দেবার ঝারি রেখেছেন। মঁসিয়ে আর্মন্দের নাপিতের দোকানে মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ডের জন্য কয়েকটা দাড়ি কামাবার সাবান রাখা ছিল। সীমা শহরের একমাত্র বিভাগীয় দোকান 'গ্যালেরী বুর্গীগননে'—পৌছতে পারল। দোকানটি ভালো করে পাচীল দিয়ে ঘেরা। এত বড় দোকানে মাত্র তিনটি কর্মচারী হাজির। তবু মাদমোয়াজেল জোসেফাইন মাদাম প্ল্যানকার্ডের জন্য কয়েকটি জিনিষ ও কিছু রিবন রেখে দিয়েছেন। সীমাকে জিনিষগুলি দেবার সময় উত্তেজিত ভঙ্গীতে তিনি কানে কানে জানালেন যে, দোকানের মালিক মঁসিয়ে এনিয় শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মুদীর দোকানের মঁসিয়ে রাইমু, ক্রেডিট লিওনের মঁসিয়ে লা রোস্ প্রভৃতি আর যে সব ব্যবসাদার, ব্যবহারজীবি বা ডাক্তাররা শহর ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের নামও তাঁর কাছে শোনা গেল।

তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করে সীমা শহরের এই প্রাচীন অঞ্চল ছেড়ে পোর্ট দ্য লা হর্লো ছাড়িয়ে এ্যাভিন্যু দ্য লা গারের নতুন অংশের দোকানগুলিতে ঘুরতে লাগল।

এই পথে শহরের সব চেয়ে বড় পার্ক প্লাস্ দু জেনারেল গ্রামো পড়ে। এইখানে বার্ষিকী মেলা বসে, আর ১৪ই জুলাই তারিখে সাধারণের নাচগানের জন্য রঙীন আলোক-মালায় জায়গাটি সাজানো হয়। মেলার সময় যা হয় না আজ তার চেয়ে বেশী মোটর আর ওয়াগানে জায়গাটি ভরে গেছে; অনেক পলাতক আরো দূরে যাবার আশা ছেড়ে, আগামী দিন ও রাত্রিগুলি এইভাবেই এইখানে গাড়িতে কাটিয়ে দিতে মনস্থ করেছেন। জেনারেল গ্রামোর মনুমেণ্ট গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে দেখাই যায় না। জেনারেলের মাথা থেকে হাত পর্যন্ত দড়ি বেঁধে কারা তার উপর কাচা কাপড়-চোপড় শুকাতে দিয়েছে।

এ এক ভীষণ হট্টগোলের দৃশ্য—দুটো এম্বুলান্স কোনো রকমে এর

ভিতর ঢুকে পড়েছে। সীমা তার মধ্যে একটির দরজায় উঁকি দিয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে যে মাথাটি দেখা গেল তাকে আর মানুষের মাথা বলা চলে না। হাসপাতালের লোকেরা পাদানিতে বসে ঝিমোচ্ছে। মালপত্রে বোঝাই প্রকাণ্ড বড় একটা ওয়াগান দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলি তখনও গাড়িতে জোড়া রয়েছে, গাড়োয়ানের বসবার জায়গায় একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক বসে আছে, মালপত্রের ওপর বিপজ্জনক ভাবে বসে একটি বিশ্রী নোংরা ছোট ছেলে বেড়াল কোলে করে কাঁদছে। গাড়িগুলির মাঝে কতকগুলি সৈনিক শুয়ে বা বসে আছে। অনেকে তাদের ইউনিফর্ম বা উর্দী খুলে ফেলে বেসামরিক পোশাক ওভারকোট, হ্যাট এই সব পরেছে—অনেকে আবার পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে, সুদীর্ঘ পথশ্রমে পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে। ঠেলাগাড়ি বা ছোট ছেলেদের পেরামবুলেটরে অদ্ভুত জিনিষ পত্র বোঝাই করা রয়েছে। সীমা দেখলো একটি মেয়ে অন্যমনস্ক অথচ ধীরভাবে গাড়ি থেকে কাদা তুলে ফেলছে, যেখানে কাদা উঠে যাচ্ছে সেখানে উজ্জ্বল ঘন নীল রঙ জেগে উঠছে। পলাতকদের মধ্যে অনেকেই যেন বিশেষ অসুস্থ ও দুঃস্থ। অনেকেরই ছোটোখাটো নানাবিধ জিনিষের প্রয়োজন। কাপড়চোপড় বেশীর ভাগই ছিন্ন ও খুব উপযোগী নয়। যে সব জিনিষ বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাও আবার যে খুব প্রয়োজনীয় বা বহু মূল্য তা নয়, চলে আসার মুখে যেটা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে সেইটেই তুলে আনা হয়েছে, যেমন একটা চমৎকার আরাম কেদারা বা প্রকাণ্ড একটা গ্রামোফোন।

ফিকে সবুজের ডোরাকাটা পোশাকে—হাতে প্রকাণ্ড বেতের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে সীমা গাড়ি ও মানুষের এই বীভৎস ভিড় দেখতে লাগল—এই ভৌতিক দৃশ্য ওকে অভিভূত করে ফেলেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ আর আহার ও আবাসে পরিতৃপ্ত সীমা এবং এই জনসাধারণের

মধ্যে কোথায় একটা ব্যবধান রয়েছে, নিজেকে পুনরায় ওর অপরাধী মনে হল।

এ্যাভিন্যু ছ লা গারের পথে সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল, কিন্তু শহরের এই নতুন অঞ্চলের সব দোকানই প্রায় বন্ধ, অনেকগুলিতে সীমা ঢুকতেই পারল না। বোঝা গেল মালিকরা পালিয়েছেন। যাই হোক ওর ঝুড়ি প্রায় ভরে এসেছে, তবে তখনও তালিকাভুক্ত অনেকগুলি খাদ্যদ্রব্যের অভাব রয়েছে। শেষ চেষ্টা হিসাবে সীমা স্থির করলো পুরাণো শহরের হোটেল ছ লা পোস্ত-এ যাওয়া যাক। সেই হোটেলের সরবরাহ ব্যবস্থা হয়ত এখনও ভালো, আর সেখান থেকে হয়ত কিছু পেলেও পাওয়া যেতে পারে। প্ল্যানকার্ড-পরিবারের সঙ্গে ওদের ব্যবসাগত সম্পর্ক থাকায় হোটেলটিতে প্লানকার্ডদের খাতির আছে।

এই প্রসিদ্ধ হোটেল ছ লা পোস্ত-এর দরজায় যে কাগজ নির্মিত রাঁধুনী আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকত আজ সেটি পথে বিশ্রীভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর হোটেলের অধিকারী মঁসিয়ে বাথিয়ার আহার ও আবাসপ্রার্থী কয়েকটি শরণাগতের সঙ্গে তর্ক করছেন। এই হোটেল ছ লা পোস্ত-এর ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। এল্‌বা থেকে ফেরার পথে নেপোলিয়ন এইখানে উঠেছিলেন। যে ঘরে সম্রাট নিশাযাপন করেছিলেন সেই ঘরটি আজো সেইভাবে সাজিয়ে রাখা আছে। যে বাথিয়ার সম্রাটকে অভ্যর্থনা করেছিলেন মঁসিয়ে বাথিয়ার তাঁর বংশধর, যে সব অতিথিকে মঁসিয়ে বাথিয়ার পছন্দ করতেন বা যাঁরা একটু বেশী মূল্য দিতেন তিনি এই ঘরটি তাঁদের মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দিতেন। মঁসিয়ে বার্থিয়ার একজন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বার্গেণ্ডির হোটেলকীপার্স এসোসিয়েসনের তিনি সভাপতি। জনসাধারণের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি জানেন। কিন্তু

তখন তিনি মাত্রা হারিয়ে ফেলেছেন · ঘর্মাক্ত, উত্তেজিত ও মরিয়া হয়ে উঠেছেন—অপর পক্ষও সমান উত্তেজিত। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে সত্যই কিছু নেই, কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বারবার তাই জানতে চায়।

এই উত্তেজিত জনতা অতিক্রম করে সীমা হোটেল বাড়ির অন্য প্রবেশপথে ঘুরে গেল। এ পথটি রু মালহার্বে—প্রাচীরঘেরা হোটেলের ছোট বাগানের ভিতর। এই দরজাটি সাধারণের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং তালাবদ্ধ। সীমা কিন্তু জানে কি করতে হবে। এক টুকরো ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে সে থেমে থেমে মাঝে মাঝে সজোরে ঘা মারতে লাগল।

বাগানের পাঁচিলের ধারে দুটি লোক বসেছিল, একটি বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে অপরটি মধ্যবয়স্ক। দুজনেই ওকে লক্ষ্য করছিল—বয়স্ক লোকটি অন্যমনস্কভাবে আর বালকটি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। সীমা জানে শীগগিরই তত্ত্বাবধায়কের ঘর থেকে কেউ জানালা খুলে উঁকি মেরে মাথা নাড়বে আর এই ছেলেটি তার উজ্জ্বল চোখ মেলে দেখবে। ঠিক তাই হ'ল। বালকটি জানলার দিকে তাকালো, জানালা থেকে সীমার দিকে, সীমার বেতের ঝুড়ির দিকে, আর দেখলো দরজা খুলে গেল। সীমা বালকটির দিকে চাইতে পারলো না, কিন্তু দরজার ভিতর ঢোকার সময় কিছুতেই তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। সীমা দেখলো বালকটি বুঝদারের মত উজ্জ্বল চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে আছে, সীমা সেই কঠোর দৃষ্টি হজম করল।

হোটেলের রান্নাঘরে সীমা দেখলো তালিকাভুক্ত অনেকগুলি জিনিষ পাওয়া যেতে পারে। একপাত্র চমৎকার মাংসের পেষ্ট, একখণ্ড স্মোকড হ্যাম, আরো কত কি। ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গিছল, সীমাকে একখণ্ড

রবেলকন্ চীজ্ হাতে করে নিতে হ'ল। বাইরে পাঁচিলের ধারে সেই দুটি শরণাগত সমানভাবে বসে আছে—সেই ভাবেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সহসা অত্যন্ত ভীরু ভঙ্গিমায় সীমা ওর রবেলকন্‌চীজের টুক্‌রোটুকু ছেলেটির হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটি অত্যন্ত রুষ্টভাবে ওর মুখের দিকে তাকাতেই সীমা তাড়াতাড়ি সে দিকে না ফিরে দেখে পালিয়ে এল, সে যেন একটা ভীষণ অন্যায় করেছে।

ওর কেবলই মনে হ'তে লাগল—যতক্ষণ না মোড়ের মাথার সীমা মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ ওরা সেইরকম স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। সীমা একটু ভয় পেয়েছে। পলাতকরা যদি টের পায় ওর ঝুড়িতে কি আছে তা'হলে ওরা জিনিসগুলি কেড়ে নিতে পারে। সীমা ভীত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে হ'ল—ওদের কোনো দোষ ধরা যায় না। ওর মনে হতে লাগল, আহা ওর যদি সত্যি ঝুড়িটা কেড়ে নেয় ত' ভালো হয়।

ভিলা মনরোপাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশে সে প্রতিপালিত। দশ বছর বয়সে বাপ মারা যাবার পর এ বাড়িতে দরিদ্র আত্মীয় হিসাবে কষ্টেই ও বাস করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে দাসীর কাজের ভার নিয়ে ওকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, এদিকে আবার পরিবারবর্গের সঙ্গে একত্রে আহার করে, তারাই ওর অভিভাবক। প্রস্‌পার খুড়োর হুকুম যে ওকে বাড়িরই একজন হিসাবে যেন ধরা হয়। কর্তব্য ও সুবিধা দুই-ই সে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মেনে নিয়েছে, ভিলা মনরোপার আচার ও ব্যবহার ওর কাছে দিন ও রাতের মতই অপ্রতিবাদ্য। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনোরূপে প্রতিবাদ না করেই ও প্রস্‌পার খুড়োর মা মাদামের সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করে। এই দুঃসময়ে একজন পাকা গৃহিণী যে তাঁর ভাঁড়ার ভর্তি করে রাখবেন এ ত' স্বতঃসিদ্ধ। তবু চেতনভাবে চিন্তাসূত্র না হারিয়েই সীমার মনে হতে লাগল যে—

মর্মবেদনা গত কয়েকদিন ধরে ওকে উৎপীড়িত করছে, তার সঙ্গে এই ঝুড়িটির সংযোগ রয়েছে।

ইদানীংকার এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করার জন্য সীমা উন্মুখ। এই সেদিন পর্যন্ত ম্যাজিনো লাইন আর শক্তিশালী সৈন্যদলের সংরক্ষণে ওরা গভীর নিরাপত্তা সহকারে বাস করেছে। যুদ্ধ সত্ত্বেও সর্বত্র বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নিয়মের প্রাচুর্যের ভিতর কেটে গেছে। তারপর সহসা রাতারাতি ম্যাজিনো লাইন ও সৈন্যদলের সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুসৈন্য দেশের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে, আর সারা ফ্রান্স দুর্দশা ও দুঃখে অর্ধোন্মত্ত অসহায় শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের বছরে সবাই নির্বোধের মত নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছে এই কথা ভেবে দুশ্চিন্তা ও দুঃখকাতর সীমা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। কি করে যে এই সব ঘটনা একযোগে সংযুক্ত হয়েছে একথা সীমা ভেবে পায়না, এ বিষয়ে ওর চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী কারো সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্ন করে কিছু জানতে পারলে হয়ত ভালো হ'ত, কিন্তু প্রাণখুলে কথা কইতে পারে এমন কাউকেই ত সে জানে না।

ওর বাবার সতাত ভাই প্রস্পার খুড়ো ওকে ভারী স্নেহ করেন। ওকে যে তিনি বাড়িতে রেখেছেন তার জন্য সীমা সত্যই কৃতজ্ঞ।

তিনি সদয় ও সহৃদয় ফরাসী ভদ্রলোক এবং অত্যন্ত স্বদেশহিতৈষী। যানবাহন সংক্রান্ত ওঁর ব্যবসা নিয়ে উনি আগের মতই ব্যস্ত আছেন, কাজটার অবশ্য গুরুত্ব আছে আর যদিও ইদানীন্তন ভয়ংকর ঘটনাবলীতে তিনিও বিব্রত আছেন তবু মনে হয় এই ব্যাপারে সীমা যেমন অভিভূত হয়ে পড়েছে তিনি ততটা হ'ননি। যাই হোক এই সব ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন সে সব কথা সীমা যা জানতে চায় তা নয়। সেই কথায় কোনো কিছুরই অর্থ পরিষ্কার হয়নি, তার মনের জটিলতা কাটেনি।

খুড়োর মা, মাদাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। নিজের বাড়ি ও নিজের সম্পর্কে তিনি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করেছেন, আর সব কিছু ব্যাপারেই 'ভিলা মনরোপার' সম্ভাব্য মঙ্গল আর অমঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। যেমন আজ যদি কোনো পলাতক সীমার ঝুড়ি নিয়ে পালাত, তাহলে মাদাম তাকে সাধারণ দস্যু ও ঘৃণিত আসামী ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না, আর তাঁর সে ধারণার প্রতিবাদে সীমা কিছু বলতে গেলে মাদামের কাছে তা ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহের ভঙ্গী বলে বিবেচিত হ'ত। এমন কি এত সদয়-চিত্ত হলেও এই সব ব্যাপারে প্রস্পার খুড়োর কোনো সহানুভূতি থাকত না।

এতকষ্টে সংগ্রহ করা রবেলকন্ চীজটুকু যে সে শরণাগতদের ছেলেকে দিয়েছে সেকথা অবশ্য সে চেপে যাবে। ভিলা মনরোপাস্থ সীমার আত্মীয়বর্গ একথা শুনলে তাকে উন্মাদ বিবেচনা করবেন। সেই ছেলেটি ত' ও'র দিকে রুষ্টভাবে চেয়েছিল। তবুও পুনরায় হয়ত অনুরূপ কাণ্ড সে করে বসবে।

নানা চিন্তায় ওর মাথা পরিপূর্ণ, অন্যমনস্ক ভাবে দ্রুত পদক্ষেপে ও পার্বত্য পথে চলতে লাগল—ওর কাজ শেষ হয়েছে। এইবার ওকে প্রস্পার খুড়োর গ্যারাজে পেট্রোল পাম্পে কাজ করবার জন্য যেতে হবে। ইতেনদের বাড়ির রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে হবে। আহা! সে যদি এখানে থাকত বেশ হ'ত। সে এখন চ্যাভিলোর মেসিনের কারখানায় কাজ করছে।

সীমা ও ইতেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বর্তমান; ইতেন সীমাকে ভালোবাসে ও তার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিশীল। তবু সে অল্পবয়সী বালকমাত্র, সীমা নিজেকে তার চাইতে বড় মনে করত। অথচ সীমাই ছিল তার চাইতে এক বছরের ছোট। মনে যত কিছু সমস্যা ও সংশয়ের

ভাব উদয় হত ইতেনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলাপ আলোচনা করত। এই বিভ্রান্তিকর সাময়িক ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ইতেন হয়ত কিছুই বলতে পারবে না এ কথা সে জানে। তবু তার মনে হ'ল, ইতেন থাকলে বড় ভাল হ'ত, সে হ'ল হেনরিয়েটের ভাই।

সীমার সহপাঠিনী হেন রয়েট ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সহপাঠিনী এক বছর আগে হেনরিয়েটের মৃত্যুর পর এখন আর এমন কেউ নেই, যার কাছে ও খোলাখুলিভাবে বিশ্বাস করে মনের কথা বলতে পারে, ভাব বিনিময় করে। যে বাড়িতে হেনরিয়েট ও ইতেন থাকত সেই বাড়িটির সামনে দিয়ে চলার সময় নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হ'ল সীমার।

এই শরণাগতদের বিষয় যদি কিছু হেনরিয়েটকে বলা যেত, তা হলে সব কিছুই বেশ সহজ ও সরল হয়ে উঠল, হয়ত উভয়ে কলহ করত, হয়ত হেনরিয়েট চটে উঠত, কিন্তু উভয়ে উভয়কে ঠিক বুঝত। হেনরিয়েট ছিল সীমার বিপরীত চরিত্র, আত্ম-সমাহিত, চট্‌পটে আর সর্বদাই কিছু একটা অপ্রত্যাশিত কাজ করে বসত। মেয়েটি কলহ-পরায়ণা ছিল! লোকের মনে আঘাত দিয়ে আনন্দ পেত। সীমা আর হেনরিয়েট একবার স্কুলে পরস্পর মারামারি করেছিল, সীমার বাবার সম্পর্কে হেনরিয়েট একটা অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করেছিল। হেনরিয়েট অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট মেয়ে ছিল। এই শান্ত ও সুশীলা মেয়ে সীমা তখন তাকে মেরে, আঁচড়ে, তীব্রভাবে আক্রমণ করল। এরপর আশ্চর্যভাবে হেনরিয়েট মার্জনা ভিক্ষা করল, আর তদবধি উভয়ের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়ে উঠল।

ওদের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করলেও, অনেকদিন হেনরিয়েটের কথা সীমার মনে হয়নি। মাঝে মাঝে এমন হ'ত, কিছু-কাল, কিছু সপ্তাহ ধরে হেনরিয়েটের কথা ওর মনে হ'ত না। পরে যখন মনে পড়ত, তখন স্বীয় নিষ্ঠাহীনতার জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে উঠত।

এখন যখন সে আন্তরিকভাবে হেনরিয়েটের কথা চিন্তা করছে, তখনো কিছুতেই তার মুখাকৃতি স্মরণ করতে পারছে না। কফিনে শায়িত সেই শান্ত মোমের মত মুখখানি তার অন্তরে গাঁথা ছিল, যে কোনো সময় সেই মুখখানি সে মনে করতে পারত। কিন্তু সেই মেয়েটির জীবিত, সচল, সুস্থ মূর্তিখানি স্মরণে আনা কঠিন। সীমার স্মৃতির কোঠায় এই মুখখানি নিয়তই পরিবর্তিত হ'ত; কখনো শান্তিদায়ক, কখনো বা ঘৃণাব্যঞ্জক, তবু সে ছিল ওর কাছে সব চেয়ে বিশ্বস্ত। হেনরিয়েটের সঙ্গে শুধু যদি একবার কথা বলা যেত!

এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল ওর বাবাকে। যদিও দশ বছর পূর্বে পীয়্যর প্লানকার্ডের মৃত্যু ঘটেছে, তবু তিনি সীমার মনে হেনরিয়েটের চাইতেও সজীব হয়ে আছেন। যেভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে গুজব কখনো বন্ধ হ'ল না। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে কঙ্গোতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল। তাঁর বন্ধুরা বলেন, নিগ্রোদের উপর কি প্রকার বর্বরভাবে শোষণ চলে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উপনিবেশ স্থাপকদের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। পীয়্যর প্লানকার্ডের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি আর সরকারী তদন্তে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রস্‌পার খুড়োর মার মতে পীয়্যর মরে গেছে, চুকে গেছে, বন্ধুদের কাছে পীয়্যর বীর ও শহীদ হয়ে আছেন।

বাপের স্মৃতি সীমার কাছে স্বভাবতঃই তেমন স্পষ্ট নয়, কারণ শেষ দেখার সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বছর মাত্র। তবু সব কথাই বেশ মনে আছে এই ওর ধারণা। এমন কি সীমা বলত, তাঁর গলার আওয়াজ পর্যন্ত ওর মনে আছে, বেশ গভীর ও গম্ভীর গলা। সীমার বাবা একবার তাকে নতরদামে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথাটি বিশেষ

করে মনে আছে। বেশ একটি ছোটোখাটো দল। ও অবশ্য তিনশ ছিয়াত্তরটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেনি, সবাই বিদ্রূপ করেছিল, হেসে বলেছিল ওকে রেখে যেতে। তাদের রসলো প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওর বাবা সমস্ত পথ ওকে কোলে তুলে নিয়ে সব বিস্ময়কর মূর্তিগুলি দেখিয়েছিলেন। অদ্ভুতাকৃতি মূর্তি দর্শনে সীমা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলে ভয় ভেঙে দিয়ে তার মনে তিনি কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ছবি, ফটো বা ম্লান সংবাদপত্রের অংশের উপর নির্ভর করেই সীমার স্মৃতি সঞ্জীবিত হয়েছিল। পীয়্যরের ছিল শীর্ণ মুখ, গভীর চোখ আর ঘন চুল। সীমা শুনেছিল এই চোখের রঙ ছিল ঘোলা-নীল। সেই চোখ কখনো খুব উত্তেজিত আবার কখনো বেশ আনন্দময়। ছবিতে পীয়্যর প্লানকার্ডকে একটু বয়স্ক বলে মনে হয়, কিন্তু যখনই নতরদামের ঘটনাটি সীমার মনে হ'ত, তখনই সে ভাবত তার বাবা ছিলেন হাস্যময় তরুণ, চোখের কোণের কুঞ্চিত ছোটখাটো রেখাগুলিও তাঁকে বৃদ্ধ করতে পারেনি। যখনই তাঁর কথা সীমা মনে করত, তখনই তার মনে হত তিনি যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভিলা মনরেপোর সকলে কিন্তু পীয়্যর প্লানকার্ড সম্পর্কে কথা বলতে ভালোবাসতেন না। প্রস্‌পার খুড়ো অবশ্য তাঁর সতাত ভাই পীয়্যরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, মাদাম কিন্তু তাঁর সতাত ছেলের সম্পর্কে হিম শীতল অবহেলার ভঙ্গীতে কথা বলতেন। সীমাকে ভুলতে দিতেন না যে তার জন্য পীয়্যর একটি পয়সাও রেখে যাননি। প্রস্‌পার খুড়ো কখনও এর প্রতিবাদ করতেন না। মাদামের এই কটূক্তিতে পিতার সম্পর্কে সীমার গর্ব আরো বেড়ে উঠত।

আজ তিনি থাকলে ভালো হ'ত। তিনি বুঝতেন কেন তার বাজারের ঝুড়ি আজ এত ভারী হয়ে উঠেছে, কেন সেই শরণাগত ছেলেটিকে রাবেলকন্‌ চীজের টুকরোটি সে দিয়েছিল।

এতক্ষণে ও প্যালেস নইরেটে পৌছুল, এই চমৎকার প্রাচীন বাড়িটিতে ম'সিয়ে লে সুস্-প্রিফেক্ট্-এর অফিস। ডেপুটি প্রিফেকটের অফিসে সীমা বিশেষ পরিচিত, এখানেই সে তার মালবোঝাই ঝুড়িটি রেখে দিল, কাকার অফিস পর্যন্ত আর বইতে হবে না।

বোঝাটি নামিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সীমা এ্যাভিন্যু ছ্য পার্কের পথ ধরে কাকার অফিসের দিকে চলল। কিন্তু এ্যাভিন্যুতে বা শহরের নূতন অংশে পৌছবার পূর্বেই মতপরিবর্তন করে সীমা স্থির করল পেরী ব'সটিডের সঙ্গে দেখা করবে। ওর মনে হ'ল কোনো বন্ধুজনের সঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভিলা মনরেপোয় এই প্রাচীন দপ্তরী পেরী বাসটিডের তেমন সুনাম নেই। তাঁর সঙ্গে বা তাঁর ছেলে ডেপুটি প্রিফেকটের সেক্রেটারী ম'শিয়ে জাভিয়েরের সঙ্গে মেলামেশা সীমার আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেন না। প্রস্‌পার খুড়ো ও মাদাম এদের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন, স্পষ্টই বলতেন বুড়া দপ্তরীটা নির্বোধ। পেরী বাসটিড্ একটু অবশ্য ছিটগ্রস্থ ও একগুঁয়ে ছিলেন। সব বিষয়েই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, নিন্দা ও প্রশংসা কোনো বিষয়েই তাঁর সংযম ছিল না, মাঝে মাঝে অতীত ও বর্তমান তাঁর কাছে গোলমাল হয়ে যেত। এখন যদিও অনেকের মন সংশয়াচ্ছন্ন, তবু ফ্রান্সের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা হ্রাস পায়নি। এঁর কাছে ফ্রান্স সম্পর্কে দু এক কথা শুনতে সীমার ভালো লাগত। সবচেয়ে বড় কথা উনি ছিলেন সীমার বাবার বন্ধু,—তাঁকে উনি ভালো ভাবেই জানতেন, মাঝে মাঝে তার সম্পর্কে সগর্বে ও সস্নেহে কথা বলেন। এই কারণেই সীমার সঙ্গে বৃদ্ধটির একটা সংযোগ থেকে গিয়েছিল, আর আজকের এই দুঃখকর তমসাবৃত অভিজ্ঞতার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে হয়ত ভালোই হবে।

পেরী বাস্‌টিড পেটিট্ পোর্টে থাকতেন। শহরস্থ পাহাড়ের পিছন

দিকটিতে, সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁর প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। একদিক থেকে প্রাচীন শহরের বাড়িগুলির ধূসর ছাত দেখা যায়, অপর দিকে প্রশস্ত ও চক্রাকার সেরিন নদীর উপত্যকা।

প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উপরে কারখানার কাঁচের দরজায় মুখ চোখ রেখে সীমা ভিতরে তাকাল। পেরী বাস্টিড্ দীর্ঘকাল পূর্বে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আত্ম-তৃপ্তির জন্য এখনও বই বাঁধাতে ও এইখানে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন, অনেক সময় এই দোকানেই বসে কাটান। বই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, আর তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটিও বেশ বড়।

এই কারখানায় সকল রকমের প্রাচীন ও অদ্ভুত আসবাবপত্রের ভিতর সীমা দেখল, তিনি একটি আরাম-কেদারায় বসে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মাথার ঠিক উপরেই বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা জীন জাউরেসের প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো, পেরী বাস্টিডের তিনি অশেষ শ্রদ্ধাভাজন। বিগত যুদ্ধের সূচনায় জাউরেস উগ্র-দক্ষিণপন্থী একটি সংবাদপত্রের প্ররোচনায় এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাস্টিডের কাছে জাউরেস গৌরবময় অতীতের ও ফ্রান্সের প্রতীক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি বিরাট পতাকার সামনে মঞ্চোপরি দাঁড়িয়ে জনতার কাছে বক্তৃতা করছেন। লোকটিকে মনীষীর মত দেখায়। নম্র অথচ দুর্দমনীয় প্রকৃতি।

সীমা কিছুক্ষণ কাচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছবির নীচে নিদ্রাচ্ছন্ন বৃদ্ধ বাস্টিডের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে। আগে তাঁকে সর্বদাই সতেজ, প্রাণবান ও আগুন-ভরা মানুষ বলে মনে হ'ত—আজ কিন্তু এই বিশাল আরামকেদারার গহ্বরে তাঁকে কুঞ্চিত, ক্ষুদ্র ও পর্বতের মত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে দেখে সীমার মনে বড় কষ্ট হল, দুঃখে তার অন্তর আকুল হয়ে উঠল।

সীমার মনে হ'ল উনি হয়ত তার অতর্কিত আবির্ভাব পছন্দ করবেন না। তাই সে নীচে নেমে গেল, সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করল, আবার ওপরে উঠে এল যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে ও পায়ের শব্দ করে।

যেমনটি ঠিক আশা করা গিছল, পেরী বাস্‌টিড ঘুম ভেঙে উঠেছেন, চক্‌চকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সীমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন,—"এসো, খুকী যে!" তারপর দেরাজ থেকে ঘরে তৈরী করা এক বোতল ব্রাণ্ডি বার করে এনে সীমাকে একগ্লাস দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সীমাও নম্রভাবে এক চুমুক ব্রাণ্ডি পান করলো।

সীমা যেমনটি হবে আশা করেছিল ঠিক তেমনই হ'ল। সীমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে করতে তিনি বললেন, "শোনো মা—" তারপর যে সব ঘটনা ঘটছে সেই বিষয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রোধভরে বললেন—"এইত, কোথায় আমরা নেমে এসেছি।" এই কথা বলে ছোট্ট জানলা দিয়ে সেরিন উপত্যকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। এখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে রৌদ্রতপ্ত ধূলিমলিন পথে শরণাগত দলের অন্তহীন মিছিল।

তিনি বললেন—ওদের এই পালিয়ে আসাটা নিছক পাগলামো, একটা বিপদ থেকে ওরা আর একটা বড় বিপদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এদের কোথায় আটকে রাখবে, না কর্তৃপক্ষরা ওদের পালিয়ে আসার জন্যই তাড়া দিয়েছেন। এখন ওরা পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, আমাদের রিজার্ভ বাহিনী কোনো পথ দিয়েই অগ্রসর হতে পারে না। বোঝা শক্ত যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট অপটু, না এর পিছনে কোনো কু-মতলব আছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। হাত পা নেড়ে যে ভঙ্গীতে তিনি কথা বলছেন কে বলবে যে এই বৃদ্ধই অথর্বের মত সঙ্কুচিত হয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন।

পেরী বাস্‌টিড আবার শুরু করলেন: প্রধান মন্ত্রী রেডিয়োতে বলেছেন, যেখানে সৈন্যদের থাকা উচিত ছিল সেখানে তাদের পাওয়া যায় নি, ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, ষোলজন জেনারেলকে তিনি পদচ্যুত করেছেন। তিনি নিজেই একটা বিদ্রোহের কথা ইঙ্গিত করেছেন। আমার ছেলে জাভিয়ের বলে যে, ইনডাসট্রিয়াল কাউন্সিল, কমিতি দেস্‌ ফরজেস্‌, বাঙ্ক দি ফ্রান্স প্রভৃতির বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোড়া থেকেই "বস্‌দের" (জার্মান) জয় হবে ধরে নিয়েছেন এবং বলেছেন সেই অবস্থা তাঁদের অসন্তোষের কারণ হবে না। আমি এ ধারণায় বিশ্বাসী নই।—নিস্ফল ক্রোধে চীৎকার করে তিনি বললেন—আমার বুড়ো মাথায় এ সব বিশ্বাসে প্রবৃত্তি হয় না। ফ্যাসিস্তরা কি পারে না পারে আমি জানি। জারেসকে হত্যা করার পর এই ভুশ' পরিবার কি করতে পারে আমি জানি, কি তাদের ক্ষমতা বুঝি, তাদের সম্বন্ধে সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারি, তবে তারা বিজয়ী হবে এ বিশ্বাসে আমার প্রবৃত্তি নেই।

সহসা সীমার সামনে থেমে, জাউরেসের ছবির দিকে নির্দেশ করে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুর বাণী উদ্ধৃত করে বললেন: "ফ্রান্স একটি ঐতিহাসিক দেউল, বহু শতাব্দীর সমবেত দুঃখ, লাঞ্ছনা, ও ক্লেশের ভিতর ধীরে ধীরে এই বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে। শ্রেণী সংগ্রাম বা তীব্র সামাজিক বৈপরীত্য অবশ্য থাকতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা কি মাতৃভূমির মূল সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়?" সীমাকে পেরী সন্ত্রাসকর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি বিশ্বাস করো মা, এমন ফরাসী আছে যে ফ্রান্সের নিদারুণ সংকটকালে প্রকৃতই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে? বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্বদেশবাসীকে এইভাবে পথে বার করে দেবে?—শরণাগতের মিছিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তেজিত পেরী বাস্‌টিড বললেন, আমি এ সব বিশ্বাস করি না—

টেবিলের উপর বৃদ্ধ সজোরে একটি ঘুসী মারলেন।

আগ্রহভরা সুন্দর চোখ মেলে সীমা বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাচীন ফ্রান্সের ভগ্নাংশ এই বৃদ্ধ কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে তাঁর ফ্রান্সের অবসান ঘটেছে। ক্ষুদ্র ও অসহায়, সাহসী আর কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক এই বৃদ্ধ তাঁর অতীতের মৃত ভাবধারার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

বৃদ্ধ আবার শুরু করলেন: এর জন্য দায়ী উকীলরা। রাজনীতিক আর উকীলরাই ফ্রান্সের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছেন। "বস"রা (জার্মানরা) যখন অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে তখন তাঁরা চোখ মেলে দেখেছেন, কোনো কোনো মহাজন টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন। আমাদের দেশের দুশ' পরিবার যখন তাঁদের টাকাকড়ি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন, তখনো তাঁরা নীরবে সেদিকে চেয়ে রইলেন। শুধু দিনের পর দিন বিতর্ক আর আলোচনা, আলোচনা আর বিতর্ক চলল—তার ফল ত' এখন দেখতে পাচ্ছ।—বাস্‌টিড পুনরায় রাজপথের মিছিলের দিকে আঙ্গুল দেখালেন।

অত্যন্ত খুশিমনে সীমা বাস্‌টিডের মুখে উকীলদের নিন্দা শুনতে লাগল। সীমার মৃত পিতাকে যথোচিত শ্রদ্ধার অধিকারীত্বে তাঁরাই বঞ্চিত করেছেন! কঙ্গোর জঙ্গলে তার বাবার মৃত্যুর কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত এই উকীলদলই মাঝপথে অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়েছিলেন আর অবশেষে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

পেরী বাস্‌টিড আরো কিছুকাল উকীলদের প্রতি কটূক্তি করলেন, তারপর একটি কথার মাঝখানেই সহসা থেমে হেসে ফেললেন। দুঃখ ও ক্রোধের ভিতর কষ্টকল্পিত হলেও, একটা প্রীতিপূর্ণ ভাব এনে তিনি সহসা বলে উঠলেন—কিন্তু খুকী, তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে এই সব কথা শুনতে আসনি, আমার মনের ঝাল মেটাবার জন্য তুমি তো উপযুক্ত

শ্রোতা নও মা। এখনও তোমার ব্রাণ্ডিটুকু তুমি শেষ করোনি দেখছি—দাঁড়াও আর কি আছে দেখি!

তাড়াতাড়ি তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। সীমা অনুমান করলো কি তিনি আনবেন। সীমা বই পড়তে ভারী ভালোবাসে, সমস্ত অবসর সময়টুকু সে বই পড়েই কাটায়—পেরী বাস্‌টিড তা জানতেন, ওকে উপদেশ দিতেন, দু চারখানি বইও পড়তে দিতেন।

এক গাদা বই নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। তারপর নিপুণ হাতে একটি প্যাকেট বেঁধে সীমাকে দিলেন। সীমা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। যতটুকু সময় সে থাকবে মনে করেছিল, তার চাইতে একটু বেশী সময় কেটে গেছে।

পেরী বাস্‌টিড আবার বাতায়নে ফিরে সুদূর রাজপথের মিছিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: কেলেঙ্কারী! কেলেঙ্কারী! তারপর একটু আত্মস্থ হয়ে বললেন, কি জানো মা! ফ্রান্স অনেকবার বিপদে পড়েছে কিন্তু বার বার সে বিপদ তার কেটে গেছে—সর্বদাই একটা অঘটন ঘটেছে।

তার এই আত্মবিশ্বাস সীমার অন্তর স্পর্শ করল, কিন্তু সে ভেবে পায় না সবাই যদি অপেক্ষমান হয়ে বসে থাকে, তা'হলে কোথা থেকে ইন্দ্রজালের অঘটন ঘটবে। ওরিয়েণ্ট থেকে একটি বাণী সম্প্রতি উদ্ধৃত করা হয়েছিল…"এখন যদি না হয় ত' কবে হবে? তুমি যদি না পারো ত' কে পারবে?"

দুই

গ্যারাজ

প্রাচীন শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছবার জন্য কঠিন পথে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সীমার সমস্ত সংশয় অপহৃত হ'ল। পেরী বাস্‌টিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভালোই হয়েছে, সীমা অধিকতর আনন্দ বোধ করতে লাগল। ফ্রান্সের আবার পুনর্জন্ম হবে।

পাথরের পথ রু দ্য লা আর্কবুসে এসে থেমেছে, এই পথেই প্রাচীন শহরের শ্রেষ্ঠতম প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ির নম্বর ৯৭, প্রাচীন ধরনের কারুখচিত অক্ষরে লেখা আছে—৯৭, রু দ্য লা আর্কবুসে। স্কুলে পড়ার সময় সীমা জেনেছিল এই চমৎকার বাড়িটি একদা ত্রিমোইলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও পরে মণ্টমরেন্সিদের অধিকারে ছিল। এখন একটি উজ্জ্বল তাম্রফলকে ঘোষিত হচ্ছে যে এই প্রাসাদটি ব্যবহারজীবী চার্লস মেতর-লেভাতুর-এর অফিস। এই রাজসিক প্রাসাদটি মেতর-লেভাতুর-দেরই, এই বাড়ির সামনে দিয়ে চলার সময় সীমার অন্তরে প্রবল ঘৃণা সঞ্চারিত হ'ল। মেতর-লেভাতুর ছিলেন সীমার বাবার সমসাময়িক ও সহপাঠী, আর পীয়ার প্লানকার্ডের নামের কলঙ্ক মোচনে যারা বাধা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। নূতন ও বিষময় তথ্যাদির সাহায্যে পীয়ারের মৃত্যু সম্পর্কে কুৎসা রটনার জন্য সংবাদপত্রাদিকে সাহায্য করতেন, আর পীয়ার প্ল্যানকার্ডের স্মৃতি রক্ষার জন্য সেণ্ট্‌-মার্টিন সম্প্রদায়কে স্মৃতিফলক উৎসর্গীকরণে তিনি বাধা দিয়েছিলেন। সেই কারণেই এদের উপর সীমার অপরিসীম ঘৃণা ছিল। পেরী

বাস্‌টিড যাদের সম্পর্কে অনুযোগ করছিলেন মেতর-লেভাতুর তাঁদের অন্যতম। যে সব আইনজীবী কালোপোশাক আর গলায় শাদা ফ্রিল লাগিয়ে কৌশলসহকারে জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে প্রবঞ্চিত করে থাকেন, ফ্রান্সকে তার বর্তমান দুর্দশার পথে যাঁরা টেনে এনেছেন—মেতর-লেভাতুর তাঁদের অন্যতম।

সীমা এ্যাভিন্যু দ্য পার্কে পৌঁছেচে, এইখান থেকেই পথ গ্যারাজের দিকে বেঁকেছে। দেরী হয়ে গেছে, বাগান ও রান্নাঘরে এখানেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। এখন ওর গ্যারাজে না গিয়ে বাড়িতে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। ওর স্বপক্ষে বলবার মত যুক্তিও ছিল, মাদামের হুকুম তামিল করতে অন্যদিনের চাইতেও সময় বেশী লেগেছে। তা ছাড়া আজকের দিনে পেট্রল পাম্পের কাজ যেন অধিকতর লজ্জাকর, বিশেষতঃ লরী ড্রাইভার মরিস যে অভদ্র ভঙ্গীতে তাকায় এবং যে রকম অভদ্র কথায় তাকে অভ্যর্থনা জানায়। অশেষ বিরক্তিভরে সীমার মনে সে কথা জাগল।

এই কারণেই এ্যাভিন্যু দ্য পার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে সীমা ইতস্ততঃ করতে লাগল, এই পথের একদিক চলে গেছে গ্যারাজের দিকে, অপর অংশ বাড়ির দিকে। এত বিপরীত যুক্তি থাকা সত্বেও সীমা গ্যারাজের পথ ধরল। সীমা কাপুরুষোচিত কাজ করবে না, পেট্রল পাম্পের কাজে ও যদি না যায় তাহলে ড্রাইভার মরিস মনে করবে তার বাক্যবাণের ভয়েই সে আসেনি—কিন্তু সীমার কোন ভয় নেই।

যদিচ সীমা দ্রুতগতিতে হাঁটলো, উৎরাই-এর পথ, তবু গ্যারাজে পৌঁছুতে প্রায় পনর মিনিট লাগল। নূতন শহরের পশ্চিম প্রান্তে প্লানকার্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, এইখানেই ৬নং রুট থেকে পোর্ট মার্টিনের মূলরাস্তা শাখা বিস্তার করে বেরিয়েছে, এই রাস্তাটিই শহরের চারপাশে একটি প্রশস্ত বৃত্ত রচনা করেছে। কোম্পানীর বাড়ি ঠিক

বড় রস্তার ওপর নয়। একটু ভিতরে, তবে ভিতরে যাবার একটা নিজস্ব রাস্তা হয়েছে।

প্রস্‌পার খুড়ো শরণাগতদের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ব্যবসাগৃহের মূলপথ চেন দিয়ে আটকানো তার উপর একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলছে "প্রাইভেট রোড, শুধু এইবাড়িতে যাওয়া যায়।" কারখানার তুজন শ্রমিককে প্রহরীর কাজে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে…প্রাঙ্গণের অবরুদ্ধ গেটে প্রকাশ্য অক্ষরে স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে "পেট্রল নাই, মেরামতি কাজ হয়না, পার্টস্‌ নাই, পথের মানচিত্র পাওয়া যায়না।"

এখানেও সীমাকে গোপনীয় ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রবেশ করতে হ'ল। সীমা আগে অফিসঘরে গিয়ে নিজের আগমন বার্তা জানালো। পথের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার পর এই ঘরটিকে শূন্য ও শান্তিময় মনে হচ্ছে, সংকটময় বিপজ্জনক পথে প্রকাণ্ড লরী ছুটে চলেছে, ফেণোচ্ছল সমুদ্রে বিশাল জাহাজ ভেসে চলেছে, উত্তুঙ্গ পাহাড়েব গা বেয়ে সুন্দর সর্পিল পথ। এইসব দেয়ালগাত্রসংলগ্ন রঙীন চিত্রাবলী আজ যেন নিরর্থক।

সহসা ক্ষণিকের জন্য সীমার মনে পড়ল প্রস্‌পার খুড়োর ব্যবসার পরিধি কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যানবাহনের ব্যবসা, বিশেষতঃ সুরা ও কাঠের ব্যবসায় শুধু যে প্লানকার্ড কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার তা নয়, পূর্বদিকে পাহাড়ের কোলে ভ্রমণকারীদের জন্য এঁরা সুন্দর রাস্তা তৈরী করে যাত্রীদের নিয়ে বেশ চালু ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

অফিসে ঢুকেই প্রস্‌পার খুড়োকে না দেখে সীমা একটু বিস্মিত হয়েছিল। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, এই কর্মঠ সত্বাধিকারীকে সব জায়গা থেকেই দেখা বা শোনা যাবে; অফিসে, গ্যারাজে, পেট্রল পাম্পের প্রাঙ্গণে, সর্বত্রই যেন তিনি

বিরাজমান, একে হুকুম করছেন বা তাঁর গম্ভীর ও সুরেলা গলায় কারো সঙ্গে গল্প করছেন। সীমা আশা করেছিল এই দুর্যোগের সময় তাঁকে হয়ত অধিকতর ব্যস্ত দেখা যাবে।

বুক-কীপার মঁসিয়ে পেরুর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, কর্তা প্রাইভেট রুমে রুদ্ধদ্বারে বসে আছেন, এখন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে এই তাঁর বাসনা। তিনি স্যাটালিন মার্কুইস্ ডি সেণ্ট ব্রিসনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত আছেন। মঁসিয়ে পেরু বেশ সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে মৃদুগলায় বললেন, টেলিফোন নিষ্ক্রিয়, তাই মার্কুইস স্বয়ং মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সঙ্গে কথা বল্‌তে এসেছেন। বুক-কীপারের খরগোসের মত মুখখানি শ্রদ্ধায় নির্বোধের মত হয়ে উঠল।

মঁসিয়ে পেরু সীমার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এবং গোপনকথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক দরদ আছে, মঁসিয়ে প্লানকার্ডের কর্মচারী হিসাবে পেরুর মনে মনে বেশ গর্ব ছিল, তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। আর মামসেল সীমা হল কর্তার আত্মীয়া। পেরু ভাবলেন যে মার্কুইস্ সেণ্ট ব্রিসনের মত ব্যক্তি স্বয়ং যখন মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সাহায্যপ্রার্থী, তখন সীমাও তাতে গর্ব অনুভব করবে। অফিসের অপর কর্মচারীরা কিন্তু পরস্পর হাসাহাসি ও সীমার প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগল। ঐ "ফ্যাসিস্ট" মার্কুইসটা হয়ত সীমার খুড়োর প্রাইভেট কক্ষে বসে নতুন কোন ব্যবসার ফন্দী আঁটছে, এই কথা মনে করে তারা হয়ত বিদ্বেষপূর্ণ রসিকতা করছে।

পেট্রল পাম্পের চাবিটি চেয়ে নিয়ে সীমা প্রাঙ্গণ পার হয়ে নিজের কাজে চলল, এই প্রাঙ্গণটি সাধারণত মধুচক্রের মত কর্ম-কোলাহল-মুখর। টুরিস্ট-কার, লরী, বাস প্রভৃতি আসা-যাওয়া করত, মেরামত হ'ত, পরীক্ষা করা হ'ত, বোঝাই বা মালখালাস করাও হ'ত—আজ এই সূর্যালোক-মুখরিত দিনটিতে এই বিরাট প্রাঙ্গণ শূন্য, জনহীন।

দেয়ালের ছয়ার নীচে একটি বেঞ্চে বুড়ো ড্রাইভার রিচার্ড, প্যাকার জর্জেস্ ও অপর দু'একজন বসে আছে। সীমা আশ্বস্ত হয়ে দেখল ওদের দলে ড্রাইভার মরিস বসে নেই।

এই গ্যারাজ প্রাঙ্গণে সীমার কাজটি খুব সহজ ছিল না, প্রসপার খুড়ো তাঁর কর্মচারীদের সদয় ও সহৃদয় ভঙ্গীতে দেখতেন, ব্যাবসার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আর সব বিষয়ে তিনি ছিলেন উদারচেতা। সকলেই তাকে ভালোবাসত। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে ফাঁকি চলতো না, আর এখন, যুদ্ধের আবরণে নূতন অছিলায় তাঁর কর্ম্মচারীদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে এতে করে অত্যন্ত অসন্তোষ বৃদ্ধি হ'ত, কিন্তু তারা কর্ত্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল, কারণ সমরক্ষেত্রে সামরিক কর্মভার থেকে রেহাই পেতে হ'লে তিনিই ত্রাণকর্তা, কারণ তিনি বলে দেবেন কোন সব ড্রাইভার ও প্যাকার তার পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস করত না—কিন্তু তাদের পুঞ্জীভূত রাগ কর্তার দরিদ্র আত্মীয়া সীমার প্রতি প্রয়োগ করতে ত কোনও বাধা ছিল না। ওকে তারা সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি, ও ছিল তাদের কাছে কর্তার আত্মীয়া। তারা ভাবত তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করাই সীমার কাজ, তাই তারা সীমাকে পছন্দ করত না। সীমার উপস্থিতিতে তাই কর্তার প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা আনন্দ বোধ করত।

প্রস্‌পার খুড়ো যে সব কাজ সাধারণ কর্মচারীর ঘাড়ে চাপানো যুক্তিযুক্ত বা লাভজনক মনে করতেন না, সীমাকে সেই কাজই দেওয়া হ'ত। পেট্রল পাম্পের কাজটিও এই ধরনেরই।

রেশনিং আইনানুসারে যে-পরিমাণ পেট্রল রাখার অধিকারী তার চাইতে অধিক পরিমাণে পেট্রল তিনি মজুত রেখেছেন। মঁসিয়ে প্লানকার্ড অল্প মুনাফা অবহেলা করেন না, তাই এই ব্ল্যাক-মার্কেট

পেট্রল যারা চড়া দামে কিনতে আগ্রহশীল তাদের কাছে বিক্রী করতেন। গত কয়েকদিন ধরে পেট্রল উৎকৃষ্ট মদের চাইতেও মূল্যবান হয়ে উঠেছে, আর মঁসিয়ে প্লানকার্ডের পেট্রলের দাম দিনের পর দিন চড়ে চলেছে। তিনি দেখলেন বয়স্ক লোককে এই কাজে দিলে গোলমাল বাড়ে, অশোভন ঘটনা ঘটে— ক্রেতারা চেঁচায় আর গাল দেয়, আর সারা শহরে এই নিয়ে কানাকানি চলে—তাই মঁসিয়ে প্লানকার্ড পেট্রল বিক্রীর সময় হ্রাস করে অপরাহ্নে কিছুক্ষণের জন্য বিক্রয় সীমাবদ্ধ করলেন, আর এই ছোট মেয়ে সীমার উপর বিক্রীর ভার দিলেন, যে ব্যবসার কিছুই জানে না, শুধু নীরবে হুকুম তামিল করে যাবে।

অনমনীয় গম্ভীর মুখে সীমা পেট্রল পাম্পের কাজ শুরু করল…সুন্দর হালকা-সবুজ রঙের ডোরাকাটা পোশাকে দাঁড়িয়ে, পাশে লাল এনামেলের পাম্পটি সূর্য কিরণে চক্‌চক্ করছে।

একটি খদ্দের এসে সীমার মুখে দাম শুনে পিছিয়ে গেলেন। পুনরায় দাম জিজ্ঞাসা করলেন, ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপর মতিস্থির করে ঢোঁক গিলে দামটা দিলেন। আর একজন বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন, তৃতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত কটুকথা বলে দামটা দিয়ে ফেললেন।

সীমা চিরদিনই এই কাজ অপছন্দ করে এসেছে, কিন্তু দশ বছর ভিলা মনরেপোতে কাটিয়ে তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রস্‌পার খুড়ো একজন মহৎ ও আদর্শচরিত্র ব্যবসায়ী. তিনি যা করেন ঠিকই করেন। তিনি যে পাম্পের কাজে তাকে দিয়েছেন তা অনুচিত হয়নি। পাম্পের কাজে যদি সে তার কর্তব্য পালন করে তাহলে সে যাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ তাঁর জন্য সামান্যই করা হবে।

আজ বিশেষ করে পাম্পের কাজ করা কঠিন; কুঞ্চিত ভ্রূতে অবশ্য সেই চিন্তাই প্রকাশিত। চোখের ওপর অসংখ্য ছবি ভাসতে লাগল—

মোটর গাড়ির সার আর তার দুর্গত আরোহীদল ; ভেসে আসে তার স্বর্গত পিতার মুখচ্ছবি। সেই শীর্ণ মুখ, লাল চুল, কুঞ্চিত শিররেখা, আর প্রফুল্ল অথচ সরোষ ধূসর নীল চোখ। হোতেল দ্য লা পোস্তের উদ্যান প্রাচীরের সেই শরণাগত বালকটি, রাবেলকন চীজ তার হাতে দেওয়ার পর কি রাগ তার। জানলার ধারে অসহায়, ক্রুদ্ধ, অভিমানী ও হাস্যকর—পেরী বাসটিড্।

কিন্তু সীমার শীর্ণ তরুণ মুখে তার এই স্বপ্নাবলীর কোনো ছাপই পড়েনি। আর সবাই ওর দিকে বিরক্ত ও অবহেলার ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে, ভিক্ষুক রাজকন্যা সীমা লাভ বা ধন্যবাদ কিছুরই অংশভাগিনী নয়, পীয়্যর প্লানকার্ডের এই অযোগ্য দুহিতা নীরবে অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করে চলেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে শোষিত জনসাধারণের মুখ-নিসৃত কঠোর কথা শুনেও না শোনার চেষ্টা করছে, প্যাকার বা ড্রাই-ভারদের কথাও কানে না তোলার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিটি কথা তার কানে ভেসে আসে।

মরিস যে এদের মধ্যে আজ নেই এইটুকুই বিধাতার আশীর্বাদ।

সীমার পিছনে প্রকাণ্ড গ্যারাজের সম্মুখভাগ, নিকটস্থ উন্মুক্ত জানালার ভিতর থেকে স্নানের ঘরের ঝরণা ধারার আওয়াজ ভেসে আসছে ; ড্রাইভারদের স্নানের ঘর, আজকালকার গরমের দিনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ঘর। মুখ ধোওয়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। মরিসটাও হয়ত এর মধ্যে আছে, তাহলে যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বে, আর তার মুখের কটু কথার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবেনা।

এই প্রত্যাশাটুকু তাকে এমনই পীড়িত করে তুলেছিল যে গ্যারাজের প্রবেশদ্বারে মরিসের আবির্ভাব লক্ষ্য করে সীমা যেন একটু স্বস্তি অনুভব করলে।

সীমা সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু ওর প্রতি পদক্ষেপ

সীমার নজরে পড়ল, লোকটি বেশ শক্তিমান। গোলগাল মুখ, মোটা-সোটা চেহারা। সীমা দেখল, দীর্ঘ অলস পদক্ষেপে আর সবাইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—আর ওরাও সরে বসে বেঞ্চের একপাশে ওর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

মরিস তরুণ, দুর্বিনীত। প্রস্পার খুড়োর বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদে সে বিশ্বাসী। খুড়ো জানতো লোকটি গোলমাল সৃষ্টি করার নায়ক; যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার দায় থেকে তাকে নিস্কৃতি দেওয়ার জন্য খুড়োর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে মরিস, বিরক্ত হয়ে উঠছে। আশপাশের মধ্যে মরিস সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রাইভার। আরো অল্প বয়সে মরিস সিত্রোঁ'র প্রধান লরী চালক ছিল, অনেক পয়সা খরচ করে খুড়ো তাকে ভাঙিয়ে এনেছেন। মরিস আর সব কর্মীদের প্রিয়, তাই তাকে বরখাস্ত করলে—কারখানায় গোলোযোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। তাই প্রস্পার খুড়ো মরিসের উষ্মা হজম করেছেন।

মরিসের নীল সার্টের বোতামগুলি খোলা, এখন দলের মধ্যে বসে আর সবায়ের কথা শুনছে। এ সব কথা অবশ্য শরণাগতদের নিয়ে আর যুদ্ধের সংবাদের আলোচনা।

ওরা বিশ্বাস করতে চায় না যে সত্যই এখন আর সমরক্ষেত্রের অস্তিত্ব নেই, সত্যই একটা সর্বনাশ ঘটেছে। ওরা ম্যাজিনো লাইনের কথা উল্লেখ করে, বলে জেনারেল পেঁতা বা ওয়েগাঁর নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছে। প্যারীর পতন যদি রোধ না করা যায় তাহলে লয়ের নদীর ধারে বাহিনী বসিয়ে প্রতিরোধ করা হবে। রাতারাতি ফ্রান্সের পতন ঘটা অসম্ভব।

মরিস এতক্ষণ চুপ করেছিল, এইবার বাধা দিয়ে বলে উঠল—ফ্রান্স? কোন্ ফ্রান্স? একটু বুঝিয়ে দাও দেখি কোন্ ফ্রান্স? দু'শ পরিবারের ফ্রান্স? না দু' কোটি ছোট খাটো আমানতকারীর ফ্রান্স?

তোমার না আমার? লোকে এত বেশী ফ্রান্সের কথা বলছে যে ফ্রান্সের আজ আর অস্তিত্ব নেই।—শ্লেষের ভঙ্গীতে মরিস আবার বলে—ডাক-টিকিটের ওপর যে মহিলার আকৃতি দেওয়া আছে, টুপী মাথায় মহিলা, ঐ কি ফ্রান্স?

মরিসের গলার আওয়াজ চড়া, কম্পমান, কিন্তু সে উত্তেজিত হয়নি। বেশ শান্ত ও ভদ্রভাবে সে কথা বলে চলেছে।

সীমা লাল পাম্পের ধারে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওদের কথা তার কানে আসছে না—কারণ ওরা অদূরে বেঞ্চে বসে আছে। কিন্তু মরিসের এবম্বিধ কথায় সীমা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে, কেন ওরা ওকে এই ভাবে কথা বলতে দিচ্ছে। "এই ফ্রান্স কি?" কেন ওরা জবাব দেয় না—সবাই জানে ফ্রান্স কি, সবাই তা অনুভব করে—ফ্রান্স, ফ্রান্স, আমাদের সীমা ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠল, সহসা সেও আবিষ্কার করল ফ্রান্স যে কি তা সেও বলতে পারে না। কিন্তু এই আকস্মিক ঘোর সে তখনই কাটিয়ে উঠল। সহসা এবম্বিধ প্রশ্নের জবাবে অবশ্য কিছু বলা শক্ত—কিন্তু অন্তরে অনুভব করা ত' শক্ত নয়। আমারা ফ্রান্সের,—আমরাই ফ্রান্সের এক একটি অংশ বিশেষ। মরিসের যদি সেই অনুভূতি না থাকে তা হলে মরিস অতি হতভাগ্য জীব—হৃদয়-হীন পশু!

ইতিমধ্যে মরিস বলে চলেছে, আর এই প্রথমবার নয়, যা হচ্ছে তা প্রকৃত যুদ্ধ নয়,—কোনোদিনই যুদ্ধ হয়নি একবিন্দু, আগেকার ফ্যাসিস্তরা, কাগুলার্ড, ফ্লাঁদা, লাভাল আর বলের দল রাইন পারের সমদলীয়দের হাতে তুলে দিয়েছে। এসব অনেক আগেকার পরিকল্পনা, আর ভার্দুনের প্রাচীন পরাজয়-মনোবৃত্তি সম্পন্ন পেঁতার সাধ্য নেই যে ওদের পরিকল্পনা প্রতিরোধ করে পরিবর্তন করেন।

মরিস বলছিল, ফরাসী একচেটিয়া ব্যবসায়ী ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ফরাসী শিল্পপতিদের সঙ্গে জার্মানদের যোগাযোগ রয়েছে—কাকে

কাকের মাংস খায় না। যে-হিটলার ফ্যাসিস্তদের "৬০ ঘণ্টায় সপ্তাহের" প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি যিনি "৪০ ঘণ্টায় সপ্তাহের" জন্য জিদ করেছিলেন সেই লিও ব্লুমের চাইতেও গ্রহণযোগ্য। ফ্রান্স জার্মান ট্যাঙ্কের জোরে পদানত হয়নি, হয়েছে আমাদের ইস্পাতের একচেটিয়া কারবারীদের সহায়তায়। এরাই দু'শ পরিবারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

মরিস যখন তীক্ষ্ণ ও জোরালো গলায় "এই ভদ্রলোকদের" উল্লেখ করছিল, তখন তা পেরী বাস্‌টিডের কণ্ঠনিঃসৃত কথার মত অস্পষ্ট ও সাধারণ শোনালো না। মরিসের ব্যক্তব্য সুস্পষ্ট ও তীব্র।

পাম্পের ধারে দাঁড়িয়ে সীমা মনে মনে স্বীকার করলো মরিসের উক্তিতে বাস্তবতার একটা সুনির্দিষ্ট ছাপ রয়েছে। এই আত্মবিশ্বাস কাউকে উত্তেজিত করে, কেউ যদি তাকে বাধা দেয়, তাহ'লে সে তথ্য ও অঙ্ক দিয়ে নিজের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে, অপরের যুক্তিজাল ছিন্ন হয়। অনেক সময় ওর এই তথ্যাদিতে কেউ হয়ত সন্দেহ প্রকাশ করেছে, ও কিন্তু প্রমাণ করেছে ওর কথাই সত্য।

সীমা কোনদিন কিন্তু ভাবেনি মরিসের এই জাতীয় নির্বোধ তথ্যাদি ও মেনে নিতে পারবে। মনে মনে সে তীব্রভাবে মরিসের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে, মরিসের কথায় ন্যায়ের স্পর্শ নেই, সে একতরফা বিচার করে এক দিক থেকে—তার পক্ষে আছে শুধু শাদা বা কালো, ভালো বা মন্দ। যে তার মত গ্রহণ না করে সে তার কাছে হয় নির্বোধ, নয় জোচ্চোর, নয় ফ্যাসিস্ত।

সীমা শুনতে পেল, ও বলে চলেছে—এই দু'শ পরিবার আমরা উড়িয়ে দিতে পারতাম, যদি আমরা বামপন্থী বুর্জোয়া দলের সহায়তায় সংখ্যাগুরু হতে পারতাম, কিন্তু যখন কাজের সময় এল তখন আমাদের এই বুর্জোয়া দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—

চিরদিনই ওরা এই রকম। গোলমালের সময় আমাদের বন্ধুরা পিছু হটে যায়, এমন কি যারা শুভাকাঙ্খী তারাও—

আর সকলে চুপ করে মরিসের কথা শোনে—মঁসিয়ে প্লানকার্ডের গোপন আফিস ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ঐ বুড়ো টাকার কুমীর চিরদিনই ভাব দেখিয়ে এসেছেন, মস্ত দেশপ্রেমিক, বরাবরই ফ্যাসিস্ত মারকুই-এর উনি বিরোধী শুনে এসেছি, এখন দেখ তার সঙ্গেই বসে কারবারের কথা হচ্ছে।

বুড়ো ড্রাইভার রিচার্ড নম্রভাবে বলল—ওসব নোঙরা কথা থামা বাপু। কর্তা বেশী কথা বলেন আমি মানি, কিন্তু প্রয়োজনের সময় উনি দান করেন মুক্ত হস্তে,—এই ত' শরণাগতদের জন্য দুখানা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।

মরিস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি দুখানা ঝরঝরে পিজেট গাড়ি, নেভারস পর্যন্ত যদি পৌছতে পারে তাহলে বুঝবে ঐ দুর্গতদের বরাৎ জোর। আর এই টাকার কুমীর এমনই মহানুভব ব্যক্তি যাতে ওরা আর বেশী না চায় তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

প্যাকার জর্জেস বলে ওঠে—এ তোমার অন্যায় কথা, ওর ওপর তোমার আক্রোশ আছে।

মরিস উত্তরে বলে—আমি যা দেখতে পাই তা দেখি, আর তোমরা অন্ধের মত ওকে কথা বলতে দাও। রুটীর চাইতেও পেট্রলের বেশী প্রয়োজন এই শরণাগতদের। কর্তার ট্যাঙ্কে ব্ল্যাকমার্কেটের পেট্রল বোঝাই রয়েছে, কই ওদের এক ফোঁটা দিতে দেখিনি।

ব্ল্যাকমার্কেটের পেট্রল ত' সবার ঘরেই রয়েছে,—বুড়া রিচার্ড শান্ত কণ্ঠে বলে থুতু ফেলে—আর প্যাকার জর্জেস সেই কথায় যোগ দিয়ে বলে, দুখানা পিজেট গাড়িতে পেট্রল দেওয়া হয়েছে।

মরিস বলল—আমি ভবিষ্যৎবক্তা নই, তবে একথা বলে দিচ্ছি,

যখন অবস্থা আরো গোলমেলে হয়ে উঠবে তখন তোমাদের এই টাকার কুমীরও ঐ দুশো পরিবারের আঁচল ধরবেন।

বুড়া রিচার্ড বলে—এখনই ত অবস্থা সংকটাপন্ন। সবার দিকে বুদ্ধিদীপ্ত বাদামী চোখ মেলে চটুলভাবে হেসে মরিস বলল—ঠিক কথা, কিন্তু আমি এক বোতল "পেরনদ" আর দশ প্যাকেট "গলোই" বাজী রাখছি, তোমরা দেখ শেষকালে শরণাগতরা আর গাড়ি পাবেনা, গাড়ি পাবে ঐ স্ত্যাটালিন তার মদের ভাণ্ডার সরাবার জন্য।

সীমা ওর প্রস্পার খুড়োকে ভালোবাসে। পিতৃস্থান অধিকার করে ওর ভার গ্রহণ করেছেন। এই একই পরিবারের সে অন্তর্ভুক্ত। খুড়ো ওকে ভালবাসেন ও ওর প্রতি যত্নশীল। ছবি দেখতে গেলে সঙ্গে নিয়ে যান; বিদেশ ভ্রমণে গেলে ওর জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসেন। গত-বছর দু সপ্তাহের জন্য প্যারী নিয়ে গেছলেন—সকলের প্রতিই উনি মিত্রভাবাপন্ন; সকলের প্রতি তাঁর সমান করুণা ওঁর প্রতি কখনো কোনোরকম অভিযোগ থাকলেও লোকে ওঁকে ভালবাসে। শুধু মরিস তাঁকে ঘৃণা করে, ঈর্ষার ফলেই মরিস ওঁকে গাল দেয়। মরিস যখনই ওকে বলে "টাকার কুমীর" তখনই সীমার মনে বড় আঘাত লাগে।

প্যাকার জর্জেস ঠিকই বলেছে—ওঁর ওপর মরিসের আক্রোশ আছে। যাঁদেরই টাকা আছে তাঁদের সকলের প্রতি মরিসের আক্রোশ আছে। আক্রোশ ও ঈর্ষায় মরিসের অন্তর পরিপূর্ণ।

সীমা মনে মনে ভাবে, মরিস উচ্চপ্রাণ ও শক্তিশালী ব্যক্তি নয়। স্ত্যাটালিনের সঙ্গে কারবার করছেন বলে ও প্রস্পার খুড়োর সম্পর্কে কটুকথা বলছে; কিন্তু পাছে যুদ্ধে ডাক পড়ে তাই প্রস্পার খুড়োর আড়ালে মুখ লুকোয়। অপরে যখন যুদ্ধ করে ট্যাঙ্কের নীচে প্রাণ দিচ্ছে, উনি তখন বাথরুমের জলঝারিতে স্নান করে ছায়ায় আরাম করে বসে

সিগারেট টানতে টানতে বড় বড় কথা বলে চলেছেন। ওর কথা আর আমি শুনবো না—ও দিকে মন দেবনা।

এখন কিন্তু উত্তেজনামূলক আত্মবিশ্বাসের সংগে মরিসের কণ্ঠোচ্চারিত কথাবার্তা সীমা না শুনে পারল না। মরিস বলছে, শেষকালে এই আমাদের মতো চুনোপুঁটিকেই ঠ্যালা সামলাতে হয়। চিরদিন আমাদের ঘাড়েই চাপ পড়ে। সীমা কিছুতেই তার সচেতন মনের ভিতর এই কথা কটির প্রবেশ রোধ করতে পারল না।

মরিসের কথা থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সীমা কঠোর চেষ্টা করল। কিন্তু যদিও সীমা সোজাসুজি সামনের দিকেই চেয়ে রইল, তবু বেঞ্চের ওপর আরামের ভঙ্গীতে নীল সার্টের বুক খুলে দিয়ে বসে মরিস গল্প বলছে ও সবাই শুনছে, এ দৃশ্য সীমাকে দেখতে হচ্ছে।

একবারও অবশ্য ওর দিকে মরিসকে তাকাতে দেখা যায়নি, তবু সীমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কথাগুলি ওকে শোনাবার জন্যই বলা হচ্ছে। যদিও সীমার একটি আধলাও নেই তবু সীমা বোঝে মরিস তাকে চুনোপুঁটিদের একজন বলে গণ্য করে না। সত্যই যদি সর্বনাশ ঘটে, মরিস জানে, অন্ততঃ তার ধারণা, সীমাও প্রস্‌পার খুড়োর সঙ্গে ঐ দু'শ পরিবারের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করবে। আর সীমার নিশ্চিত ধারণা যে এইবার ওর সম্পর্কে অপমানজনক কুৎসিৎ একটা কিছু উক্তি মরিস করল বলে।

সীমা শুনতে পেল উদ্ধত কণ্ঠে মরিস বলছে—ঐ দেখনা মাননীয়া ভাইঝি-ঠাকরুণ ওখানে দাঁড়িয়ে লোক ভোলাচ্ছেন।

সীমার মুখভঙ্গী কঠোর হয়ে উঠল, সে বধির হওয়ার ভাণ করল। এই কুৎসিত উক্তি 'লোক ভোলানো' কথাটি ও পূর্বে কখনো শোনেনি, তবে একথা সে নিশ্চিতভাবে বুঝেছিল, মরিস যা বলল মানুষের সম্পর্কে এতখানি কটুকথা আর বলা যায় না।

মরিসের ও কি করেছে যে মরিস এইভাবে ওকে ঘৃণা করে ? অপমান করে ? সীমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে সংযত হয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওর মুখ আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেছে কিন্তু তাতে কিছু বোঝায় না, কারণ অত্যন্ত গরম। এতক্ষণ সূর্যতপে দাঁড়িয়ে থাকলে মুখ লাল হয়। তার ওপর ওর মুখের স্বাভাবিক রঙই লাল।

মরিসকে সবাই ভালো লোক বলেই জানে। সবাই ওর কাছে উপদেশ চায়; মরিসের উপদেশও বেশ ভালোই। মরিস ছিল debrouillard অর্থাৎ যে কোনো জটিল অবস্থাতেও সচেতন হয়ে উঠতে পারত। অপরের জন্য সে মাথা ঘামাত, অনেককে সে সাহায্য করত আর সর্বদাই অপরের জন্য বিব্রত হয়ে থাকত। কিন্তু সীমার ব্যাপারে মরিসের এই ভালোত্ব অন্তর্হিত হত।

তবু এই লোকটি সীমার বাবার অনুগত ছিল। মরিস বলত, তিনি ছিলেন জাউরেসের মত একজন আদর্শবাদী রোমান্টিক্, কিন্তু একজন প্রকৃত কমরেড ছিলেন। মরিসের কাছ থেকে এর চেয়ে উচ্চ প্রশংসা কেউ প্রত্যাশা করতে পারেনা। অথচ প্রতিমুহূর্তে সুযোগ পেলেই মরিস সীমাকে অপমান করে—পীয়্যর প্লানকার্ডের মেয়ে হিসাবে মরিস ওকে গণ্য করেনা, বিচার করে ভিলা মনরেপো পরিবারের একজন হিসাবে, শক্তিশালী ও বড়দরের লোকজনদের অন্যতম, মরিসের শত্রুদের একজন।

মরিস যে কি করাতে চায় ওকে দিয়ে কে জানে। সকল প্রকার সহৃদয়তার বিনিময়ে প্রস্পার খুড়ো চান যে সীমা তাঁর হয়ে কিছু কাজ করে। এটা তাঁর প্রাপ্য। নিজের কাজ সে করে বলে মরিসের এই কটু উক্তি তার নীচতার পরিচায়ক।

ওর চোখে কেন সে এত ঘৃণ্য ? উদ্ধত হলেও মরিস অন্যান্য মেয়েদের প্রতি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। লোকে বলে ওর অনেক বান্ধবী আছে।

মাঝে মাঝে সীমার লোভ হয় মরিসকে একপাশে ডেকে জেনে নেয় কেন সে তাকে এত অপছন্দ করে। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখে চুপ করে থাকে। এখনও তাই মরিস যে তাকে কতখানি আঘাত করল তা বুঝতে দেয় না।

অবিচলিত ভঙ্গীতে পাম্পের ধারে দাঁড়িয়ে সীমা নিজের কর্তব্য সাধন করে। সীমা "লোক ভোলাচ্ছে"। এখন আবার অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশী করেই কাজ করছে, আগামী কাল পুনরায় এই কাজই করবে। তার পরদিনও তাই। সীমার নিজস্ব গর্ব আছে। একদিন হয়ত মরিস বুঝবে সে সীমার সম্পর্কে অবিচার করেছে।

অফিসের প্রবেশদ্বারে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে সীমা তাকালো। নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে ঘড়ির কাঁটা মেপে পুরা ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও আঠারো মিনিট বাকী, তার আগে ও যেতে পারবেনা।

দীর্ঘ আঠারো মিনিট—সীমার লাল্‌চে ঘর্মাক্ত মুখখানি বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল—কিন্তু তার প্রশস্ত ও দৃঢ় ভ্রূযুগের পিছনে বিভ্রান্তিকর চিন্তা ও ছবি ভেসে এসে তাকে উৎপীড়িত করে তুলছিল। প্রস্‌পার খুড়ো আর "ফ্যাসিস্ত" স্ট্যাটালিন গোপন অফিসঘরে বসে কারবারের কথা কইছেন। বাগানের ভিতর সেই ছেলেটির হাতে রাবেলকন চীজটুকু দেওয়া ;—ইস্পাতের একচেটিয়া কারবার ; দু'শ পরিবার, আর কালো পোশাক আর গলায় সাদা ফ্রিল-দেওয়া টুপীওয়ালা উকীলের দল আর তাদের চাতুরী। সকল মেয়েদের সঙ্গেই মিত্রভাবাপন্ন অথচ তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মরিস আর তার বিষাক্ত বাক্যবাণ। পতাকার পাশে আদর্শবাদী ও রোমান্টিক জীন জাউরেসের কলোসসের মত প্রকাণ্ড ছবি আর সেই ছবির নীচে আরামকেদারায় বসে মাথা নাড়ছেন সহায়হীন, বৃদ্ধ পেরী বাসটিড।

আরো সাত মিনিট···

অবশেষে সময় কাটলো, সীমা এবার যেতে পারে। দৃঢ় এবং কঠিন পদক্ষেপে সীমা প্রাঙ্গন পার হতে লাগল, মরিস উদ্ধত জোরালো কণ্ঠে বলে উঠল—"গুড বাই, মাম্‌সল।" এই মামুলী কথাটি যেন প্রচণ্ড আঘাতের মত হয়ে বাজল। সীমা জবাবে বলল—"গুড্ বাই।" সীমা মামুলি ভঙ্গীতে জবাব দিবার কঠিন প্রয়াস করল। কিন্তু তার কণ্ঠ গভীর ও সুরেলা, প্লানকার্ড পরিবারের সুন্দর কণ্ঠের অধিকারিণী সে,—এই কণ্ঠস্বর একটা তীব্র প্রতিবাদের মত শোনাল।

অফিসঘরে চাবী রেখে সীমা বেরিয়ে পড়ল। ডেপুটি প্রিফেকটরের অফিস থেকে সীমা ঝুড়িটি তুলে নিল—এখন আবহাওয়া অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—তবু পথ অনেক দীর্ঘ ও উত্তপ্ত, আর বোঝাটিও বেশ ভারি।

তিন

ভিলা মনরেপো

সীমা ঘরে প্রবেশ করল—বেশ ভাল করে গা ধুয়ে সীমা নৈশ—আহারের জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। ও এখন বাদামী পোশাকের ওপর একটি আবরণ জড়িয়ে নিয়েছে। পরিবারের সকলের সঙ্গেই ও খায় বটে কিন্তু রান্নার সম্পূর্ণতার জন্য বা পরিবেশনের জন্য প্রায়ই ওকে রান্নাঘরে যেতে হ'ত।

প্রস্পার খুড়ো আজ অন্য দিনের চাইতেও দেরীতে ফিরবেন ; হয়ত অনেক দেরী হবে, সকালেই তিনি সে কথা জানিয়েছেন। মাদাম, প্রসপার খুড়োর মা, এখনও তাঁর ঘরে বসে আছেন। তাই সীমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নেওয়ার অবসর পেল।

তার দীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন, কর্ম-কর্কশ হাত দুটি কোলে রেখে সীমা কিছুক্ষণ অলসভাবে চুপ করে বসে রইল। হট্টগোল ও উত্তেজনায় সীমা একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে এখন শুধু খাওয়া আর ডিস ধোয়ার কাজটুকু বাকী।

ঘরটি ধূসর ও শান্ত—বেশ প্রশস্ত—ওরা বলে "ব্লু রুম"—রাজসিক বার্গেণ্ডীয় আসবাবে সুসজ্জিত। আগে প্লানকার্ডরা পুরনো শহরে থাকতেন, প্রস্পার খুড়ো কয়েক বছর হ'ল অফিস থেকে দূরে শহরের পূর্বপ্রান্তে এই আরামপ্রদ প্রাসাদ তৈরী করে নাম দিয়েছেন "ভিলা মনরেপো।" বাড়িটীর চারধারে ফাঁকা জমি—এখানে একদিক থেকে চক্রাকার সেরিন উপত্যকার চমৎকার অরণ্য ও পার্বত্য দৃশ্য, আর অপর-দিকে নৈরেটের ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়।

ছোট একখানি চেয়ারে সীমা বসে ছিল। প্লানকার্ড পরিবারে স্বীয় স্থান যে অনেক নীচে সে বিষয়ে সে সচেতন ; দরিদ্র আত্মীয়কে ত' ওরা অনুগ্রহ করে রেখেছেন। ডাইনিং রুম বা খাবার ঘরের পর্দাশোভিত প্রকাণ্ড দরজা খোলা রয়েছে, সীমা স্বভাববশতঃ একবার টেবিলের দিকে তাকায়। অত্যন্ত যত্নসহকারে সে টেবিল সাজিয়েছে, কারণ ভিলা মনরেপোয় চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখে আহার করা হয়। অনেক প্লেট, অনেক গ্লাস, অনেক রূপার বাসনপত্র ; প্রতিটি দ্রব্য যথাস্থানে সাজানো। পূর্বদিনে আহার্য-তালিকা বেশ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সীমা দ্রুতগতিতে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে নিল—শামুক ধরবার চিমটা, হাত ধোবার জন্য 'ফিংগার বাউল', শ্বেতমদিরা 'স্যাবলে' বরফের পাত্রে রাখা আছে, ভেড়ার ঠ্যাঙের পাত্রটি আবার অতিরিক্ত গরম হওয়া চাই, রক্তবর্ণ মদিরা "পমার" যথোচিত টেম্পারেচারে রাখা হয়েছে। স্যালাড পাত্র ও তার কাষ্ঠময় সাজসজ্জা রান্নাঘরে হাতের কাছেই রাখা হয়েছে। সারভিল স্যালাড কাটা হয়ে গেছে—ওটা অবশ্য পরিবেশন শুরু করার আগে কাটা উচিত, কিন্তু তাহলে রোস্ট আর স্যালাডের মধ্যে বিরতি একটু দীর্ঘ হয়ে পড়ে। সাইড-বোর্ডে অরেঞ্জ মার্মালেড ও লিকিয়োর মদ সাজানো আছে—প্রস্পার খুড়ো স্বয়ং আহারান্তে টেবিলে বসে এই মার্মালেড খাওয়ার রেওয়াজ করেছেন।

ঘরটি বেশ অন্ধকার হয়ে এল। নিষ্প্রদীপ আইন-অনুসারে সীমা ইতিমধ্যেই অন্যান্য ঘরের খড়খড়ি বন্ধ করে পর্দা নামিয়ে দিয়েছে। এই ব্লু রুম ও ডাইনিং রুমে মাদাম নেমে এলে পর পর্দা বন্ধ করা হবে—বিজলী আলোর চাইতে গোধূলির ম্লান জ্যোতি সীমার বড় ভালো লাগে।

মাদাম ঘরে এলেন।

অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী ও ভারী হওয়া সত্ত্বেও মাদাম এমনই নিঃশব্দ পদ-

ক্ষেপে চলাফেরা করেন যে সীমার বিস্ময় লাগে। তাঁর পদক্ষেপের চাইতেও নিঃশ্বাসের আওয়াজ জোর।

যথারীতি মাদাম একটি কালো সিল্কের পোশাক পরেছেন, চুলগুলি সুন্দরভাবে আঁচড়ানো—সব চুল অবশ্য ঠিক শাদা নয়, তবে কাঁচা-পাকায় মেশানো। মাদাম ষাট বছরের গোড়ার দিকে পা দিয়েছেন বা মাঝামাঝি পৌঁছেচেন। সীমা ঠিক জানতো না, ভিলা মনরেপোতে মাদামের বয়স কোনোদিন উল্লিখিত হত না।

সীমা উঠে দাঁড়াল। মাদাম কোমল কণ্ঠে বললেন—'পর্দাগুলো টেনে দাও।' মাদাম সর্বদাই বেশ নম্র, কখনো উত্তেজিত হন না, অন্ততঃ বাহ্যতঃ তার প্রকাশ নেই, আর কদাচিৎ কাউকে বকেন বা ধমকান। তবু মাদাম যখন কিছু হুকুম করেন তখন তা ভর্ৎসনার মত শোনায়। মাদামকে দেখলে সীমার মনে হ'ত, মাদাম যেন তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ মেলে ওর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।

সীমা পর্দা নামিয়ে দিয়ে দুটি ঘরেরই আলোর সুইচ টিপে দিল। আলোর বাল্‌বগুলি বড় ও উজ্জ্বল; মাদাম উজ্জ্বল আলো পছন্দ করেন। সীমা ছোট্ট চেয়ারটিতে পুনরায় বসে পড়ল। কিন্তু এখন আর বিশ্রাম নয়, তার অবসরকালের অবসান ঘটেছে, এখন আবার কাজ করতে হবে।

মাদামও চেয়ারে বসেছেন, প্রতিদিন এইভাবে প্রস্‌পার খুড়োর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় তিনি বসে থাকেন। মাদাম তেমন লম্বা নন—তবে বপুর আয়তন বিশাল, চেয়ারটিতে বেশ সেঁটে বসেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র কঠিন চোখদুটি সীমার প্রতি নিবদ্ধ না হলেও সীমা তাঁর উপস্থিতিতে নিজেকে ক্ষুদ্র ও উৎপীড়িত মনে করে। মাদাম তেমন বলিয়ে কইয়ে নন—বেশী কথা বলেন না, দেহের ওজনের জন্য ভারী নিঃশ্বাস ছাড়ছেন ও নীরব প্রতীক্ষায় শান্তভাবে বসে আছেন।

সীমা জানে এই শান্ত ভঙ্গিমাটুকু কৃত্রিম। প্রসপার খুড়ো অবিবাহিত, কিন্তু সাধু নন; মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার পথে কোন স্ত্রীলোকের বাড়ি গিয়ে উঠেন। সম্প্রতি গ্যারাজ প্রাঙ্গনে ডাক্তার মিমেরেলস, যিনি যুদ্ধে গিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে খুড়োর অবৈধ সংসর্গের কথা নিয়ে নানাবিধ কানাকানি হচ্ছে। মাদাম সম্ভবতঃ এইসব গুজবের কথা জানেন। মাদাম বহু লোকজনের সঙ্গে মেশেন না বটে তবে তাঁর টেলিফোন আছে, সংবাদপত্র পড়েন আর সেণ্ট মার্টিন থেকে তাঁর দুটি বৃদ্ধা বান্ধবী মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন। অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে মাদাম দুই আর দুয়ে চার করতে পারেন, ঘটনা ঘটবার পূর্বেই অনেক সময় তিনি তার সংবাদ পেয়ে যান। তিনি তাঁর ছেলেটীকে ভালোবাসেন, প্রসপার খুড়োকে কেন্দ্র করেই তাই তাঁর সকল চিন্তা—প্রতি পনের মিনিট অন্তর তিনি ভাবেন খুড়ো কোথায় আছেন বা কোথায় থাকতে পারেন, বা কি করছেন। প্রসপার খুড়োর এই ধরনের জীবনযাপন-প্রণালী যে মাদাম পছন্দ করেন না সীমা তা জানে।

মাদামের এই বাহ্যিক প্রশান্তির পিছনে দৌর্বল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সীমা বোঝে। প্রসপার খুড়ো দেরীতে ফিরবেন একথা তাঁকে জানিয়ে গেছেন, বর্তমানকালে এই রকম ঘটাই স্বাভাবিক। আজকের দিনে যে প্রসপার খুড়ো তাঁর বান্ধবীর কাছে গেছেন, তা এক প্রকার অসম্ভব। তবু প্রতি মুহূর্তেই ঐ শয়তানী মাদাম মিমেরেলসের জন্যই যে প্রসপার খুড়ো তাঁর মাকে অপেক্ষমানা রেখেছেন এই সন্দেহই বেড়ে চলল।

উজ্জ্বল বিজলী আলোর নীচে কালো পোশাক পরে মাদাম নিঃশব্দে তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। মাথাটি চেয়ারের পিঠে চেপে দেওয়া হয়েছে, তদ্দ্বারা বিরাট গালগলা আরো বিশাল হয়ে উঠেছে,—পেট, পা সবই যেন ফুলো বেলুনের একটা সম্পূর্ণ অংশ—চেয়ারের হাতলে হাত দুটি নামান; ব্যক্তি ও আরাম-কেদারা এক হয়ে মিশে আছে। ঘন

ঘন জোরে নিঃশ্বাস বইছে, কিন্তু মাদাম যেন প্রকাণ্ড পুতুলের মত চুপ করে বসে আছেন।

মাদাম প্লানকার্ড ও তাঁর ছেলের প্রকৃতিতে কি বিস্ময়কর বিভিন্নতা, প্রস্পার খুড়ো তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির অনেকখানি হয়ত তাঁর পিতৃ-পুরুষের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকবেন।

প্রস্পার খুড়োর বাবা, সীমার পিতামহ ও মাদামের স্বামী বৃদ্ধ মঁসিয়ে হেনরী প্লানকার্ডের প্রথম বিবাহের সন্তান পীয়্যর প্লানকার্ড সীমার বাবা ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেণ্ট মার্টিনের সর্বাপেক্ষা ধনী ও সম্মানিতা কুমারী মাদাম, হেনরীর মত কপর্দকহীন, ন' বছরের সন্তান-সমেত একজন বিপত্নীককে বিবাহ করেছেন।

সীমা আর একবার তার এই পিতামহের সম্পর্কে যা জানা ছিল সেই সব কথা চিন্তা করতে লাগল—লোকে বলত তিনি ছিলেন কল্পনা-বিলাসী, প্রিয়দর্শন, বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহশীল, নিজের ব্যবসার বাইরে অনেক ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক ছিল—আর ছিলেন ভীষণ খরচে। মাদাম এদিকে কঠিন, কঠোর, দৃঢ়চিত্ত আর কঞ্জুস, হয়ত উভয়ের মধ্যে তেমন বনিবনা ছিলনা। প্রসপার খুড়োর চরিত্রের যে অংশটুকু মাদাম অপছন্দ করেন আর সীমা পছন্দ করে তা হয়ত এই হেনরী প্লানকার্ডের চরিত্র থেকেই খুড়ো পেয়েছেন।

অবশেষে স্তব্ধতা ভেঙে মাদাম বললেন—"রবেলকন পাওয়া গেলনা —ছেলেটা কি যে খাবে?" মাদাম বরাবরই খুড়োকে ছেলেটা বা মঁসিয়ে প্লানকার্ড বলে উল্লেখ করেন। সীমা একথার কোনো উত্তর দিল না। তার মুখখানিও লজ্জারুণ হয়ে উঠল না, বরং আরও ভাবাবেগ-হীন হয়ে উঠল। রবেলকন থাকলে সীমা আবার সেই বালকটিকেই দিত।

মাদাম সহসা বলে উঠলেন—"শহরের হালচাল কি?" সাধারণতঃ

তিনি সীমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতেন না, সোজাসুজি নিজস্বসূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এখন টেলিফোন সংযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শহরের সঙ্গে মাদাম সম্পর্করহিত হয়ে পড়েছেন—অথচ আন্তরিক উদ্বেগ এমনই প্রবল যে আর কৌতূহল নীরবে চাপা যায় না।

শরণাগতদের দৃশ্য কি গভীরভাবে সীমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে সে কথা সীমা মাদামকে জানাতে নারাজ। সীমা মোটামুটিভাবে জানাল যে শরণাগতদের সংখ্যা বেড়েছে আর তারা ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে উঠেছে। সেণ্ট মার্টিন থেকে অনেকে পালিয়েছেন—মঁসিয়ে এমিয়ট, লা রোশ, রেইমু, আরো অনেকে।

সেই উজ্জ্বল আলোকে মাদামের আকৃতি অবিচলিত দেখা গেল, শুধু তাঁর বিশাল বক্ষ মৃদুভাবে আন্দোলিত হ'তে লাগল। তিনি বললেন—"একটা সিগারেট দাও।" সীমা বুঝলো সংবাদটা কিভাবে তাঁকে আকুল করে তুলেছে, কেননা তিনি কদাচিৎ সিগারেট খেয়ে থাকেন, আর উত্তেজিত হয়ে উঠলে খান।

সীমার কথার প্রতিধ্বনি করে মাদাম বললেন—"ওরা তা হ'লে পালাচ্ছে, যে যার প্রাণ নিয়ে ছুটছে"—মাদামের সুবিশাল মুখ থেকে শান্ত, কোমল কণ্ঠে তিরস্কারসূচক ভঙ্গীতে এই কথাগুলি উচ্চারিত হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন—"এতটুকু ডিসিপ্লিন নেই, আজকের ফ্রান্সে আর নিয়মানুবর্তিতা নেই। আমি মঁসিয়ে লা রোশ ও রেইমুর ব্যবহারে হতাশ হয়েছি, বিশেষতঃ মঁসিয়ে এমিয়টের কাণ্ড দেখে। এই রকম সময়ে যে দোকানদার খদ্দেরদের পথে বসিয়ে দোকান ছেড়ে পালায়, সে দলত্যাগী সৈনিকের মত অপরাধী—সময় আবার স্বাভাবিক হলে ওর খরিদ্দারও ওকে ত্যাগ করবে। মানুষ যেমন নির্বোধ তেমনই কাপুরুষ হয়ে উঠেছে।"

মাদাম ধূমপান করছেন। মাংসস্তূপের ভিতর থেকে ওঁর ছোট ছোট

চোখগুলি চক্‌চক্‌ করছে—সীমা সামনের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে। তার ভয় মাদাম ওর মুখে বিরক্তির ভাব যেন লক্ষ্য করতে না পান। সীমা ভাবছে এই গরমের ভিতর যে ছেলেটি বিড়াল নিয়ে চলেছে তার কথা, দুর্দশার দুঃসহ ভারবাহী ফ্রান্সের রাজপথ, ক্লান্ত সৈন্যদল ও তাদের রক্তাক্ত চরণ, সেই ভিড়ের ভিতর যে মেয়েটি এনামেল পেরাম্বুলেটারের কাদা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে তার কথা—এই সব লোক সম্পর্কে মাদামের উক্তি "ওরা পালাচ্ছে, প্রাণ নিয়ে ছুটছে, যত কাপুরুষের দল..."

মাদাম সহসা বলে উঠলেন—"বেয়াদবি কোরোনা—।" মাদাম বেশ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কিন্তু সীমা চমকে উঠল ও লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। মাদাম যেন কোন অলৌকিক শক্তিবশে প্রতিটি অবাধ্য চিন্তা বুঝতে পারেন। তাঁর কাছে অবাধ্যতা ও বেয়াদবি একই কথা। মাদামের চোখে গুরুতর অপরাধ। সীমার বাবা অবাধ্য ছিলেন, তাই ধ্বংস হয়েছেন। মাদামের মুখে "বেয়াদপি কোরোনা" এইটিই হল সবচেয়ে কঠোর কথা।

উভয়ে নীরব রইল।

মাদামের পীড়াদায়ক উপস্থিতিতে এই ভাবে বসে থাকাও কষ্টকর। সীমা মনে মনে প্রস্‌পার খুড়োর উপস্থিতি কামনা করছিল। প্রস্‌পার খুড়োর সঙ্গে সময় কাটানোও খুব সহজ নয়—তিনি আবার ভীষণ ভাবাপ্রবণ—বেশ আছেন, কিন্তু চটলে এমন সব অন্যায় কথা বলেন যাতে সীমার রাগ হয়। তবে উনি সীমাকে ভালোবাসেন—আর সাধারণতঃ সীমার প্রতি ওঁর ব্যবহার আন্তরিক বন্ধুভাবাপন্ন। মাঝে মাঝে উনি সীমাকে বয়স্কের মত বিবেচনা করে অনেক গোপন কথা বলেন, এত গোপন যে সীমা বিব্রত বোধ করে, যেমন সিনেমায় গিয়ে অভিনেত্রীর স্ত্রীসুলভ গুণাগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ। তবু এই

লোকটির মুখ চেয়েই সে মাঝে মাঝে, আর মাঝে মাঝেই বা কেন, সর্বদা আশায় বুক বেঁধে থাকে। কিন্তু মাদাম চিরদিনই ওর কাছে যেন অদ্ভুত ও বৈরভাবাপন্ন হয়ে রইলেন। ওঁর দিকে তাকালেই সীমা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে মাদাম বললেন -"রেডিয়োটা খুলে দাও।" সীমা আদেশ পালন করল। রেডিয়ো থেকে মার্শাই সঙ্গীতের সুর ভেসে এল, সংবাদ ঘোষণার মাঝে মাঝে এখন কেবল এই সুরই শোনা যায় "Aux armes, citoyens"। উভয়েই অপেক্ষা করতে লাগল—মঁসিয়ে প্লানকার্ড ও রেডিয়োর সংবাদ শোনার জন্য।

সীমার অস্বস্তির শেষ নাই। রেডিয়োটা পর্যন্ত খুলতে সাহস হ'চ্ছে না, রোডিওর ভিতর থেকে মাঝে মাঝে মার্সাই সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সুস্থভাবে কিছু চিন্তা করারও যেন অবসর মেলে না। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের নীচে ছোট্ট চেয়ারটিতে বসে সীমা ভাবে, এই ভাবে বসে থাকা আর অপেক্ষা করা অসহনীয়।

বাগানে অবশেষে পদধ্বনি শোনা যায়। সামনের দরজায় ছুটে গিয়ে সীমা অন্ধকারের ভিতর খুড়োকে পথের নির্দেশ দেয়।

এঁকে দেখার সঙ্গেই সীমার সমস্ত শঙ্কা ও উদ্বেগ দূর হয়। বাড়িটার রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায় সেই মুহূর্তে—শবাধারের মত আর নিষ্প্রাণ নয় এখন এ বাড়ি প্রাণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

মাদাম বসেই আছেন, প্রস্‌পার খুড়ো তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গত দু বছরে উনি একটু ভারী হয়ে উঠেছেন, তবে ওঁর গতিভঙ্গী পুরুষোচিত ও সতেজত্বটুকু একটু চেষ্টাকৃত। ধূসর পোশাকে ওঁকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে, সযত্নে এবং সুরুচিসঙ্গত ভাবে পোশাক পরিধান করতে ভালবাসেন। মাদামকে খুড়ো ভক্তিভরে আলিঙ্গন করলেন, সীমা লক্ষ্য করল মাদাম খুড়োর বেশ-বাসের ভিতর সুগন্ধির রেশ আছে কিনা

বোঝার জন্য বিশেষ ভাবে আঘ্রাণ নিতে লাগলেন, এইভাবে বুঝবেন খুড়ো কোনো স্ত্রীলোকের কাছে গিয়েছিলেন কিনা।

খুড়ো বললেন—"হেঁটেই বাড়ি আসতে হ'ল আমাকে, গাড়ি করে পথ দিয়ে আসা অসম্ভব। হেঁটে আমার উপকার হয়েছে।"—তারপর একটু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন--"আর ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। এখনই খেয়ে নেওয়া যাক। হাতটা ধুয়ে আসি। তোমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছ। এখন একটু ভালো কিছু হওয়া প্রয়োজন।"

সবাই খেতে বসলেন, পরিতৃপ্তি সহকারে পরিপাটি ভাবে খেতে খেতে খুড়ো সারাদিনের ঘটনাবলী বিবৃত করতে থাকেন।

তিনি বলতে লাগলেন—শোনা যাচ্ছে, হট্টগোল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বসেরাই (জার্মানগণ) অতিরিক্ত ফরাসী অঞ্চল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে, এই নির্দেশ নাকি ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসেনি। যাই হোক, লোকের আতঙ্কটুকু সংক্রামক, অর্ধেক ফ্রান্স আজ পলায়নশীল, সব রাস্তায় ভিড় ও হট্টগোল, সামরিক চলাচলের গতিরোধ হচ্ছে, সরকার কিছুতেই অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারছেন না, বহু হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ওঁর চোখে পড়েছে, তাঁর মতে পলাতকদের প্রতি অযথা কারুণ্যের আধিক্য দেখাতে গিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন না করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সমীচীন হয়নি। আর কোন উপায় না থাকলে অন্ততঃ এই শরণাগতদের বলপ্রয়োগ করে পথ থেকে সরানো উচিত ছিল।

উনি বসে আছেন, স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুন্দর ওঁর আকৃতি। সীমা অপেক্ষা করে আছে মাদাম ও প্রসপার খুড়োর এই পর্যায়টি শেষ হলেই তাড়াতাড়ি প্লেট বদলে রোস্ট পরিবেশন করতে হবে, আর সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনে চলেছে।

সীমা শুনতে লাগল, উনি বলছেন—আমি অবশ্য খুশি যে এই কঠোর

নীতি গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হইনি! আমরা যে মানবীয় অনুভূতি প্রকাশে সমর্থ হয়েছি এই ভালো।

খুড়ো একটু ঝুঁকে বসলেন, তাঁর পুরুষোচিত মুখে একটু কুণ্ঠামিশ্রিত হাসি, তিনি বলতে লাগলেন—"আমি একটা কথাই বলে ফেলি মা, ডেপুটি প্রিফেকটারের হাতে এই শরণাগতদের ব্যবহারের জন্য আমি দুখানি গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, বিনা সর্তেই দিয়ে দিলুম, না দিয়ে পারলাম না।"

সীমার অন্তর উষ্ণ হয়ে উঠল। ওর বাবার গলার স্বরও নিশ্চয় এমনই শোনাতো। প্রসপার খুড়োর অনেক কিছুই ওর বাবার সমতুল্য; লালচে ধরনের ঘন চুল, প্রাণবান নীলাভ চোখ আর ভ্রূ, সুগঠিত ঠোঁট। অনেকে উভয়ের আকৃতির এই সাদৃশ্যের জন্য অনেকে বলেন ওঁকে পেরী প্লানকার্ডের সহোদর ভাই বলেই মনে হয়। আর এখন স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ঈষৎ লজ্জিত মুখখানিতে সীমা তার পিতৃদেবের আকৃতির সাদৃশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

মাদাম তার ক্ষুদ্র সন্ধানী চোখ তুলে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—আমার মনে হয় এর জন্য অতি সামান্য ধন্যবাদই তোমার মিলবে—অবশেষে বললেন, "তুমি অতি ভালোমানুষ, শাদা মন তোমার, এই সময় এভাবে দুখানি গাড়ি হাতছাড়া করা কি একটু অবিবেচনার কাজ হয়নি?"

খুড়ো হাসলেন, বললেন—"একটু অবিবেচকই হ'লাম মা।"

সীমা ডিস উঠিয়ে নিয়ে রোস্ট পরিবেশনের আয়োজন করতে লাগল। রোস্ট নিয়ে আসতে আসতে সীমার কানে গেল, খুড়ো বলছেন, এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জাতীয় কর্তব্য। স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবসা চালিয়ে গেলে জনসাধারণ অনেকেই শান্ত থাকে। অফিস বা দোকান পত্রের দরজা খোলা থাকার একটা শান্তিকর প্রতিক্রিয়া হয়।

এই যে এতসব ব্যবসায়ীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছেন তার একটা বিশ্রী ফল হয়েছে।

উত্তপ্ত প্লেটে লাল এবং রসাল মেষ মাংসের টুক্‌রো পড়ে রয়েছে, চারদিকে তার বাদামী রঙের সুগন্ধি ঝোল সুদীর্ঘ গ্লাসে ঘন লাল রঙের ফরসী মদিরা সাজানো রয়েছে।

খুড়ো খেতে খেতে বলে চলেছেন—একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে একটা গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত। সেণ্ট-মার্টিনের চার-পাশের অঞ্চলগুলির কোনো সামরিক গুরুত্ব না থাকলেও বসেরা (জার্মানরা) তবু তা অধিকার করতে পারে!

মাদাম তাঁর মৃদু অথচ কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন—দু চারজন ভদ্রলোক অবশ্য সেই অবস্থাই হবে ধরে নিয়েছেন, আমি শুনেছি কয়েকজন ভদ্রলোক শহর ছেড়ে পালিয়েছেন।

প্রসপার খুড়ো সমর্থন করে বলেন—"হাঁ তাই ত হয়েছে, ভেবে দেখো মা আমাদের বুক কীপার পেরু, এমনিতে কেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সেও কিনা ভালমানুষটির মত এসে জানতে চাইছে আমিও কোথাও যাব নাকি।"

মাদাম ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন—"এই সাধারণ রামা শ্যামার দলকে আমরা যতটা নির্বোধ ভাবি ওরা তার চাইতে অনেক বেশী আহাম্মক। আমি ত' বুঝি না বাড়ির চাইতে রাজপথ কি হিসাবে অধিক নিরাপদ। আর বসেরা যদি আসে, তাহলে আমাদের হত্যা করে ওদের কি লাভ হতে পারে। আমরা বেঁচে থাকলে ত' ওদেরই লাভ বেশী।"

রোস্ট-খাওয়া শেষ হ'ল, সীমা সালাড বানিয়ে দিয়ে খুড়োকে সাহায্য করে। খুড়ো ডিসের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর কান ঠিক সীমার মুখের কাছে, কানটি ওপর দিকটায় সরু আর আশ্চর্য রকমের পুরু।

সহসা পিতা ও পিতৃব্যের আকৃতিগত পার্থক্যের কথা সীমার মনে জাগে। যখন ওঁর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, যখন উনি বেশ ছড়িয়ে বসেন তখন সতাত ভায়ের চাইতে মাদামের আকৃতির সঙ্গে ওঁর মিল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সীমা প্লেটগুলি নিয়ে যায়, তারপর প্যানকেক নিয়ে ফিরে আসতে আসতে শোনে খুড়ো স্যাটালিনের আগমন-বার্তা তাঁর মাকে শোনাচ্ছেন।

সীমা জানতো তার খুড়ো আর মার্কুইস ডি সেণ্ট ব্রিসনের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক মতভেদ আছে, কিন্তু এই জাতীয় আভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা সামাজিক সংযোগ রাখতে তিনি গর্ব বোধ করেন। মাঝে মাঝে মার্কুইস প্লানকার্ড অফিসে পদার্পণ করলে খুড়ো তা স্মরণীয় ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আজকের ঘটনাও সেই হিসাবে স্মরণীয়। সেই কারণেই আজকের এই আগমন-বার্তা সম্পর্কে খুড়োর আগ্রহ লক্ষ্য করে সীমা বিস্ময় বোধ করছিল। এই আগমন মঁসিয়ে এমিয়ট বা মঁসিয়ে লা রোসের আগমনের মতই একটা সাধারণ ঘটনা এমন ভাবেই খুড়ো এই ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর মাদামও সেই ভঙ্গীতেই কথা বলছেন। সহসা মাদাম বললেন—"হ্যাঁ, এখন দেখছি স্যাটালিন পথে এসেছেন।"

কথা কইতে কইতে খুড়ো খাবার সাজিয়ে নিতে লাগলেন। পানকেকে লিকিয়োর মদ ঢেলে স্টোভে গরম কতে কতে বললেন—মার্কুইস ওর দ্রাক্ষাকুঞ্জের সমস্ত মদ বেয়নের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নিরাপদ অংশে রেখে আসতে চান। এই দুঃসময়ে খুড়ো বেশ উদার ভঙ্গীতে কথা বলতে লাগলেন। রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও বিপৎকালে পুরাতন খরিদ্দারকে সাহায্য করাই ত উচিত। তারপর খুড়ো শ্লেষ সহকারে বললেন—তবে মার্কুইস ব্যাপারটি যত সহজ ভাবছেন তত সহজ ত' নয়।

সীমা খুশি হ'ল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে খুড়ো স্যাটালিনের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। সীমার মনে পড়ল মরিস দম্ভভরে বলেছিল —"আমি এক বোতল পেনরাদ মদ বাজী ধরছি, মার্কুইস তাঁর মদ সরাবার জন্য আমাদের লরী পাবেন, দেখে নিও।"

সীমা বরাবরই জানে মরিস্ মিথ্যাবাদী ও নিন্দুক।

সীমার পিঠ চাপড়ে প্রস্পার খুড়ো বললেন—"আমাদের সীমা অবশ্য তাই চায়।" সীমার মুখখানি লজ্জারক্ত হয়ে উঠে। ছোটবেলায় খুড়ো মাঝে মাঝে ওকে কোলে বসিয়ে রাখতেন, আদর করতেন, পিঠ চাপড়ে আদর করার অভ্যাসটুকু আজো আছে। এখন অবশ্য সীমার কাছে এই আদর সময় বিশেষে উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে।

মাখন ও চিনি মণ্ডিত হয়ে, সুমিষ্ট সুবাসযুক্ত পানকেক প্লেটের উপর পড়ে থাকে। সহসা মুহূর্তের জন্য প্লাস্ দ্যু জেনারেল গ্রামোর বাস্তুহারা কণ্টকিত দৃশ্য সীমার চক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই উজ্জ্বল আলোশোভিত প্রশস্তকক্ষে বসে এঁরা রোস্ট ল্যাম্ব আর প্যানকেক প্রভৃতি উত্তম খাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে করতে বেশ শান্তভাবে গল্প করে চলেছেন, প্লাস দ্যু জেনারেলের সেই দৃশ্যের কাছে এই দৃশ্য কৃত্রিম মনে হয়।

প্রস্পার খুড়ো বলে উঠলেন—আমার ত' মনে হয় না আজ বিনা বাধায় আহার শেষ করতে পারবো। ফিলিপে আসবে বলেছে—ফিলিপে এই দেশের ডেপুটি-প্রিফেকট্। মাদাম সবিস্ময়ে মুখ তুললেন। মঁসিয়ে প্লানকার্ড বলতে লাগলেন, "ফিলিপে কাল আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে এসেছিল। ভেবে দেখলাম এসব আলোচনা গোপনে হওয়াই ভালো। গভর্ণমেণ্ট থেকে আমার লরীগুলো সব ভাড়া নিতে চায়।"

মাদামের বিস্ময়ের ঘোর কাটে। মাদাম চশমাটি তুলে সন্তানের

মুখখানি নিরীক্ষণ করেন—তারপর শুধু বললেন—ও লা—লা! তাও কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য ভরে।

কিন্তু বিস্ময়ে সীমার মুখখানি বিভ্রান্ত হয়ে উঠল, এই সংবাদটুকু হজম করতে তার কিছু সময় লাগলো। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত ক'রে সীমা কিছুক্ষণ ব্যাপারটি চিন্তা করল।

লোডিং-ইয়ার্ডে কয়েকদিন আগে কানা ঘুষায় শোনা গেছল সরকার নিতান্ত প্রয়োজন কালে লরীগুলি রিকুইজিসন করে নিতে পারেন। এখন হয়ত ডেপুটি-প্রিফেকট প্লানকার্ডদের সব লরী শরণাগতদের জন্য সরকারী ভাবে নিয়ে যেতে চান, সেই সময় এসেছে এবার। তবে মঁসিয়ে কর্ডেলিয়ারের সঙ্গে প্রস্‌পার খুড়োর খুবই হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আছে উভয়ের ভিতর। প্রস্‌পার খুড়ো এদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, নির্বাচনের সময় তিনি সরকার পক্ষকে বিশেষ মূল্যবান সাহায্য করেছেন। ডেপুটি প্রিফেক্ট এই প্রভাবশালী লোকটিকে অসন্তুষ্ট করতে চান না, তাই এই রাত্রে এত দূরের পথ মনরেপোয় ছুটে আসছেন। প্রসপার খুড়োর সঙ্গে তিনি একটা আপোষে বন্দোবস্ত করতে চান।

তরুণী সীমার কপালের রেখা গভীরতর হয়ে ওঠে। বয়সের অনুপাতে ওকে একটু অধিক বয়স্কা বলেই মনে হয়। প্রস্‌পার খুড়োর গাড়ি দান সম্পর্কে তবে কি ও ভুল বুঝেছে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও মরিসের কুৎসিত ইঙ্গিত মনে পড়ে—"খুড়ো এখন হঠাৎ সদাশয় হয়ে উঠেছেন, পাছে সরকার আরো গাড়ি চেয়ে বসে, তাই দু'খানি গাড়ি তাড়াতাড়ি দিয়েছেন।"

খুড়ো বললেন—শরণাগত সরাবার জন্য আমার তরফ থেকে যতটুকু করা দরকার—আমি অবশ্য তা করতে চাই, তবে কি ভাবে তা করতে হবে তা আমিই স্থির করব। আমার কাছ থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে নেওয়া অবশ্য ঠিক হবে না, একটু বাড়াবাড়ি হবে, কি বলো মা, তাই

না? আর ফিলিপে এত ড্রাইভারই বা পাবে কোথায়? এই সব লরী কোথায় পাঠাবে? আমি অবশ্য গভর্ণমেণ্টের বন্ধু ও সমর্থক, তবে এই বিপৎকালে সরকারী চাল চলবে না। এই রকম সঙ্কটের সময় আমলাতন্ত্র বা কলম পেষার দল অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের হাতে সব ভার ছেড়ে দিলেই কাজ সুশৃঙ্খলায় চলবে। প্রকৃত অবস্থা ব্যবসায়ীরাই জানেন।"

তাঁর গভীর বিষাদপূর্ণ কণ্ঠস্বরে দৃঢতার সুর ধ্বনিত হল। সীমা তাঁর মুখে এ ধরনের কথা অনেকবার শুনেছে। খুড়ো সত্যই বিশ্বাস করেন যে তিনি চেষ্টা করলে ডেপুটি প্রিফেকটের চাইতে সুচারু ভাবে শরণাগত চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু সীমা কিছুতেই মরিসের কথা ভুলতে পারে না, বিশেষতঃ প্রস্পার খুড়ো সম্পর্কে "মাথামোটা বুড়ো" বলে যে ভাবে শ্লেষোক্তি করে ওঠে।

ভবিষ্যতে যে কি ঘটতে পারে সে কথা কল্পনা করার সীমার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সীমা দেখতে পেল স্যাটালিনের মদের পিপে বোঝাই হয়ে প্ল্যানকার্ড কোম্পানীর সুগঠিত ও সুদৃঢ় লরীগুলি শরণাগতদের ভীড় ঠেলে চলেছে। অভিজ্ঞ ড্রাইভার, জ্বালানী তেল ও বাড়তি অংশাবলী দিয়ে কৌশল সহকারে লরীগুলি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। সীমা যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেল পলাতকের দল উদাস ও অবসন্নের মত নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে সেই লরীগুলির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে।

প্রসপার খুড়ো খাওয়া শেষ করলেন, তবু একখণ্ড প্যানকেক তখনও প্লেটে পড়ে রয়েছে। সীমা টেবিল পরিষ্কার করবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই খুড়ো প্লেটের ওপর হাত চাপা দিয়ে হালকা ধরনের আনজু মদ্য ঢেলে নিয়ে বললেন—"আর একটু বাকী আছে মা, এটুক শেষ করতে দাও।"

খুড়ো সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন—আজ তুমিই গ্যারাজে পেট্রল বিক্রী

করেছ !”—খুড়ো খুশি হয়েছেন, কারণ আজ পেট্রল পাম্পে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। সময় থাকতে—প্রচুর পেট্রল কিনে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তার সুফলভোগ করছেন। এই সময়টিতে যে যার স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত। খুড়ো ঝুঁকে পড়ে কোলের ওপর থেকে ন্যাপকিন্‌টা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। সীমার দিকে তিনি প্রসন্ন চোখে তাকালেন—সীমা কিঞ্চিৎ লজ্জানুভব করে। সহসা সীমার ডাক্তার মিমারেলসের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, তাঁর বেশ দোহারা চেহারা। প্রসপার খুড়ো একদিন সীমাকে বলেছিলেন—“হুইপেট কুকুরের মত যেন রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি।”

সারাদিনের কাজের অবসানে, বাড়ির লোকজনের ভিতর প্রাণ খুলে কথা বলার এই একটু অবসর। উত্তম আহারেই শ্রান্তি ঘোচে, খুড়ো বেশ নম্রভাবে কথা বলছেন, তারপর তাঁর হালকা রঙের মদের গ্লাসটি প্রথমে মাদাম ও পরে সীমার দিকে তুলে ধরলেন।

শেষ গ্রাস মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বাগানে পদধ্বনি শোনা গেল। খুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যাই হোক, আহার শেষ হয়ে গেছে—-তারপর মুখ পুঁছতে লাগলেন, আর সীমা দরজা খুলে দিতে এগিয়ে গেল।

হলের আলোয় ডেপুটি প্রিফেকট মঁসিয়ে ফিলিপে কর্ডোলিয়র চক্ষু কুঞ্চিত করলেন। এই দীর্ঘাকৃতি, কৃশ ও ঈষৎ অবনত ভদ্র-লোকটিকে সর্বদাই কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন দেখা যায়, আজ যেন কিছু উত্তেজিত বোধ হচ্ছে। যান্ত্রিক গতিতে নিজের জামায় লিজিঁন অব অনারের প্রতীকের দিকে আঙুল দেখিয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—‘গুড ইভ্‌নিং খুকী, পথ দিয়ে আশা আজ কঠিন ব্যাপার।’ সীমা ওঁর ছড়িটি হাতে করে নিল। সীমাকে চাইতে আত্মগত ভাবে উনি ভিড় ঠেলে

পথ করে আসার কষ্ট বলতে লাগলেন। প্রতি পদক্ষেপে জনতা আর গাড়ির ওপর ধাক্কা লাগে, এটুকু পথ আসতে প্রায় আধঘণ্টার ওপর সময় লেগেছে। একবার ত' পথ হারিয়ে গিয়েছিল। ওঁর ম্লান চোখ দুটি এখনও বোজানো।

সীমা ওকে ডাইনিং-রুমে নিয়ে এল। মঁসিয়ে প্লানকার্ড অত্যন্ত আতিশয্য সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন। যদিচ বহুবার এই ডেপুটি প্রিফেক্টকে তাদৃশ বুদ্ধিমান নয় বলে উনি বর্ণনা করেছেন, তবু তাঁকে পদোচিত যথারীতি মর্যাদা ও সম্মান দেখাতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তাঁর অদ্যকার এই শালীনতা মাঝে মাঝে বিদ্রূপ মিশ্রিত, কখনও বা তার ভিতর বশংবদত্বের ভাবও প্রকাশ পাচ্ছে।

ফিলিপের কাঁধ চাপড়ে খুড়ো বললেন—"পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, কি বল! আগে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও। আমরা এখনও কফি পাইনি, আমাদের সঙ্গে এক কাপ কফি হোক—কেমন!"

মাদাম ভদ্র এবং শীতল কণ্ঠে বললেন—"আমরা এই ব্লু রুমেই কফি সীমা।" এখন আর তিনি তাঁর স্বামীর পৌত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন না, কথা বলছেন এ বাড়ির দাসীর সঙ্গে।

সীমা টেবল পরিষ্কার করে কফি তৈরী করতে লাগল। কফির পাত্র, কাপ প্রভৃতি নিয়ে সীমা ঘরে ঢুকল; তখন দেখা গেল ওরা বেশ গুছিয়ে বসে ধূমপান করছেন। মাদামও ধূমপান করছেন। আজ রাত্রে এই নিয়ে দুবার হল, অথচ ওর পক্ষে এটা ভালো নয়। সীমা জানে মাদাম কেন এই ঝুঁকি নিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনাকালে মাদাম বরাবরই ধূমপান করে থাকেন, এতে করে উনি চিন্তা করার সুযোগ পান একটু বেশী, আলোচনার তীক্ষ্ণ জবাব ভেবে নিতে পারেন।

যদিও রাত্রির গভীরতা ও দিনের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় মাদাম ক্লান্ত

হয়ে পড়েছেন, তবু তিনি চেয়ারে তাঁর ভারী দেহ নিয়ে বেশ সোজা হয়ে বসেছেন। জোড়া চিবুক দেখা যাচ্ছে, আকৃতিতে ক্লান্তির লক্ষণ নেই। বোঝা গেল ডেপুটি প্রিফেকটও তাঁর ছেলের ভিতরকার এই আলোচনায় উনি অংশ গ্রহণ করতে চান। সীমা যখন কফি ঢেলে দিয়ে গমনোদ্যত, মাদাম তাকে উদ্দেশ করে বললেন—ডাইনিং-রুমের দরজাটা বন্ধ করে দাও সীমা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই আলোচনার কিছু অংশ সীমার কানে যায় তা মাদামের ইচ্ছা নয়।

দরজা বন্ধ থাকা সত্বেও বাসন ধোবার সময় এই ঘরের—কথাবার্তার অংশ সীমার কানে পৌছয়। মঁসিয়ে কার্ডেলিয়রের উত্তেজিত কণ্ঠের চড়া স্বর ভেসে আসছে, বোঝা যাচ্ছে উনি সমস্ত লরী সরকারে সমর্পণ করতে বলছেন। প্রস্পার খুড়োও উত্তেজিত হয়ে জবাব দিচ্ছেন, তিনিও বেশ উচ্চকণ্ঠে এবং দ্রুততালে কথা বলছেন, তাঁর গলার স্বাভাবিকত্ব হ্রাস পেয়েছে। তারপর সম্পূর্ণ স্তব্ধতা, সীমা বোঝে এবার মাদাম কথা বলবেন। মাদাম যখন কথা বলেন, তা সে যতই নরম করে বলুন না কেন, সবাই তা নীরবে শুনবে।

সীমা অবশ্য এই আলোচনার গতি অনুমানে বুঝেছিল, আর কিভাবে যে এই আলোচনা শেষ হবে তাও সে জানে। প্লানকার্ড কোম্পানী ও ডেপুটি প্রিফেকটের মধ্যেও বহুবার মতানৈক্য ঘটেছে, তবে মঁসিয়ে লে সুস-প্রিফেকট্ তা নিয়ে বেশী টানাটানি করেন নি। আজও তিনি বিশেষ কিছু করবেন না, বিশেষতঃ মাদাম যখন এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সীমার কানে বাজল "আমি একবোতল পেনরদ বাজী ধরছি, শরণাগতেরা লরী পাবেনা।" মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফক্টের ঐ এক কাপ কফি ও একটু কগন্যাগই আজকের এই পরিশ্রমের একমাত্র পুরস্কার।

কিন্তু প্রস্পার খুড়োকে এতখানি বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে দেখা ওর উচিত

নয়। মরিসের মতো কুটিল চোখে খুড়োকে বিচার করা ঠিক হবেনা। সে ত' সবাইকে বিদ্রূপ করে, নিন্দা করে। প্রস্‌পার খুড়ো মাননীয়, সদ্‌গুণ ভূষিত, সেণ্ট-মার্টিনের একজন হিতৈষী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। আর তিনি সত্যই তাই. চিরদিনই তিনি সীমার কাছে পিতৃতুল্য। যে ভাবে তিনি সীমার সর্বপ্রকার বাল-সুলভ আবদার ও খেয়াল পরিপূর্ণ করেছেন তার আনন্দময় সুখস্মৃতি সীমার হৃদয় আন্দোলিত করে। প্যারিতে থাকার সময় তিনি কি উদার ব্যবহারই না করেছেন! সীমার জন্য সময়, অর্থ, বা প্রচেষ্টা কিছুরই তিনি এতটুকু ত্রুটি রাখেন নি। ভ্রমণটি মধুর করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সব জায়গায় তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, অপেরায় গিয়েছে, দোকানে দেখা ভালো জিনিস কিছু কিনতে চাইলে উনি তা কিনে দিয়েছেন। ওর সকল খেয়ালই উনি বেশ সহজ ভাবে মেনে নিয়েছেন। সীমার মনে পড়ে, নতর—দামে খুড়ো ওকে নিয়ে একেবারে ওপরে উঠতে চেয়েছিলেন, আর সে বিনা কারণেই সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তাঁকে অবশ্য বলতে পারেনি যে অতীতের সুমধুর পিতৃস্মৃতি অম্লান রাখতে চায়, খুড়ো কিন্তু অধিক পীড়াপীড়ি না করে সীমার কথাই মেনে নিয়েছিলেন। কোনো সন্ধ্যায় একা বেড়াতে যাবার পূর্বে সীমা যাতে নিঃসঙ্গ না থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এই রকম এক সন্ধ্যায় খুড়োর ব্যবসা সংক্রান্ত একজন বন্ধুর পরিবারবর্গের সঙ্গে সীমা লুভরে গিয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যায় সমস্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি আলোক মালায় সজ্জিত ছিল।

"উইংগড ভিকট্রি"র প্রতিমূর্তির প্রতি সে কি ভাবে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়েছিল, সে কথা মনে পড়ে। এই রমণীমূর্তির বিচিত্র মুখখানির কথা ভেবে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতে হয়েছে।

প্রসপারখুড়োর সঙ্গে প্যারীতে সত্যই অদ্ভুত ভাবে সময় কেটেছে।

তিনি অনেক কিছু করেছেন। অপরের জন্য কোনো কিছু করলে তিনি সর্বদাই আনন্দবোধ করতেন।

কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার! তিনি ওকে ভালবাসেন, অথচ মাদাম যেরকম বিদ্বেষপূর্ণ ও নিস্পৃহ ব্যবহার করেন তার প্রতিবাদ করেন না। সীমার অবশ্য অন্তরে কোনো দ্বিধা নেই, এই জাতীয় দাসীবৃত্তির জন্য তার কোনো রকম ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই—মাদাম মাঝে মাঝে তাকে অকারণ কাজ চাপিয়ে দেয়, সে যে সাধারণ দাসীমাত্র এই কথাটুকু বোঝানোর জন্য যেন এই চাপ। প্রস্‌পার খুড়ো কেন তাতে বাধা দেন না?

হয়ত উনি মাদামের সঙ্গে কলহ করতে চান না। মাদাম অত্যন্ত চতুর, উনি তাঁকে ভয় করেন। কোনো প্রকার ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা মাদামের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি সম্পাদন করতেন না। মাদাম অবশ্য অন্য কিছু করতে অনুমতি দেবেন না কোনো দিন। কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার মাদামের নিজস্ব, আর যদিও তিনি বলতেন যে কোম্পানীর সর্বপ্রধান কর্মকর্তা ওঁর ছেলে, কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রসপার-খুড়োর দ্বারা কার্য পরিচালনার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

প্রসপারখুড়োর মনোভঙ্গী সীমা বোঝে, তবু সে এই ভেবে ব্যথা ও বেদনা অনুভব করে যে মাদামের আক্রমণের প্রতিরোধে তিনি কোনোদিন দাঁড়াবেন না। মাদামের উপস্থিতিতেও তিনি ওর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন বটে, তবে তাঁর স্নেহের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় মাদামের অসাক্ষাতে যখন উভয়ে একা থাকে।

সীমা কি অকৃতজ্ঞ! সারা সন্ধ্যা ধরে সে মনে মনে প্রসপার খুড়োর ত্রুটি সন্ধান করেছে ও সেই নিয়ে চিন্তা করেছে। মরিস যখন সব কিছু নিয়ে ইয়ারকি করছিল, তখন সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু মরিসের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায়?

ওর বাবাও অবশ্য বরাবর খুঁতখুঁতে প্রকৃতির ছিলেন, অতৃপ্ত স্বভাব। তাঁর বিরুদ্ধে এইটাই ছিল অভিযোগ, সর্ব বিষয়ে তিনি নাক সিঁটকাতেন, দোষ ধরতেন, তিনি নাকি স্বভাবতঃই অবাধ্য ছিলেন. পীয়্যর প্লানকার্ড, একগুঁয়ে আর অবাধ্য। তাঁর এই অবাধ্যতা এত প্রবল ছিল যে আজ আর তিনি বেঁচে নেই, সব চুকে বুকে গেছে। এই ত্রুটী আবিষ্কারের 'বদ অভ্যাসে'র ফলেই তাঁকে রহস্যময় মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে হয়েছে। লোকে যে আজ তাকে স্মরণ করে, তাঁকে সম্মান জানায়, তার হেতু ত্রুটী বিচ্যুতির ওপর তাঁর নজর ছিল।

মরিস নিশ্চয়ই মনে করে সীমা তার বাপের চরিত্রগত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী হয়নি। নিশ্চয়ই সে মনে করে যে 'ভিলা-মনরেপো' এই ধরনের একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতাকে গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচনা করে, তার প্রতি সীমার সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। কিন্তু সত্যই কি তার সমর্থন আছে? সেও কি তার পরলোকগত পিতৃদেবের মত একজন বিদ্রোহী, অবাধ্য ও একগুঁয়ে নয়?

বাইরের ঘরে কণ্ঠস্বর আবার চড়া পর্দায় উঠল, ডেপুটি প্রিফেকটের সেক্রেটারি মঁসিয়ে জাভিয়ের একবার বলেছিলেন মঁসিয়ে কর্ডেলিয়র লোকটি চমৎকার, কিন্তু তাঁর আপোষপ্রবণতা ও সিদ্ধান্তহীনতার ফলেই সব জিনিস কেঁচে যায়। সীমা নিজেই-ত' ভুক্তভোগী! মঁসিয়ে লে-স্যুস প্রিফেক্ট বরাবরই বলতেন পীয়্যর প্লানকার্ডকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তারপর তাঁর স্মৃতিফলক বসানোর প্রশ্নে আইনজীবী লেভাতুরের প্রতিবাদে অবশেষে নতি স্বীকার করলেন! প্রসপার খুড়ো সেই সময় বেশ বুদ্ধি-মানের মত কাজ করলেন, সম্ভবতঃ মাদামের প্ররোচনায়। খুড়ো বলেছিলেন পীয়্যর প্লানকার্ডের ভাই হিসাবে তাঁর পক্ষে ভোটদান করা বা স্মৃতিফলক-সংক্রান্ত কোনো প্রকার কাজ করা শোভন ও সঙ্গত নয়, তাই তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিরপেক্ষ হয়ে রইলেন।

একথা নিশ্চিত, প্রবল প্রতিবাদের মুখে কোনো কিছু মতবাদ গ্রাহ্য করানো তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। প্ল্যানকার্ড কোম্পানী তাঁকে লরী দেবে না, সীমা শুনতে পেল কথার মধ্য পথে তিনি থেমে গেলেন, মাদাম কথা বলে চলেছেন।

ডিস ধোয়া শেষ হবার পূর্বেই ঘরে মাদাম এসে দাঁড়ালেন। রান্না-ঘরের ভিতরটিতে স্থূল বপুটি নিয়ে এগিয়ে এসে সীমার মুখপানে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে পরিষ্কৃত ডিসের বোঝাগুলির দিকে একবার ও অপরিষ্কৃত রূপার বাসনের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন।

মাদামের নিঃশ্বাস ও কল থেকে জল পড়ার শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নাই।

রূপার চিমটা সাফ করতে লাগল সীমা। সীমা অবশ্য এমন কিছু অন্যায় করেনি যার জন্য তিরস্কৃত হ'তে পারে, তবু মাদামের এই চাউনিতে সে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল! সীমা চায় মাদাম যা বলবেন বলেই ফেলুন না হয়।

সেই ভারী মুখ থেকে অবশেষে কোমল কণ্ঠ ধ্বনিত হল—যেমন আছে রেখে দাও, কাল হবে'খন। রাত্তির অনেক হয়েছে, তোমার এখন ঘুমানো দরকার।

সীমা বিস্মিত হল।—আগে কোনোদিন মাদাম এতখানি করুণা প্রদর্শন করেন নি, এত বিবেচকের মত কথা বলেন নি।

সীমা হাত মুছতে মুছতে বলল - ধন্যবাদ মাদাম। বোঝা গেল মাদাম একটু ভীত হয়েছেন 'ব্লু রুমে'র কথা পাছে শোনা যায় এই ভয়।

সীমা পুনরায় বলল—'গুড নাইট মাদাম'—তারপর শুতে গেল।

চার

বই

"ভিলা মনরেপোর" অপরাপর কক্ষগুলির মত সীমার ঘরটিতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যর প্রাচুর্য ছিল না, ছোট্ট সাদা একখানি অনাড়ম্বর ঘর, দাসী-চাকরের ব্যবহারোপযোগী। ঘরে আসবাবের ভিতর কয়েকখানি বই, দেয়ালগাত্রে পীয়্যর প্লানকার্ডের একটি মলিন হরিদ্রাভ ফটোগ্রাফ, "হিউম্যানিটি" সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিটি কেটে নিয়ে বাঁধান হয়েছে, ছবিটির ছাপা খারাপ, পিছনদিককার ছাপার কালি এ পিঠে ফুটে এসেছে। ঘরে সেণ্ট-মার্টিনের একটি রঙীন ছবির প্রতিলিপি, অশ্বপৃষ্ঠস্থিত সেণ্ট মার্টিন ভিক্ষুককে নিজের কোট দিচ্ছেন। আর একটি ছাপা ছবি, তার বিষয়বস্তু বহুবর্ণে রঞ্জিত নেপোলিয়ঁর শবাধারের পাশে দুটি শ্মশ্রু-বিশিষ্ট গ্রিনেডিয়ার গার্ড দাঁড়িয়ে, তাদের গুম্ফ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত। আর একটি ছবি লুভর ম্যুজিয়মের "উংগড্ ভিক্‌টরী"র প্রতিলিপি, প্রসপার খুড়োর স্নেহের দান।

সীমা কাপড় ছাড়লো, হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে আলোর সুইচ নিভিয়ে দিল। নীচ থেকে রেডিয়োর আওয়াজ ভেসে আসছে, অস্পষ্ট কথা, হয়ত সংবাদ বলা হচ্ছে, একটু শোনা গেল, তারপর বিরতির পরে মার্সাই সঙ্গীতের দু কলি, অস্পষ্ট ভাবেই শোনা গেল, সীমা শুধু অনুমানে বুঝল। এলার্ম ঘড়ির আওয়াজ হচ্ছে অত্যন্ত মৃদু স্বরে, বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। এই রাত্রিটি বেশ গরম। সীমা অতিশয় ক্লান্ত, আশা ছিল ঘুমাতে পারবে, কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই বুঝল ঘুম সহজে আসবে না।

পেরী বাসটিড যে বইগুলি দিয়েছেন লোভজনকভাবে তা চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, আলোটা জ্বালিয়ে একটু পড়বে নাকি?

সীমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে মাদাম অবশ্য তা পছন্দ করেন না, সকল প্রকার অধীত জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা, কোনো 'মতবাদে' তাঁর বিশ্বাস নেই, যদিচ কদাচিৎ উল্লিখিত হয়, তবু সীমা জানে যে মাদাম মনে করেন যে অতিরিক্ত বিদগ্ধতার ফলেই পীয়্যর প্লানকার্ডের মৃত্যু ঘটেছে।

নিজের দিক থেকে সীমা বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে ইচ্ছুক ছিল। স্কুলে পড়ার সময় ওর শিক্ষয়িত্রী মামসেল রুসেল ওকে কিন্তু অলস ও অমনোযোগী মনে করতেন। সীমা যে খারাপ ছাত্রী ছিল তা নয়, তবে মামসেল রুসেলের ধারণা ছিল আর একটু খাটলে ও পরীক্ষায় আরো ভালো ফললাভ করত। সীমা কিন্তু অলস ছিল না। ও ছিল একটু মন্থরগতি, যা পড়ে নিত তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করে রাখত, আর কি ভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে তা জানত।

সীমা বরাবরই পড়াশোনা করতে ভালোবাসে আর মাদাম এই 'বই পড়ার বাতিক' বা ম্যানিয়া মোটেই পছন্দ করেন না। মাদাম এখনই কাজ থেকে মুক্ত করে ওকে শুতে পাঠিয়েছেন যাতে ও একটু বিশ্রাম পায়, এখন বিছানায় শুয়ে বই পড়লে মাদাম অসন্তুষ্ট হবেন।

কিন্তু এই অন্ধকার উত্তপ্ত কক্ষে সীমা আর নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না, উপস্থিত মাদাম মঁসিয়ে লে-স্যুস প্রিফেক্টের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত আছেন, তাঁর যাবার সময় বুঝে সীমা আলো নিভিয়ে দেবে, মাদাম বুঝতে পারবেন না।

সীমা আলো জেলে দিয়ে পেরী বাসটিডের দেওয়া বইগুলি তুলে নিল, বইগুলি অরলিনের কুমারী জোন-অব-আর্ক-চরিত। সীমা জোন-অব-আর্ক চরিত্র পড়তে ভালোবাসে, পেরী বাসটিড তার জন্য সন্তুষ্ট, তাই তিনি সীমাকে এই ধরনের বইই দেন।

এইবার যে তিনখানি বই তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে একখানি বেশ বড়, পেরী বাসটিড বইটিকে বেশ সুন্দর কালো চামড়ায় বাঁধিয়েছেন, বইখানি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেই কারণে কিঞ্চিৎ নীরস। দ্বিতীয় বইখানি সুচারু-ভাবে লাল চামড়ায় বাঁধানো, নীল চামড়া দিয়ে কোণগুলি মোড়া। বইটি সহজে পড়া যায়, চমৎকার লাগে, চমকপ্রদ, আর অনেক কৌতূহলদ্দীপক ছবিও থাকে। তৃতীয় গ্রন্থখানি ছোট, এণ্টিক বাঁধাই, আগাগোড়া সোনার জলের অলংকারমণ্ডিত, বইখানি ছিন্নপ্রায়, বহু-পঠিত। জোন সম্পর্কিত মর্মস্পর্শী কথা ও কাহিনীর সংকলন।

এই জোন-অব-আর্ক মেয়েটির জীবনকথা কি সরল ও মধুর, তার সম্পর্কে কত গ্রন্থই না রচিত হয়েছে। জোনের মাত্র উনিশ বছর বয়স হয়েছিল, সীমার চাইতে মাত্র চার বছর বেশী, তার জীবনের সমগ্র কাহিনী মাত্র তিন বছরের ভিতর সীমাবদ্ধ, কয়েকটি কথায় সবটুকুই বলা যায়। তবু পণ্ডিতজন নিয়তই জোনের চরিত্র ও তৎকালীন সময় এবং তার অদৃষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষ্য করে চলেছেন।

মাঝে মাঝে সীমার মনে হ'ত এই সব পণ্ডিতদের চেয়ে জোন-অব আর্ক চরিত্র সে বেশী বোঝে। এই কুমারী সম্পর্কে সব কিছু সে আগ্রহভরে পড়ে আর সর্বদাই তার মনে হয় এই জীবনী থেকে সে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করে।

সীমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, সব সাল তারিখ তার ঠিকঠিক মনে থাকে। ডমরেমির জ্যাকোস-দ্-আর্কের মেয়ে জোন ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটি নম্র, প্রফুল্ল, শক্তসমর্থ ও কর্মপটু ছিল। এই সময়েই সন্তজনের বাণী তার কানে পৌঁছায়, ফলে সে তাদের জেলার গভর্ণরের কাছে গেল। তিনি তাকে পাঠালেন ডাফিন চার্লস দি সেভেন্থের কাছে সন্তজনের বাণী অনুসারে, আর তাঁকে রাজা হিসাবে প্রতিস্থাপিত করার জন্য। ডাফিন তাঁর সৈন্যদলের

ভার জোনের ওপর ছেড়ে দিলেন, এই সৈন্য নিয়েই তিনি ইংরাজ শত্রুদের পরাজিত করে, অরলিন্সের অধিকৃত নগরী তাদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। ট্রয়ীস ও অন্যান্য শহর অধিকার করে রেইমসে সন্ত-বাণীর নির্দেশানুসারে ডাফিনকে সম্রাট হিসাবে অভিসিক্ত করলেন। এরপর অবশ্য, রাজদরবারে জোন অপ্রয়োজীয় বিবেচিত হ'ল, তাঁরা ওর ক্ষমতা হ্রাস করলেন, সৈন্যদের পদচ্যুত করলেন। যে সৈন্য নিয়ে জোন প্যারী আক্রমণ করল তা পর্যাপ্ত নয়, সে আহত হ'ল, আক্রমণও নিষ্ফল হ'ল। কম্পিন শহর মুক্ত করার জন্য জোন চেষ্টা করল, কিন্তু যখন শহর-প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে তখন তারই স্বদলভুক্ত লোকজন শহরের গেট বন্ধ করে দিল, শহরসংলগ্ন ঝোলানো সেতু উঠিয়ে নিল, আর জোন ইংর্যাজদের মিত্র কাউণ্ট অব লুক্সেমবার্গ কর্তৃক ধৃত হ'ল। দশহাজার রৌপ্যখণ্ডের বিনিময়ে তিনি ওকে ইংরাজদের কাছে বিক্রী করে দিলেন। ইংরাজরা তাকে বিচারের জন্য এক বিশেষ-অনুসন্ধান-কারী আদালতে সোপর্দ করল। ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বিচার ৯ই জানুয়ারী থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত চলল—তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দণ্ড প্রদত্ত হ'ল। সেই বছরের ৩০শে মে এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন জোনের বয়স মাত্র উনিশ বছর।

স্বাস্থ্যবতী একহারা চেহারার পনের বছরের মেয়ে সীমা প্লানকার্ড সুন্দর পুরু বিছানার চাদরের উপর শুয়ে আছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সীমা, পরনে খাটো নাইট গাউন, কনুই দুটিকে ভর দিয়ে অরলিনের মেয়ে জোন-অব-আর্কের-কাহিনী পড়ছে, পাশে চুনকাম-করা দেয়ালে সেট মার্টিন, তার স্বর্গীয় পিতা পীয়ার প্লানকার্ড, নেপোলিয়ঁর শোকনিমগ্ন গ্রিনেডিয়ারদ্বয়ও ল্যুভরের বিজয়লক্ষ্মী মূর্তির প্রতিচ্ছবি।

এই কাহিনী সীমার সুপরিচিত, তাই সে যথারীতি পাতার পর

পাতা না পড়ে পাতা উলটিয়ে যেটুকু তার ভালো লাগছিল সেইটুকু বেছে নিয়ে পড়ছিল।

ডাফিনের দরবারের প্রাচুর্যের ভিতর থাকার সময় জোন কি আনন্দে ছিল—কি রকমের সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে সে সাজতো, তার অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্য, তার পতাকার মহার্ঘতা, এই সব পড়তে লাগল সীমা। ২৫ লায়ারের বিনিময়ে স্কচ শিল্পী হ্যামিশ পাওয়ার তার জন্য ২খানি পতাকা এঁকে দিয়েছিল।. বড়টি শাদা সাটিনের, তার ওপর সিংহাসনারূঢ় খৃষ্টের প্রতিলিপি, পিছনে ফ্রান্সের প্রতীক লিলিফুল; ছোটটি স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েল কর্তৃক কুমারী মেরীর নিকট যিশু খৃষ্টের নবকলেবর ধারণের সমাচার জ্ঞাপনের প্রতিলিপি, দেবদূত ম্যাডোনার হাতে লিলিফুল দিচ্ছেন।

সীমা পড়েছিল জোন কঠিন, কঠোর, বিরাট ছিলেন, তবে সুন্দরী ছিলেন না। লালরঙের বাঁধানো চমৎকার বইটিতে সীমা জোনের ছবি নিরীক্ষণ করতে লাগল। ডমরেমির ম্যাজিয়মে প্রলম্বিত মূর্তির প্রতিলিপি। গ্রন্থটিতে লেখা হয়েছে যে জোনের মৃত্যুর কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এই মূর্তি নির্মিত হয়। মূর্তিতে প্রদর্শিত পোষাক ইতিহাসসম্মত নয়, আর মূর্তিটি বিশ্রী ও কুৎসিত, কোন শিল্প নৈপুন্য নেই। সীমার কিন্তু এই ছবিটি ভালো লাগে। জোনকে নিশ্চয়ই এমনই দেখতে ছিল, সীমা কল্পনা নেত্রে ভাবে, একটু হয়ত কুশ্রী ছিল, সাধারণের চাইতে খারাপ নয়।

সীমা পড়েছিল—তার দলবলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোন ব্যবহারিকভাবে পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হতে ভালবাসত, পুরুযালি পরিচ্ছদ পছন্দ করত, ট্রাউজার পরত। আর পড়েছিল, প্রায়ই জোন দিনের পর দিন অঙ্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরাত না, আর সর্বদাই পুরুষদের সঙ্গে মিশে রূঢ় ইয়ারকি-ঠাট্টা উপভোগ করত। এদিকে আবার বলা হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রে

সজ্জিতা এই রূপহীনা রমণীর কণ্ঠ-স্বর অতিমিষ্ট ও রমণী সুলভ ছিল।

কিছুক্ষণের জন্য বইটি নামিয়ে রেখে সীমা ভাবতে লাগল।

আবার বইটি তুলে নিয়ে জোনের সময় এই দেশে কি দুর্দশা ও দুঃখের দিনই না এসেছিল এই কথা ভাবে সীমা। জোন সেই সময় সন্তজনের বাণী শুনেছিল। তখনকার কালে ফ্রান্সের চাষীদের কষ্ট ও দুর্দশার কথা পড়ছিল সীমা। তারা অভিযোগ জানিয়ে বলে— কি হবে আমাদের? আমরা যারা মাটির মানুষ?

যুদ্ধ করা ভিন্ন আর কোনো কাজ নেই, বিধাতা যখন সৈন্যদের পক্ষে, আমরা শয়তানের দিকে যেতে পারি। এই সব হানাহানিতে আমাদের কি আসে যায়? খারাপ শাসনব্যবস্থার ফলে আমাদের স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দিয়ে বনের ভিতর গিয়ে পরের মত লুকিয়ে থাকতে হবে। একবছর দুবছর নয়, প্রায় চৌদ্দ পনের বছর ধরে এই বেদনাদায়ক ব্যাপার চলল। ফ্রান্সের অধিকাংশ প্রধানরা তরবারি, বিষ বা ষড়যন্ত্রের ফলে প্রাণ হারালেন, এমন কি অন্তিমম্রক্ষণের (খৃষ্টান পুরোহিতরা মুমূর্ষুর বিভিন্ন অঙ্গে পবিত্র তৈল ম্রক্ষণ করেন।) সুবিধা পর্যন্ত তাঁরা পাননি। ক্রীশ্চানদের চাইতে সারাসেনদের দাসত্ব করলে আমরা ভালো থাকব। আর প্রভুদের কথায় কান দিয়ে কাজ নেই, গডনের দ্বারা ধৃত হয়ে মরা ছাড়া আর কি আমাদের অদৃষ্টে আছে? ইংরাজরা বারবার 'গড ড্যাম' এই শপথবাণী উচ্চারণ করার ফলে ওরা ইংরাজদের 'গডন' বলেই অভিহিত করত।

সীমা পড়ে চলে : মিউ অঞ্চলের কাছে একটা প্রকাণ্ড এলম গাছের কাছে গ্যাসকোনের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্যাসটার্ড অব ভরু চাষীদের ধরে ধরে ফাঁসী দিয়েছিলেন। যাদের ধরতে পেরেছেন তাদেরই মেরেছেন, যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি তাদেরই ফাঁসী হয়েছে। ঘোড়ার

সঙ্গে তাদের বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোড়া টানতে টানতে তাদের নিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে স্বহস্তে তাদের ফাঁসী দিয়েছেন।

একবার তিনি এক তরুণ চাষীকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দৌড়িয়ে মিউতে নিয়ে গিছলেন। তারপর তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এবং হাড় কখানা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই তরুণ চাষীর যা ছিল তার তিনগুণ বেশী দিতে স্বীকার করল। তার স্ত্রীকে খবর পাঠাল টাকা আনার জন্য। সেই বছরেই তাদের বিবাহ হয়েছে, স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা। স্বামীকে সে ভালোবাসে, তাই তার উৎপীড়কের হৃদয় গলানোর উদ্দেশ্যেই সে ছুটে এল। লর্ড অব ভরু বললেন—"নির্দিষ্ট দিনের ভিতর যদি তুমি মুক্তিপণ না আনতে পার, তা'হলে আমার এই গাছের গোড়ায় তাকে ফাঁসী দেওয়া হবে।" অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে মেয়েটি ছুটে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব টাকা সংগ্রহ করতে লেগে গেল—কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের পর সে সম্পূর্ণ টাকা সংগ্রহ করতে পারল। নির্দিষ্ট দিনে সেই নির্মম লোকটি মেয়েটির স্বামীকে এলম গাছের ডগায় ফাঁসী দিয়ে দিল, কোনো করুণা প্রদর্শন করল না। তরুণী এসে স্বামীর কথা বলল, মেয়েটি কাঁদছিল, দীর্ঘ পথশ্রমে সে ক্লান্ত, তার উপর সে অন্তঃসত্ত্বা—মেয়েটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবার পর সে পুনরায় স্বামীর কথা বলল। ওরা বলল—"ওরে হতভাগী, টাকা দাও, তবে দেখাব।" টাকা দেওয়ার পর তারা বলল—"তোর স্বামীকে আমরা আর সকলের মতই ফাঁসী দিয়ে দিয়েছি।"

এই কথায় মেয়েটি রাগে উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে কটুবাক্য প্রয়োগ করতে লাগল, আর সেই দুর্বৃত্ত পিশাচ ব্যাসটার্ড অব ভরু যখন এইসব কথা শুনল, তখন তাকে চাবুক মেরে তারপর ঘোড়ার পায়ে বেঁধে তাকে সেই এল্‌ম গাছের তলায় টেনে নিয়ে এল। সেখানে মেয়েটিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে গাছের সঙ্গে বাঁধা হ'ল, তার মাথার ওপর সেই গাছে

আশী থেকে একশ' নরদেহ ঝুলছিল, কিছু ওপরে আর কিছু নীচে। বাত্যাহত হয়ে নীচেকার সেই দেহগুলি বারবার তাকে স্পর্শ করতে লাগল, ভয়ে মেয়েটির পা অসাড় হয়ে গেল, যে দড়িতে সে বাঁধা ছিল সেই দড়ি গলায় কেটে বসল। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, "ভগবান! এ যন্ত্রণার শেষ কোথায়?" সেই অসহায় উৎপীড়িত প্রাণীর চীৎকার মিউ পর্যন্ত শোনা গেল—কিন্তু কে তাকে সাহায্য করতে আসবে?—এই ব্যথা ও বেদনার ভিতর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। চীৎকারে, ঠাণ্ডায়, হিমে, জলে সেই অবস্থাতেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। মেয়েটি প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, আর নেকড়ে বাঘেরা নরমাংসের আঘ্রাণ পেয়ে সেই নবজাত শিশু ও তার জননীকে উদরস্থ করল। এইভাবেই সেই অসহায় প্রাণীর জীবনাবসান হ'ল; এই ঘটনা ১৪২০ খৃঃ মার্চ মাসে লেণ্ট শহরে ঘটেছিল।

শত্রুঅধ্যুষিত তৎকালীন ফ্রান্সের এই অবস্থা সীমা পড়তে লাগল। এই কালে জোন-অব্-আর্ক দৈববাণী শুনেছিল।

এইসব দৈববাণীর কথা সীমা পড়েছে। জোনের কানে প্রায়ই এই দৈববাণী আসত। বিশেষতঃ তিনি যখন অরণ্যে। অবধূত মাইকেল এবং বিশেষতঃ মাদাম সেণ্ট ক্যাথারিন ও সেণ্ট মার্গারেটের বাণীই শোনা যেত।

আর এই সব বাণী ও আদেশ পালন করে জোন কিভাবে তার বৃদ্ধ আত্মীয় ডোরাণ্ড লাসোরের সাহায্যে ওদের জেলার শাসনকর্তা ফিল্ড কমাণ্ডার রবার্ট ডি বড্রিকোর্টের সন্ধানে গিয়েছিল সে কথাও সীমা পড়েছে। একটা সামান্য ছিন্ন মলিন লাল পোষাক ওর পরনে ছিল। ক্যাসেলে পৌঁছেই জোন নির্ভীক চিত্তে সার রবার্টের কাছে পৌঁছে বলেছিল—আমি আপনার কাছে অবধূতদের আদেশানুসারে এসেছি, আপনি ডাফিনকে খবর দিয়ে বলুন তিনি যেন চুপচাপ থাকেন এবং

কোনরকম সংঘর্ষে না প্রবৃত্ত হ'ন। শীঘ্রই অবধূতগণ সাহায্য পাঠাবেন।

সেনানায়ক গম্ভীর গলায় বললেন—"কে তোমার এই অবধূত?"

স্বর্গের যিনি অধিপতি,—জোন জবাব দেয়। "তিনিই আমাকে ডাফিনকে করনোসনে পরিচালনা করার নির্দেশ নিয়েছেন। আমাকে ডাফিনের কাছে যেতেই হবে, যদি আমার পা ছিঁড়ে যায় তাহ'লেও।"

এই মন্তব্যে স্যার ডি বডরিকোর্ট হেসে ফেটে পড়লেন ও মেয়েটির আত্মীয়দের বললেন, ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর বাপকে বলে বেশ করে কানমলা দিয়ে দাও।

জোন যখন যেতে চাইল না, তখন জেনারেল তার সৈন্যদের ডেকে বললেন, মেয়েটিকে কেউ উপভোগ করতে চাও ত' নাও। কিন্তু সৈন্যেরা তাকে দেখে সে রকম কোনো বাসনা প্রকাশ করল না। সীমা পড়লো, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এই কথা লেখা হয়েছে। প্রচলিত উপকথায় শোনা যায় পৈশাচিক সৈন্যদের কারো সাহস হয়নি তাকে স্পর্শ করতে।

কল্পনাবিলাসিনী সীমা কল্পনানেত্রে এই দৃশ্য অনুমান করতে লাগল, অমন মহামান্য লর্ড রবার্ট ডি বড্রিকোর্ট জোনকে দেখে তাঁর সৈন্যদের হাতে মেয়েটীকে ছেড়ে দিলেন, তখন হয়ত মরিস জাতীয় কোনো ব্যক্তি অশ্লীল ভঙ্গি প্রদর্শন করে থাকবে। আরো কল্পনা করতে ভালো লাগল যে তার মুখে কোনো কথা বোরোল না, বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

লর্ড রবার্টের সঙ্গে সাক্ষাতকারের পর বিফলমনোরথ হয়ে ফেরার পরবর্তী কাহিনী সম্পর্কে সীমা চিন্তা করে। বিষয়টি ত' সহজ নয়। যেমন ধরা যাক, ও নিজেই যদি এখন মাদামকে গিয়ে বলে যে সে এখনই কংগোতে গিয়ে কলোনী সংগঠকদের কি ভাবে দেশীয় লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত সেই সম্পর্কে উপদেশ দিতে যাবে তাহলে মাদাম নিশ্চয়ই বলবেন—নিজের কাজে যাও, বাজে বকো না। নথীপত্র থেকে

জানা যায়, জোনের বাবা বলেছিলেন, বরং তিনি মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারবেন, তবু সৈন্যদের রক্ষিতা হতে দেবেন না। যাই হোক, জোনের পিতামাতা নিশ্চয়ই মেয়েটিকে উৎকট রকমের দুঃসাহসী মনে করেছিলেন, হয়ত কমাণ্ডারের নির্দেশানুসারে মেয়েটির কান মলেও দিয়েছিলেন।

এই কারণেই সম্ভবতঃ জোনের পক্ষে ভালো হল যখন ও ফিরে আসার সঙ্গেই ওদের গ্রাম শত্রুরা আক্রমণ করল, আর গ্রামের সমগ্র অধিবাসী নিউফ-শ্যাটোতে গিয়ে আশ্রয় নিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই জোনের বাবার হয়ত মেয়েকে শাসন করার আর অবসর মেলেনি। তারপর এঁরা অবশেষে যেদিন ডমরোমিতে এসে পৌঁছলেন, দেখলেন ওদের গ্রামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। তখনও শত্রুরা আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, সুতরাং ওখানে থাকাও নিরাপদ নয়। পুনরায় ডমরোমি পরিত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত রইলেন।

সীমা ভাবলো সেই কালেও যুদ্ধে পলাতক ও শরণাগতদের ভিড় ছিল। ওরা পালালো, মিথ্যা নিরাপত্তার আশ্রয় নিল, পুনরায় পালালো। সেদিনও এ দিনের মতো অন্ধকারময় ছিল। হয়ত এতখানি অন্ধকার নয়। সীমা এখন যা দেখছে, সে দুর্দশা ও আতঙ্ককর অবস্থা জোনকে হয়ত দেখতে হয়নি। হয়ত বা দেখতে হয়েছিল, কে জানে? ঐ সব নেকড়ে বাঘের ব্যাপার! তখনও এখানকার মত জনসাধারণ কেঁদেছে, আমরা গরীব, আমাদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তবু জোন তাদের ত্যাগ করেনি, নিজের কর্তব্য ভোলেনি। "আমি দরিদ্রের জন্যে সান্ত্বনা ও শান্তির বাণী এনেছি" এই কথা তিনি বলেছিলেন, আর তা পালন করেছিলেন।

যে আত্মনির্ভরতার সঙ্গে জোন সৈন্য শিবিরে ঘুরে বেড়াত সীমা তা পড়েছে। অসংখ্য পুরুষের মাঝে একমাত্র নারী, অসংখ্য গণ্যমান্যদের মাঝে একজন অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে। সীমা পড়লো কি ভাবে

এইসব মহারথিদের, বড় বড় মার্শাল ও কর্নেলদের জোন দ্বিধালেশহীন চিত্তে হুকুম জানিয়ে যেত। শুধু নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই সে তাদের বড় বড় নাম আর লম্বা চওড়া উপাধিতে ঘাবড়িয়ে যায়নি। এই সব লর্ডবৃন্দ কিন্তু শুরু থেকেই ওর শত্রু ছিলেন। ওর সাফল্যে তাঁরা ঈর্ষান্বিত ও তাঁবেদারি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

যে লোকটি অত্যন্ত তীব্রভাবে জোনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেই ডিউক জর্জেস ছ্য লা ত্রেময়লের বিষয় সীমা পড়লো। ইনি ডাফিনের প্রিয় পাত্র ছিলেন ও সর্বদা কাছে কাছে থাকতেন। তিনি শক্তিশালী ও বিত্তবান ছিলেন, ডাফিন তাঁর কাছে ঋণী। আর ছ্য লা ত্রেময়ল অত্যন্ত চতুর, নিষ্ঠুর ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এ দিকে আবার তোষামোদপটু ছিলেন, কথাবার্তায় সতর্ক ও সকল রকম চাতুরীতে নিপুণ ছিলেন।

সাধারণে তাঁকে যতই সানন্দে গ্রহণ করুক না কেন, সীমা পড়লো যে রাজদরবারে বা সৈন্যশিবিরে জোনের মিত্রসংখ্যা খুব কমই ছিল। যাঁরা মিত্র ছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ ভদ্র শ্রেণীর ব্যক্তি। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন গিলে-ছ্য লাভাল রেইস নামেই পরিচিত। ফ্রান্সের তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। উপাধি ছিল "মেরেসাল" আর অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। লোকটির ইন্দ্রিয় চেতনা প্রবল ছিল, রূপকথার জাঁকজমক নিয়ে সময় কাটাতেন, শিল্পকলায় গভীর অনুরাগী ছিলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিজের যন্ত্রসংগীত সম্প্রদায়, নৃত্যপরায়ণ বালকদল ও অভিনেতাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকটি উন্নাসিক ছিলেন, গায়ে প্রাণোন্মাদক সুগন্ধি মাখতেন, নীল রঙে গুম্ফ শ্মশ্রু রঞ্জিত করতেন। তাই "ব্লু-বেয়ার্ড" নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। সীমা সবিস্ময়ে ভাবে, তিনিই বা কেন জোনের প্রতি আসক্ত ছিলেন আর জোনেরও তাঁর উপর অনুরাগ ছিল। ওরা

যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একথা নিশ্চিত। ওরা একই শিবিরে নিশাযাপন করতেন। অন্যান্য জেনারেলরাও থাকতেন। আর অরলিনে তিনি ডিউকের হিসাবরক্ষক জ্যাকোস্ বুসেরের সঙ্গে থাকতেন—পাশাপাশি ঘরে উভয়ে থাকতেন।

সহসা সীমার কানে আওয়াজ এল। তার যেন মনে হল, দরজা খুলল ও বন্ধ হল। মঁসিয়ে লে স্যুস প্রিফেক্ট হয়ত এবার চলে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি বইগুলি সরিয়ে রেখে সীমা আলো নিভিয়ে দিল।

হ্যাঁ, কাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তবে কোথা থেকে যে এই আওয়াজ আসছে তা বলা শক্ত। সীমা অন্ধকার ও গরমের ভিতর নীরবে শুয়ে রইল, বাইরে থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায়; ঘরের ভিতর ঘড়ির টিক টিক।

সীমা আশা করছিল মাদাম হয়ত ওপরে এসে বিছানা নেবেন—তখন সীমা আবার পড়া শুরু করবে।

হলঘরে গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, তারপর বাগানে, ঝিঁ ঝিঁ পোকারা চুপ করল।

অপেক্ষমানা সীমা নীরবে শুয়ে থাকে।

পাঁচ

কমিশন

দরজায় ঘণ্টা বাজলো। সীমা দৌড়ে গেল দরজা খোলার জন্য। ডাক পিয়ন মঁসিয়ে রেনেঁা। সই করে দিতে হবে। সীমা বলল —"এখনই মাদামকে ডেকে আনছি।" কিন্তু মঁসিয়ে রেনেঁা অদ্ভুত মুখাকৃতি করে গলার স্বরে গাম্ভীর্য ও জরুরী সুর টেনে বললেন—"না, আপনাকেই সই করতে হবে মামসেল সীমা।" সীমাকে একখানি চিঠি দেখালেন মঁসিয়ে রেনেঁা।

চিঠিখানি সরকারী হুকুমনামার মত দেখতে, তবে প্রকাণ্ড বড়। মাসিয়ে রেনেঁা হাতে করে তুলে ধরতে যেন আরো বড় হয়ে উঠল। খামটি বেশ ভারী। দামী কাগজ, তার ওপর "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" কথাটি শীলমোহরাঙ্কিত। এই হল সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্র চিহ্ন।

গলাটা পরিষ্কার করে ডাক পিওন বললেন—"চিঠিটি খুব জরুরী, দেখুন না লেখা রয়েছে—'সরকারী প্রয়োজনে'।" সীমাও তাকিয়ে দেখল, ওর বুক কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। অত্যন্ত আগ্রহান্বিত অথচ ভয়ে সীমা চিঠিখানি হাতে করে নিয়ে বলল—"সত্যি এটা আমার চিঠি?" 'মঁসিয়ে' রেনেঁা এ্যাটেনসনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সীমাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—"এই ত' স্পষ্ট লেখা রয়েছে, এখানকার কারো ভাগ্যে এর আগে কখনো এই সম্মানের সৌভাগ্য হয়নি, এই সম্মান আমাদের সেণ্ট মার্টিনের সবাইকার।"

চিঠিখানি হাতে করে সীমা দাঁড়িয়ে রইল, অভিজ্ঞতা তাকে অশেষ সংযমশীলা করে তুলেছে, ওর হাঁটু কাঁপতে লাগলো, সীমা বসে পড়ল।

চিঠিখানি বিনা বাধায় পড়লো সীমা, এইখানে হলে বসে মাদাম আসার পূর্বেই এটা পড়ে ফেলা ভালো। প্রত্যাশায় ব্যাকুল হলেও সীমা ইতস্ততঃ করতে লাগল—তার সারা দেহে আনন্দ বেগ প্রবাহিত হলেও চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওর অন্তরে কেমন একটা আশঙ্কা মিশ্রিত উদ্বেগ। বারবার চিঠিখানি খুলতে গিয়ে ও কুণ্ঠিত হয়ে থেমে গেছে। তার ওপর এমন একটা জরুরী চিঠি ত' আর আঙুল দিয়ে খোলা যায় না।

এমন সময় টেবিলের ওপর প্রস্‌পার খুড়োর প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের খাম খোলবার দণ্ডটি চোখে পড়ল। সীমা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলো না তাড়াতাড়ি খামটি খুলে ফেলল।

চিঠিখানি এ্যান্টিক অক্ষরে লিখিত, প্রতি ছত্রের প্রথম অক্ষরটি নীল, লাল ও স্বর্ণ রঙে রঞ্জিত। চিঠিতে বলা হয়েছে যে বিশেষ কাজে ডাফিনের সদর কার্যালয়ে যেতে হবে, "বিশেষ কাজে" কথাটির নীচে দাগ দেওয়া।

সীমার আপাদমস্তক কম্পিত হল। কপালে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠল। বিশেষ কাজে সদর ঘাঁটিতে, ব্যাপারটা কি! সীমার বিশেষ আতংক হয়েছে। মামসেল রুসিল বারবার বলতেন, সীমা ভালো ছাত্রী নয়, সীমাও জানতো তার তেমন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। কিভাবে, কেমন করে এই "বিশেষ কর্তব্য ভার" সে সম্পাদন করবে?

চিঠিখানিকেই যেন সীমা প্রশ্ন করল—কি বিশেষ কাজ? "চিঠিতেই ত স্পষ্টাপষ্টি নির্ভুল ও পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে—" মামসেল প্ল্যানকার্ড ডাফিনকে জানিয়ে দেবেন কে তাঁর শত্রু। মামসেল ডাফিনকে সেইসব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সতর্ক করবেন। যতক্ষণ না "দু শ' পরিবার নিশ্চিত ভাবে ও স্থায়ী ভাবে পরাজিত হবে ততদিন মামসেল প্ল্যানকার্ড তাঁর তরবারি খাপে ভরবেন না। তখনই মামসেল প্ল্যানকার্ড

ডাফিনকে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত করবেন। ম্যানডেটর কর্তৃক স্বাক্ষরিত।"

চিঠিখানি কোলের ওপর রেখে সীমা হলের বেঞ্চে অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বসে রইল। তার অত্যন্ত ভয় হতে লাগল। যারা এই "দু শ' পরিবারকে" জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা সবাই ধ্বংস হয়েছেন। জোনকে ভস্মীভূত করা হয়েছে, জাউরেসকে হত্যা করা হয়েছে, তার বাবাকে কংগোর জঙ্গলে নিহত করা হয়েছে। আর সে মাত্র পনের বছরের ছোট্ট মেয়ে—অকিঞ্চিৎকর, ধনীর দরিদ্র আত্মীয়। দাসীবৃত্তি করে। ভদ্র, অভদ্র এবং রূঢ়ভাবে তার ওপর মাদাম হুকুম চালিয়ে যান। কি করে সে এই গুরুদায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবে!

যতই সে ভাবে লাগল তত বেশী সে মর্মপীড়া অনুভব করতে থাকে। এত লোক থাকতে কেন ম্যানডেটর তাকে নির্বাচন করলেন কে জানে। কমিশন ওব বুকে যেন পাথরের বোঝার মত ভার হয়ে উঠল, সে ভার যেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলল।

সীমা চিঠিখানিকে প্রশ্ন করে—কোথা থেকে তুমি এলে? তোমার আগমনের ফল শুভ না অশুভ? চিঠিই যেন উত্তর। পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে যেন পুনশ্চ দিয়ে লেখা—"মা ভৈঃ!—ইতি তোমার বাবা।"

তৎক্ষণাৎ শরীরের সমস্ত ভার যেন নেমে গেল, সত্যই সে নির্বোধ, আতঙ্কিত হওয়ার পূর্বে চিঠিখানি সম্পূর্ণভাবে তার পড়া উচিত ছিল। তার বাবার বাসনা সে কাজ চালিয়ে যায়, যেখানে তিনি থেমেছেন তারপর থেকেই কাজ করে যেতে হবে। সে নিজেই যে সব বুঝতে পারেনি সেটা লজ্জার কথা। চিঠিখানা যে এসেছে, সত্যই তা চমকপ্রদ, সত্যই এ এক অপরিসীম সম্মানলাভ। "এখন যদি নয়, তবে কখন? তুমি যদি না পারো ত কে পারবে?"

সহসা লরী ড্রাইভার মরিস গ্যারাজের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে

দেখে মুখ বিকৃত করল। ও অবশ্য কিছুই জানে না। ওর এখনও বিশ্বাস যে—ভিলা মনরেপোর অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য হয়; সেই ভিলা মনরেপোরই ও একজন! চিঠির সম্পর্কে ওকে কিছু বলার জন্য সীমার প্রবল লোভ হল। তবে ওরও ত' একটা দম্ভ আছে, মনে মনে ভাবল যখন কমিশন পাবে তখনই মরিস দেখতে পাবে।

কিন্তু মরিস মুখ বিকৃত করেই চলেছে, ওর দিকে চেয়ে কি যেন সজোরে বলল—সীমা শুনতে পেল না, কিন্তু ঝুঝলো কথাটা নোংরা। ও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না, সীমা গ্যারাজে দৌড়ে গিয়ে মরিসের চামড়ার জ্যাকেটের হাতা ধরে নাড়া দিয়ে বলল—"শোনো মরিস, তোমার মুখের ওই কুটিল হাসি ছাড়ো, আমি রাষ্ট্রাধিনায়কের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আমাকে সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে।" কথাগুলি ও বেশ শান্তভাবেই বলল, এ যেন প্রতিদিনকার ঘটনা।

মরিস মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল, ওর গুণ্ডাপ্রকৃতির মুখের কুটিল হাসি যেন অন্তর্হিত হল। কিন্তু তখনই ও মুখ বিকৃত করে স্বভাবোচিত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল—"তোমার ঠাকুরমাকে গিয়ে এ কথা বলোগে যাও মামসেল! চিঠি! ভারী ত' চিঠি, সদর দপ্তর—সবাই এসে ওরকম বলতে পারে।"

সীমা চটে গেল, তাড়াতাড়ি বেতের ঝুড়ি থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে মরিসকে দেখাতে গেল কিন্তু কি আশ্চর্য! ঝুড়িতে চিঠি নেই। ড্রাইভার মরিস এইবার অট্টহাস্য করে উঠল। ভদ্র ভাবে অথচ শ্লেষ ভরে মরিস বলে উঠল—দেখলে ত'! তারপর গদাই নস্করী চালে গিয়ে ঝরণা কলের তলায় গা ভিজিয়ে বসল।

সীমা অপমানে ও লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল। এসব ত' আর তার

কল্পনা নয়, সে নিজে চিঠিটা পড়েছে—লাল নীল ও সোনালি রঙের অক্ষর। নিজের হাতে ঝুড়িতে চিঠিটা রেখেছে, ঝুড়ি ভারী হয়ে উঠেছে, চিঠিটা বড় আর ভারী বলেই। আর আজ মরিস মনে করছে যে সবটাই সীমার কল্পনামাত্র—আর ওকে আগের চাইতেও অনেক বেশী ঘৃণ্য ও হেয় মনে করছে। সীমার উপস্থিতিতেই ঝরণা কলের তলায় চলে গেল, ভাবটা যেন সীমা ওখানে নেই। কোথায় যে এ লজ্জা রাখবে সীমা ভেবে পায় না। আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা—হেনরিয়েট জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলে উঠল—"সেম! সেম! কি লজ্জা!"

মরিস কলের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, সমস্ত অঙ্গ জলে ভেজা, কেউ তার অনাবৃত দেহ দেখতে পাবে না, তা ছাড়া ওদিকে সীমার লক্ষ্যই নেই—কলের জলধারাও যেন শ্লেষভরে বলে চলেছে—'ছি, ছি, কি নির্বোধ বাচাল মেয়ে বাবা! আবার ডাকিনের কাছে যাবার সখ। বরং ভিলা মনরোপোয় ফিরে যাও, যা সইবে। যার যা তার তা।' কিন্তু সহসা একটি অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল, শীর্ণ মুখ, খর লাল্‌চে চুল, মুখে অসংখ্য কুঞ্চিত রেখা, নীল লোহিত চোখের তারা। বেঞ্চে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে মরিসকে মিষ্টিভাষে লোকটি বলল—"শোন হে, তুমি এই ছোট্ট মেয়েটির ওপর অবিচার করছ। সত্যি আমি চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম, আর একগুয়েমি না করে, মেয়েটির কাছে চিঠিখানি চেয়ে নাও।"

মরিস তাড়াতাড়ি স্নানের তোয়ালেতে গা ঢাকলো, যেন নিজের লজ্জাটাও ঢাকবার চেষ্টা করছে।

সীমা কিন্তু গর্বিত, মরিস চিরদিনই ওর সম্পর্কে ভুল বিবেচনা করে এসেছে। সর্বদাই নিন্দাচ্ছলে বলেছে, "এই সীমার দিকে তাকিয়ে কেউ বলবে যে ও পীয়ার প্ল্যানকার্ডের মেয়ে!"

সত্যি ওর দিকে তাকিয়েই ওকে ভিলা মনরেপোর দরিদ্র আত্মীয়া মাত্র, এ কথাও ত' বোঝা যায় না। জেনারেল ডি বদ্রিকোর্ট বিশ্রী রসিকতা করে সৈন্য লেলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখন ম্যানডেটর এত লোক থাকতে ওকেই বেছে নিয়েছেন, আর এখন কেউ ওর সম্পর্কে কোনো কিছু শ্লীলতা বিগহিত কথা চিন্তা করতে পারে না।

সীমা সদর দপ্তরের দিকে ছুটলো। ডাফিনের সদর দপ্তর সিনোনে, বই থেকে এই সংবাদটুকু জানা গিছল, পথও জানা। সৌলিঅ ও অতুন দিয়ে পথটি চলে গেছে, কিন্তু অবিলম্বে সীমা বুঝলো পথে জনতার ভিড় আর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন।

সীমা দাঁতে দাঁত চেপে ধরল—কনুইএর ঠেলা দিয়ে পথ করে নিয়ে তাকে যেতে হবে, যেতেই হবে কারণ তার কমিশনের কাজ সম্পাদন করতে হবে। পলাতক শরণাগত দল কিন্তু ওকে যেতে দেবে না, তারা সবাই ওর বিরোধী—একজন ত' সত্য সত্যই পথ রোধ করে দাঁড়াল, বেশ বলিষ্ঠ লম্বা ও চওড়া চোদ্দ বছরের বালক। সীমা মধ্যাহ্ন ভোজনের উদ্দেশ্যে একখণ্ড র‍্যাবেলকন চীজ সঙ্গে এনেছিল তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে সেটি দিয়ে দিল, ছেলেটি কিন্তু ওর মুখের পানে ক্রোধে ও বিরক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঐ শরণাগতদের কাছে গিয়ে সীমার জানাতে বাসনা হয় যে সেও ওদেরই একজন, ওর কমিশনের কথা ও বলবে, চিঠিখানি না হয় ওদের দেখাবে। জোনের কাহিনীতে সীমা পড়েছিল; জোন বলেছিল— "আমি দরিদ্রের জন্য সান্ত্বনা এনেছি—"শরণাগতদের অনুনয় করতে হবে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

সীমা কিন্তু কথা বলতে পারে না, তার যেন বাকরোধ হয়েছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাদের চিঠিটাও দেখাতে পারে না, আর যারা ওর আশে পাশে ছিল সবাই যেন মূক জড়বৎ হয়ে গেছে। তার নিজের

মৌনতার মতোই এক বিশ্রী ব্যাপার, শরণাগতদের সমগ্র শোভাযাত্রা স্থির চিত্রের মতো গতিহীন। মোটরের আওয়াজ নেই, লোকের মুখে কথা নেই, অশ্বের হ্রেষা নেই। এ অবস্থা অসহ্য, এই নীরবতা, ওর নিজের ও পারিপার্শ্বিক জনগণের মৃত্যুর মত নীরবতা সহনীয় নয়। সীমার বুকের ভিতর কেমন করে ওঠে, কোথা থেকে এই দুস্তর বাধা প্রতিরোধ করার শক্তি ও সঞ্চয় করবে? কোথায় পাবে সামর্থ? কোথায় সাহস?

সীমা চিঠিখানি আঁকড়ে ধরে, ম্যানডেটরের কথা স্মরণ করে, অন্তরে দৃঢ়তা আহরণ করে আবার—পথ চলা শুরু করে—আশ্চর্য! এখন সে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়ে চলেছে, এখন সে চলতে পারে। সীমা অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সীমা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই তার দুপাশের জনতা সসম্ভ্রমে সরে যায়।

অবশেষে সীমা এসে সিনোনে পৌছল।

কিন্তু এই অবস্থায়, এই হালকা সবুজ ডোরাকাটা পোষাকে স্বেদাপ্লুত আকৃতিতে ডাফিনের সামনে হাজির হওয়া চলে না। প্রথমতঃ স্নান সারতে হবে—তারপর একটা ভব্যযুক্ত বর্ম-পরিচ্ছদ কিনতে হবে, একটা পতাকা সংগ্রহ করতে হবে। শুধু পতাকাটার দাম পড়বে পঁচিশ লিভর। এখনকার হিসাবে কত দাম হবে কে জানে? হিসাব কষা শক্ত, অনেক হাজার ফ্রাঁ হবে হয় ত'। কিন্তু এমন একটা বিশেষ ব্যাপারে ত' আর দামের কথা ভেবে মাথা খারাপ করা চলে না।

হোটেলে একা প্রবেশ করতে সীমার ভয় হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে সীমা সোজা ভিতরের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বেশ সহজ গলায় বলে: একটা ঘর চাই, আর সব কিছুই সরকারী ব্যয়ে হবে, আমি সরকারী কাজেই সফর করছি। এই বলে সীমা চিঠিখানি বার করে দেখায়।

এই কেরানীটি সীমা যখন প্রসপার খুড়োর সঙ্গে প্যারী গিছল তখন হোটেল ব্রিষ্টলে কাজ করত। সীমার চিঠিখানি দেখে সীমার প্রতি তার শ্রদ্ধা যেন বেড়ে গেল; হোটেলের মালিক দৌড়ে এলেন—ইনি হোটেল দ্য লা পোস্তের মঁসিয়ে বাথিয়ের। লোকটি সসম্ভ্রমে সীমাকে অভিবাদন জানালো ঠিক যেভাবে সম্পন্ন ইংরাজদের অভিবাদন জানানো হয় সেই ভাবেই, আর তখনই তাকে নেপোলিয়ঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেই কক্ষের দাসী তৎক্ষণাৎ শয্যা বিছিয়ে দিল। একদা এই বিছানায় স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ঁ শয্যা গ্রহণ করেছিলেন—চাদরটি অবশ্য বদলানো হয়েছে। আর তারপর দীর্ঘ ভ্রমণ-ক্লান্ত সীমা আধ ঘণ্টার মত চোখ বুজিয়ে শুয়ে রইল। এলার্ম-ঘড়ি বাজছে আর বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

এরপর লা এগিএবল ও লা উতিল মঁসিয়েদ্বয় এলেন বর্ম-পরিচ্ছদের মাপ নিতে—মঁসিয়ে লা এগিএবল মাপ নিতে লাগলেন—ছাতি ৩৪, কোমর ৩২, আর মঁসিয়ে ল' উতিল নম্রভাবে টুকে নিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন – মাদামের চমৎকার পোষাক হবে, অর্ডার মাফিক জামা হবে, ঠিকমত লোহা দেওয়া শক্ত, তবে পেরী প্ল্যানকার্ডের মেয়ের কাছে আমরা যে কতখানি ঋণী তা আমরা জানি।

মঁসিয়ে ল' এগিএবল মাঝে মাঝে একটু বেশী রকম ওর গা টিপ-ছিলেন মাপ নেওয়ার সময়, সীমার পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে—সীমা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর মঁসিয়ে এগিএবল গুন গুন করে সুর ভাঁজেন, যেন ব্যাপারটা অন্য কিছু। তারপর দুজনে বসে ওর গায়ে সেই বর্ম আঁটতে লাগলেন, ভালো করে ফিট করছেন। অত্যন্ত গোলমেলে কাজ, অতক্ষণ ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর। তা ছাড়া মাদামের বহুবিধ কাজ করার ফলে সীমা তখনও অত্যন্ত ক্লান্ত। যাক অবশেষে সব হাঙ্গামা চুকলো।

সীমা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, এখন একটা শিরস্ত্রান আর পতাকার প্রয়োজন। পতাকাও এসে গেল, হেনরিয়েট একটা পতাকা নিয়ে এল।

সত্যি হেনরিয়েটকে ভালো বলতে হয়। হেনরিয়েট একটু প্রতিশোধ পরায়ণা, তাই সীমার একটু ভয় হচ্ছিল হয় ত' তার মৃত পিতাকে অসম্মান প্রদর্শনের জন্য সে তাকে প্রহার করেছিল বলে হেনরিয়েট তার শোধ নেবে। এখন কিন্তু বোঝা গেল হেনরিয়েট প্রকৃতই তার বন্ধু। প্রয়োজনের সময় সে ঠিক পাশে এসে হাজির হয়েছে। সীমার কাছে এসে পতাকাটি তুলে ধরে দাঁড়িয়েছে, কফিনেতে ওর মুখখানা যেমন মোম মাখানো মনে হয়েছিল, এখনও ওর মুখটি তেমনই মনোরম দেখাচ্ছে।

সীমা এবার হেলমেট পরলো, সৈনিকরা যেমন তিনকোনো টুপী পরে থাকে, অনেকটা সেই রকম। হেনরিয়েট ওকে পতাকাটি দিয়ে আয়নার দিকে মুখ রেখে হাসতে থাকে।

হেড কোয়াটার্সের পাদদেশে গিয়ে সীমা দাঁড়াল, এলাইসীর বিখ্যাত সিঁড়ি, প্রেসিডেন্ট লেব্রাম ওপরে থাকেন, প্যারীতে সীমা মাঝে মাঝে এই পথে গেছে, হোটেল ব্রিস্টল কাছেই ছিল।

প্রহরীরা ওর পথরোধ করে দাঁড়াল, পরিচয় পত্র দেখতে চায়। সীমা তাদের চিঠি দেখাতেই প্রহরীরা সঙ্গীন নামিয়ে সসম্ভ্রমে বলল—"সোজা ওপরে চলে যান মাদাম, আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম, আজ ফ্রান্সের এক স্মরণীয় দিন।"

তারা সীমার পানে শ্রদ্ধাভরে চেয়ে রইল।

সীমা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, প্রথমটা বেশ সহজ লাগছিল, এখন এ সিঁড়ি আর এলাইসীর নয়, যেন নতরড্যামের সিঁড়ি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, যারা নেমে আসছে তাদের সীমা প্রশ্ন করে,

আর কত বাকী। তারা বলে—৩৪২টি ধাপ, এ আপনার জানা উচিত মামসেল।

সীমা আবার উঠে চলে, আর পঞ্চাশটি ধাপ উঠে প্রশ্ন করে কত বাকী, আবার তারা বিরক্তিভরে জবাব দেয় ৩৭২। যতদূরই সে উঠুক না কেন বার বার প্রশ্ন করে একই জবাব পায় ৩৪২ ধাপ।

সীমা দাঁড়িয়ে থাকে, নিঃশ্বাস নেয়, সে হাঁপিয়ে উঠেছে, পিঠ কন কন করছে, বুকের পাশে ব্যথা লাগে—তার কেমন ভয় হয়, হয় ত' শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর উপরে পৌছাবে না।

আবার সীমা সিঁড়ি ভাঙে, বর্ম অত্যন্ত ভারী, আর পতাকা কাঁধে এসে লাগে। একটা ছোট এবং সস্তার পতাকা নিলেই হয় ত বুদ্ধির কাজ হত। ছোট্ট জানলা দিয়ে সীমা নীচে সেণ্ট মার্টিনের বাদামী ছাদ দেখতে পায়, তার ওপর নতরড্যামের গারগয়েল আর দৈত্য-দানবগুলো বসে আছে, সীমা যতই উপরে উঠুক না কেন ওদের উচ্চতা সমভাবেই আছে, কিছুতেই যেন নামতে চায় না। সীমা হয় ত' ঠিক সময়ে পৌছতে পারবে না। ডাফিন যখন জানতে চাইবেন—এত বিলম্ব হল কেন, সীমা তার জবাব দিতে পারবে না। তবু সে পত্র পাঠ মাত্র যাত্রা শুরু করেছে।

ডাফিন দাঁড়িয়ে আছেন দেখা গেল। তাঁর কালো আর রূপালি পোষাকে সীমা তাঁকে চিনল। ডেপুটি প্রিফেক্ট উৎসবের দিনে এই ধরনের পোষাক পরতেন।

ডাফিন বললেন—একটু বসে জিরিয়ে নাও মা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দেখছি।

তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ জোরালো। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাঁকে কিন্তু তাঁর ভঙ্গী যেন বন্ধুর মতো, দেখলে তেমন ভয় হয় না। তিনি বললেন—আমরা ডাকতেই যে তুমি চলে এসেছ, বড় ভালো করেছ মা।

আমার চিঠিটি ঠিক মত পেয়েছিলে ত'? আমার ভয় ছিল হয় ত হারিয়ে যাবে, এখন দেশের যা হাল, ডাক বিভাগের অবস্থা আরো খারাপ। তোমাকে আমাদের বড়ই প্রয়োজন মা।

সীমাও তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তির মত বেশ সহজভাবে কথা বলতে লাগল—আমার বাবাকে ত' আপনি জানতেন, জানতেন না? - সীমা বেশ নির্ভরশীল হয়েই বলে। আর ডাফিন বললেন—নিশ্চয়ই, তাঁকে দিয়ে অনেক জরুরী কাজ করিয়েছি, তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। তারপর তাঁকে 'কংগো'য় পাঠালুম, তিনি আর ফিরে এলেন না। ব্যাপারটি খুবই রহস্যজনক—আমার পুলিশ বিভাগ কিছুতেই ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারল না। মনে হয় ওরাও তেমন সৎ নয়। তোমার আমার ভিতর কথা হিসাবেই বলছি, আমার বিশ্বাস ওই 'তুশ' পরিবার', ব্যাঙ্ক ডি ফ্রান্সের লোকেরা, আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্তরা তাঁকে বিষ দিয়ে মেরেছে। কেন না অনুসন্ধানের ফলে ওরাই বেশী বিরক্ত হল। ওই 'তুশ' পরিবার নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে বিশেষতঃ ৯৭ নম্বরদের নিয়ে। ওরা জানে শুধু বিষ আর বন্দিশিবির—গরীবের বিরুদ্ধে আগুন লাগাতে আর তরবারি হাঁকাতেই ওরা জানে। এ ত' আমার অপরাধ নয়। 'জনপ্রিয়' এই বিশেষণই আমার কাম্য—আর এই ভাবে যদি সব চলতে থাকে তা হলে শুধু সপ্তম চার্লসই হবে আমার এক মাত্র পরিচয়।

সীমা ওঁর মুখের পানে সদয় ভাবে তাকাল, বেশ সহানুভূতি ভরে। মঁসিয়ে জাভিয়ের তাকে সত্য কথাই বলেছিলেন, ডাফিন লোকটির অন্তঃকরণ মহৎ, শুধু উনি দুর্বলচিত্ত আর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ। সদিচ্ছা পূরণ করতে অপারক।

সীমা তাঁকে বেশ উৎসাহজনক ও সান্ত্বনাসূচক কিছু বলতে যাবে এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। তাঁর ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে

বিরক্তির ছাপ, ভ্রু-যুগ বিস্ময়ে কুঞ্চিত, তিনি ধীরে ধীরে রিসিভারটি তুলে নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা অন্তহীন, আর উনিও এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। প্রথমটা সীমার মনে হল ল্যাটিন, তারপর মনে হল, হয় জার্মান, নয় ইংরাজী। কার সঙ্গে উনি কথা বলছেন জানার জন্য সীমার ভারী কৌতূহল হল। হয় ত' কোনো ধনী শিল্পপতি, ওদের অনেক কান। সব কিছু ওরা জানতে পারে, হয় ত' ওরা ওদের এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ পেয়েছে আর তা বান্‌চাল করতে চায়। এখন সীমার মনে হল ও যেন স্ট্যাটালিনের কর্কশ কণ্ঠ টেলিফোনের মধ্য দিয়ে শুনতে পেল, বেওয়ানে মদের পাত্রগুলি নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য দুর্বৃত্ত জেনারেল লা নেমোইল ত' ওকে দমন করতে গিছলেন। সীমা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। কিন্তু ডাফিন সহসা তাঁর আলোচনা বন্ধ করে সীমার দিকে ভৎর্সনা সূচক দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন —অবিনীত হলো না।

লজ্জায় সীমার মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠল।

অবশেষে ডাফিন রিসিভার নামিয়ে রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় সীমার দিকে তাকালেন। এখন সীমার কাজ। সীমা তার কর্তব্য সম্পাদন করবে, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধ করে 'তুশ' পরিবারকে' ধ্বংস করবে, আর সেই যুদ্ধের পণ হবে হয় বিজয় নয় মৃত্যু।

সীমা, সেই ভাবে দাঁড়িয়ে, কি করে এই দুর্বল চিত্ত ডাফিনকে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী করানো যায় ভাবে। কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়েই সীমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল উনি যেন তার উপস্থিতি বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি বসে বসে ক্রেপ সুজেটস্ খেতে শুরু করেছেন। সীমা তার উপস্থিতি অনুভব করানোর জন্যই তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে সে তখনও আছে, তারপর সহসা ওঁর দক্ষিণ

কর্ণের প্রতি সীমার নজর গেল—কানটার ওপর দিকটা কেমন বিস্ময়জনক ভাবে পুরু, সীমা সহসা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু এত সহজে ভয় পেলে চলবে না, যে-মহৎ কর্তব্য সম্পাদনা করতে ও এসেছে তার কথা স্মরণ হল, সীমা আবার দৃঢ়তাভরে শুরু করে—মহামান্য ডাফিন! অতীতে যেমন হয়েছে সেভাবে আর চলতে পারে না. এই 'দুশ' পরিবারকে' এইবার অন্যভাবে সামলাতে হবে,—যেভাবে আপনি কাজ চালিয়ে আসছেন সেভাবে আপনি পেরে উঠবেন না, ওরা হল আসল শয়তান, প্রতি হাঁড়িতেই যথেষ্ট খাবার আর সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ ফ্রান্সের যে সম্রাট ব্যবস্থা করবেন তার চাইতে যে-হিটলার সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা কাজ চালাতে চায় ওরা হয় ত' তাকেই চায়। এই সব লোকের কাছে ল্যাটিন ভাষায় ভালো ভাবে বক্তৃতা করার কোনো অর্থ হয় না। ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। মূলধনের বিদেশে চালান আপনাকে বন্ধ করতে হবে, কমিতে দে ফরজে যাতে জার্মানদের কাছে আর ইস্পাত বিক্রী করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এইটুকুই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা। বিস্মিত হবেন না, এই একমাত্র পথ। আমি দরিদ্রের সান্ত্বনা দেবার জন্য এসেছি, মহামান্য ডাফিন, আপনি চিরদিন কি শুধু দরিদ্রকেই শোষণ করে যাবেন? পরিবর্তন হিসাবে ধনীকেও শোষণ করতে হবে, ওদের একেবারে মুছে দিতে হবে। গ্যারাজে প্রতিদিন সবাই এই কথা বলে, বিশেষতঃ মরিস ড্রাইভার, আর সে ঠিক ঠিক খবর রাখে। এ যদি না আপনি করেন, তাহলে আপনি প্রতারিত হবেন, যেমন সবাই আপনাকে ঠকাচ্ছে সেই ভাবেই সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ডাফিন অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—এ সব আমার কাজ নয়। অর্থনীতিতে আমার কৌতূহল নেই, ওসব কথা বিশেষজ্ঞরা ভাববেন—আমি রাজা, রাজার কাজই করব,—মুচি মুচির কাজ করবে। আমি

অনেক ভাষা জানি। একটু আগে টেলিফোনে ল্যাটিন ভাষায় কথা বললাম শোনো নি ? কিন্তু ব্যাঙ্ক ডি ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষকে যদি ব্যাঙ্কের কাজ বোঝাতে যাই, সেটা হবে অর্বাচীনতা। তোমার এ সব অনুরোধ যে ড্রাইভার মরিসকে তুমি এত বড় বিবেচনা কর, তার কাছেই বরং জানাও'গ। তারপর একটু তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তুমি ভুল গাছের ছাল নিতে এসেছ।

সীমা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। ডাফিনকে বিরক্ত করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। উনি এত সর্তক তার কারণ মাদামকে উনি ভয় করেন। বেশ প্রিয়দর্শন চেহারা ওঁর, লালচে চুল, ধূসর-নীল চোখ, ঘন ভ্রূযুগ। তা ছাড়া সীমার প্রতি বেশ করুণা প্রবণ। প্যারীতে থাকার সময় উনি ওদের প্রতি খুবই যত্ন নিয়েছিলেন।

সীমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলেছেন বলে হয় ত' উনি অনুতপ্ত হয়েছেন। বয়স্ক লোকের সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গ ভাবে লোকে কথা বলে উনি সেই ভাবেই ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন—খুকী, তুমি ত' জানো যে ঐ 'ডুশ' পরিবারের' ব্যবসা তোমাদের মরিস ড্রাইভার যা ভাবে তা নয়। ওদের অসীম ক্ষমতা, বিশেষতঃ ৯০নং-এর পরিবার, আর আমি যদি ওদের ওপর বিশেষ কঠোর হই, তাহলে ওরা ওদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাহায্য নেবে আর সর্বাগ্রে আমার রাজকীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু এই অহেতুক স্নেহের প্রাথমিক ঘোর সীমা এতক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। সীমা পতাকা আরো দৃঢ় করে ধরল। এ পতাকা জাউরেসের রক্তপতাকা, ডাফিনের সামনে দৃঢ়ভাবে পতাকা নিয়ে দাঁড়াল, তারপর ওর সুন্দর সুরেলা অথচ গভীর কণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গীতে বলল—যা করবার সোজাসুজি করুন ডাফিন, ঐ 'ডুশ' পরিবারের' যা প্রাপ্য তা যদি আপনি দেন, তাহলে দেখবেন ওরা আপনার পদতলে হাজির, আর যাই হোক এঁরা সাধু ব্যবসায়ী নন,—এঁরা সবাই ফরাসী একথা স্মরণ রাখবেন।

ডাফিনের কাছে কিন্তু এই যুক্তির কোনো মূল্য নেই—উনি বিরক্তি ও শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন—ফরাসী, ফরাসী, ফ্রান্স—কোন্ ফ্রান্সের কথা বলছ? যত শ্রেণী আছে তত রকমের ফ্রান্স আছে। আমার কিষাণ, মজদুর, এখন কি এই 'দুশ' পরিবার' সবাই ফ্রান্সের কথা বলে—কিন্তু যা বোঝে তা বিভিন্ন অর্থেই বোঝে। তব এইটুকু আমি জানি—আমার এই 'দুশ' পরিবার' ফ্রান্স বলতে বোঝে—বেশী মুনাফা আর কম ট্যাক্সের হার।

সীমা ডাফিনের সামনে উৎসাহ ও আগ্রহ ভবে দাঁড়িয়ে রইল, এই হতাশা ও শ্লথ-ভাব দূর করাই ত' ওর কর্তব্য। এই বৃদ্ধ জরদ্গবটিকে ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম চার্লসে পরিণত করাই ওর কাজ। সেই কারণেই ম্যাণ্ডেটর ওকে চিঠি পাঠিয়েছেন। সে চীৎকার করে বলে উঠল—না, না, এ সব কথা আপনি বলবেন না। ফ্রান্স একটা ভুয়া কথামাত্র নয়, আপনি তা ভালো করেই জানেন। তারপর ওর পতাকাটি দেখিয়ে সীমা স্পষ্ট গলায় বলল—আমাদের জন্মভূমি এই ফ্রান্স বহু শতাব্দীর সমবেত দুঃখ, লাঞ্ছনা ও ক্লেশের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে। শ্রেণী-সংগ্রাম বা তীব্র সামাজিক বৈপরীত্য অবশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভূমির সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়?

এই কথায় ডাফিনের মনে স্পষ্টতঃ একটা প্রতিক্রিয়া হল। তিনি পুরুষোচিত ভাবে ভারী পদক্ষেপে ঘরটিতে পদচারণা করতে লাগলেন, পিছনে তাঁর কালো আর রূপালি পোষাক ঝলমল করছিল। তিনি সমর্থন সূচক কণ্ঠে বললেন—তুমি চমৎকার বলেছ সীমা।

লজ্জায় সীমার গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠল; উনি ভাবলেন কথাগুলি সীমার নিজস্ব। কিন্তু ওঁর সে বিশ্বাস বজায় রাখা সীমার পক্ষে উচিত নয়, ধার করা কথায় নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করা উচিত নয়। সীমা তাই সরল ভাবে বলল—এ কথা আমার নয়, এ সব জাউরেসের বাণী।

বন্ধুভাবে সীমার পিঠ চাপড়ে ডাফিন বললেন—কিন্তু ওকথা তোমার মধুর কণ্ঠেই ত' শুনছি, তারপর, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে? এই কথা বলে পুনরায় ওকে স্নেহ ভরে স্পর্শ করলেন।

ডাফিনের স্নেহস্পর্শে সীমা বিগলিত হয়ে গেল—কিন্তু এই অস্বস্তি পরে পরম স্বস্তিতে পরিণত হল। সে যে কৃশ হুইপেটাকৃতি, তাতে তা হলে কিছু এসে যায় না। সে এই কঠিন মানুষটার মনস্থির করাতে পেরেছে।

সীমা অবশেষে রণক্ষেত্রে (ফ্রন্টে) পৌঁছল।

যে সব জেনারেলদের কথা সীমা বই-এ পড়েছে তাঁরা সকলেই এখানে উপস্থিত—মার্শাল ও এডমিরালদের ভিড়। এদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ। সীমা এই রকমটা প্রত্যাশা করেনি। সীমা সহজ ও সরলভাবে কথা বলতে লাগল, তার জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কথাবার্তা, কিন্তু আইনকানুন ও আদবকায়দায় তার অজ্ঞতা লক্ষ্য করে এই সব উচ্চ পদবীধারীরা কেউই অপরাধ নিলেন না।

এদের বুঝিয়ে লড়াই শুরু করানো অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। সীমা জানতো কি করা উচিত, তাই সে স্পষ্টাস্পষ্টি তার বক্তব্য বলল, আর সেনাপতিরা সবাই তার মত গ্রহণ করলেন। তারপর আর কিছু হল না। সব কিছু অন্যভাবে হতে লাগল, ওরা বলতে লাগলেন—সীমার বক্তব্য তাঁরা বুঝতে পারেননি। বকে বকে সীমার গলা ধরে গেল, কিন্তু কিছুতেই ওরা বুঝতে পারেন না। সীমা বুঝলো ওরা তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। হয় ত' এই সব সেনাপতিদের অধিকাংশকে ঐ 'ডুশ' পরিবার হাত করে ফেলেছে, তাই ওরা হয় ত' চায়, নাজীরাই জিতুক—সীমা তা বোঝে, কিন্তু কি ভাবে তা প্রমাণ করবে?

তার ওপর সীমা স্বচক্ষে দেখল, ওঁরা ঘন ঘন আইন-বিদদের সঙ্গে আলাপ করছেন। কালো পোশাক এটর্নিরা এলেন—গলায় শাদা ফ্রিল

দেওয়া, যাঁর চাতুরীর ফলে সীমার পিতার ধ্বংস হল, সেই মাত্তিন লেভাতুরও রয়েছেন। বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছেন তিনি, সেই ভাব দেখাচ্ছেন। এই স্থূলাঙ্গ, তৈলাক্ত, সুবেশ ভদ্রলোক জেনারেল থেকে জেনারেলান্তরে ঘুরে ঘুরে কথা বলছেন। তাঁর ভুঁড়ো পেটের ওপর তামার ফলকে লেখা—"চার্লস মেরী লেভাতুর—এটর্নী ও নোটারী।" —যাতে সবাই বোঝে, উনি লোকটি কে, আর দ্বিতীয়তঃ এতদ্বারা তার বর্মপরিচ্ছদের খরচটা বেঁচেছে।

সীমা তাকে কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল—মঁসিয়ে, আপনি এখানে কি করছেন? কী চাই আপনার?

উনি কিন্তু জবাবে বললেন—মামসেল, আমাকে যে ডিউক দ্য লা ত্রেমইল, ফিল্ড মার্শাল স্বয়ং ডেকে পাঠিয়েছেন। সীমাকে তিনি তার পাশপোর্ট দেখালেন।

ডিউক দ্য লা ত্রেমইল ক্রূর ভাবে হাসলেন মাত্র। সীমা অবশ্য জানত উনিই প্রকৃত মার্কুইস্। সীমা ডাফিনের কানে চুপে চুপে বলল—এই ভদ্রলোকই ইস্পাতের একচেটে ব্যবসা করছেন রাইনের ওপারে আর উনি ইংরেজদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি ঘুষ স্বরূপ লিখিয়ে নিয়েছেন।

ডাফিন কিন্তু বললেন—আমি কি করতে পারি মামসেল? সব বদমায়েসগুলোকে যদি আমাকেই তাড়াতে হয় -

উনি কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে 'স্রাগ' করলেন।

সীমা ওর মিত্রদের সন্ধানে চারিদিকে তাকায়—ওর যারা হিতৈষী বন্ধু তাদের ও ভালোই জানে, বই পড়েই জেনেছে প্রকৃত বন্ধুদের। একজনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না—যাকে দেখার জন্যও উৎসুক তিনিই নেই। কুখ্যাত, ইন্দ্রিয়বিলাসী গীলে দ্য রেইস। যিনি নট নটী, নাচিয়ে

ছেলের দল, স্ত্রীলোক আর বই নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এখানে তিনিই অনুপস্থিত, সীমা কাউকে তাঁর কথা প্রশ্ন করতে ইতস্ততঃ করে।

বরং হেনরিয়েটকেই জিজ্ঞাসা করবে, অনেক গোপনীয় কথা সে হেনরিয়েটের কাছেই জেনে নিয়েছে। পুরুষদের কথা, কি করে সন্তান জন্মায় এইসব কথার জবাব হেনরিয়েট জানে আর কানে কানে ফিসফিস্ করে বলে। এই প্রশ্নের জবাবও তার জানা ছিল, তাই সে বলে—"উনি ঐ সদর দপ্তরেই রয়েছেন, তোমার সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী, শীঘ্রই এখানে এসে পড়বেন।"

সত্যই উনি এলেন, নীলচে রঙের গোঁফ দেখেই চেনা যায়! হয়ত স্নান করে আসছেন, নিজের সম্বন্ধে উনি অতি যত্নবান। দিনে হয়ত আটবার স্নান করেন, আর গায়ের গন্ধ যেন মঁসিয়ে আরমদের নাপিতখানার মত সুগন্ধে ভরপুর। আসলে কিন্তু ওর গায়ে চামড়ার গন্ধ। কারণ গায়ের জ্যাকেটটা যে চামড়ার।

এই জ্যাকেটটি সীমার কাছে আঘাত হয়ে বাজে—কারণ বোঝা গেল লোকটি মরিস ড্রাইভার, এখনই হয়ত একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে বসবে।

সীমার সামনে এসে লোকটি নির্লজ্জের মত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে—"তারপর, সুন্দরী! খবর কি? চাঁদের আলোয় একটু বেড়াতে যাবে নাকি? মামজেল কি আর আমাদের সঙ্গে যাবেন, আমাদের মত লোকদের কি আর মনে ধরে, ওরা হলেন অন্য জগতের ভিলা, মনরেপোর দল।"

সীমার এখন স্পষ্টই বলা উচিত যে সে দরিদ্র ও অবহেলিতদের স্বাচ্ছন্দ্যও সেবাদানের জন্য এসেছে কিন্তু সে তা করতে পারছে না। বড় বড় সেনাপতিদের সে ভয় করে না। কিন্তু এই লোকটির সামনে ওর মুখ খোলে না। অত্যন্ত ক্লিষ্টভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে, সবাই তার

মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর গীলে ছ্য রেইস ওর সামনে কোমরে হাত দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। ওর এই অস্বাচ্ছন্দ্যে সেনাপতিরা হাসছেন, তাড়াতাড়ি একটা জবাব না দিতে পারলে ওর মান মর্যাদা সব চিরতরে জলাঞ্জলি যাবে।

ইতিয়েন এগিয়ে এসে সম্ভ্রম রক্ষা করে। বিশেষ আড়ম্বর না দেখিয়ে, ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত সাহস দেখিয়ে গীলে ছ্য রেইসের সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে—"এই তরুণীর কাছে আপনি কি চান? আপনি কি কোনোদিন ওর সংগে পরিচিত হয়েছেন?" বিরাট গীলে ছ্য রেইসের পাশে ওকে বিশেষ ছোট দেখাচ্ছিল, সবে ত ষোলো বছরের ছেলে, লম্বা হলেও অতিশয় রোগা। ওর এই আচরণ গীলে ছ্য রেইস হয়ত সহ্য করবেন না।

কিন্তু তা হল না, গীলে ছ্য রেইস এখন আর একটা হট্টগোল সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নন। হেসে ইতিয়েনের কাঁধে হাত রেখে সদয় ভঙ্গীতে বললেন—"মেয়েটি কি ভিলা মনরেপোর নয়? যে যেখানে ঘুমোয় সে সেখানকারই, মেয়েটি কোথায় শোয়?"

এরপর সবাই শুতে যায়। কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে সীমাও সেই একই তাঁবুতে শোয়। রণক্ষেত্রে এই রীতি। যদিও মাদামের মতে যুদ্ধকালে পাজামা পরা রীতি বিগর্হিত তবু সবুজ পাজামাটা পরা আছে বলে সীমা খুশি হল, আজ যদি এই রাত্রে এতগুলি পুরুষের সামনে মাত্র স্কার্টটি পরে থাকতে হত তার চাইতে লজ্জাকর আর কি হত।

সীমা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারাদিনে অনেক কাজ ছিল তার মাদামের দরুন, ডাফিনের সঙ্গে আলোচনা ছিল, তারপর বাগানের কাজ ও সংগ্রাম পরিষদের ব্যাপার। সীমার আশংকা হচ্ছিল হয় ত বা ওর নাক ডাকবে, তা হলে ওর সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ ধারণা সৃষ্টি হবে। সীমা দেখেছে সেনাপতিদের নাক ডাকে না। এটা

অবশ্য স্বাভাবিক, ভদ্রলোক হিসাবে ওরা নাক না ডাকানোটাই অভ্যাস করেছেন। তবে ওরা নিয়তই এপাশ ওপাশ করছেন কারণ পূর্ণ পরিচ্ছদধারণ করে শোয়াটাও অস্বস্তিকর, বর্মের আওয়াজ হয়, আর এই আওয়াজের ভিতর ওর নাক ডাকাটা ঢাকা পড়ে যেতে পারে। বর্মের আওয়াজে নাসিকাগর্জন শোনাই যাবে না হয় ত।

সীমার মনে হচ্ছিল এখনই চলে যায়, তাহলেও আবার বিশ্রী হবে, সেনাপতিরা ওর দিকে তাকাবেন, কাফে ন্যাপোলিআঁ-র পাউডার কক্ষে ঢোকার সময় পুরুষরা যেমন তাকিয়ে থাকে। হেনরিয়েটকে সঙ্গে নিলে বেশ হত, দুজনে একত্রে বেরিয়ে ভালোই ফল হয়েছে বরাবর, এখন দুর্ভাগ্যের বিষয় হেনরিয়েট কাছে নেই। এখন তাই একা কাটাতে হয়, অত্যন্ত আল্‌তো ভাবে শুয়ে থাকে সীমা, তবুও বর্মের আওয়াজ থামানো যায় না। সহসা সবায়ের ঘুম ভেঙে যায়—গীলে দ্য রেইস নীল্‌চে গোঁফে চাড়া দিয়ে মুচকে হাসেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে ইতিয়েন রয়েছে। সে আবার ওকে বলে—"সীমা ভয় পেয়ো না—যদি কিছু খারাপ ইংগিত করে, ত আমি ওকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

সীমা লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে, বাইরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। এলার্ম ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে—সীমা গড়িয়ে পাশ ফেরে।

রাত্রি প্রভাত হয়, সংগ্রাম চলে, সীমা তার ভিতরই পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। ট্যাংকগুলি বিশ্রীভাবে এগিয়ে আসে, এমনই অসংখ্য, এগুলি সবই ফরাসী ইস্পাতে গঠিত। আকাশ শত্রুপক্ষের বিমানের ঝাঁকে অন্ধকার—ফরাসী এলুমনিয়মেই এই বিমানগুলি তৈরী। কিন্তু সীমা তার পতাকা ওড়ায়। আর শত্রুর ট্যাংক সংখ্যায় যতই অধিক হোক না কেন, ফরাসীরা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না, শত শত লোক যদি ধ্বংস হয়, সহস্র সহস্র লোক উঠে দাঁড়ায়—আর সীমা তার পতাকা উড়িয়ে যায়।

তারপর সংগ্রাম পরিষদ—প্রকাণ্ড সংগ্রাম পরিষদ। প্রসপার খুড়োর ব্যক্তিগত অফিসও এত বড় নয়। ঘরটি বিরাট; ডেপুটি প্রিফেকটর, বা সেন্ট লাজার চার্চ বা নতরদামের চাইতেও বিরাট। দাফিন সভাপতি, পরনে সেই কাল আর রূপালী পরিচ্ছদ। দীর্ঘাকৃতি ও কৃশ, কিঞ্চিৎ ঝুঁকে পড়েছেন—সমগ্র জনসমাবেশের পানে অসহায় পাংশুমুখে তাকিয়ে আছেন। যত সেনাপতিদের সীমা জানে সবাই ওখানে উপস্থিত, এমন কি মার্শাল পেঁত্যা পর্যন্ত আছেন, আর শুধুই কি সেনাপতিরা, হোতেল দ্য লা পোস্তের মঁসিয়ে বার্থিয়ের রয়েছেন, আর রয়েছেন, এমিয়ট ও লা রোশ, রাইমু ও পেরোঁ; কাকে ন্যাপোলিয়ঁর মঁসিয়ে গ্রাসেট এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সবাইকে অভিবাদন করে চলেছেন, স্বাস্থ্য ও কুশল প্রশ্ন করছেন। আর আছেন কালো পোশাক পরা অসংখ্য ব্যবহারজীবি ও আইনবিদের দল, এর ভিতর মেতর্ লেভাতুরও রয়েছেন নিশ্চয়ই। এরা নিয়তই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পরস্পর পরামর্শ করছেন, কাগজপত্র দেখছেন, সেনাপতিদের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা করছেন, দলিলপত্র দেখাচ্ছেন ও ফিস ফিস করে কথা বলছেন।

ডাফিন ল্যাতিন ভাষায় সভার উদ্বোধন করে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, মাদাম প্ল্যানকার্ড তার পিতার আদেশে বাসনা জানিয়েছেন যে অবিলম্বে পরমোৎসাহে পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। আরো বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ কথা বলে তিনি আলোচনা শুরু করিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ডিউক দ্য লা ত্রমইল উঠে দাঁড়ালেন, এখন মার্কুইস অত্যন্ত অসন্তুষ্ট গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, মাদাম, তোমার প্রতিভা আমার চাইতে আর কে বেশী প্রশংসা করবে, তারপর মাটিতে পা ঠুকে বলে উঠেন কিন্তু যুদ্ধের রীতি আইনের ভিত্তিতে গঠিত, রাতারাতি কেউ তা

শিখে নিতে পারে না—আমাদের পূর্বপুরুষরা অসীম পরিশ্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করে তাই শিখেছেন। সর্বদাই আক্রমণ করা বেশ সহজ বটে—

কিন্তু আমার স্মরণীয় পূর্বপুরুষ ক্যাটালোনীর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিপাত করার পূর্বে সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তানুসারে অনাক্রমণ নীতিকেই শত্রুকে জীর্ণ করেছিলেন। "ধীরে ধীরে অথচ তাড়াতাড়ি কর—এই হল সকল সমরনিপুণ নেতার নীতি, ফিল্ড মার্শাল, আপনারও কি তাই মত নয়?" জেনারেল পেত্যাঁর দিকে তাকিয়ে উনি প্রশ্ন করেন।

বৃদ্ধ সেনানায়ক উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ওঁর ভাঙা অথচ শ্রদ্ধাসিক্ত কণ্ঠে বলেন-"বন্ধুগণ! এই কথাই ঠিক, আমাদের অবস্থা কাহিল, আত্মসমর্পণ করতেই হবে। 'সাতঘাটের যুদ্ধে'ও এই কথা আমি বলেছি, ভার্দুনেও তাই বলেছি, এখনও তাই বলছি। আমার সামরিক সম্মানের প্রতিশ্রুতি রেখে আমি এই কথাই বলতে পারি।"

অবিলম্বে মেতর লেভাতুর উঠে দাঁড়িয়ে অনুশোচনার ভাণ করে বললেন—"মামসেল ওঁর বাপের কাছ থে.ক এই ধরনের আবদারে কথা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আবার উনি ওঁর সেই ঘন-সবুজ পাজামা পরেছেন—অথচ মাদামের মতে যুদ্ধকালে এই ধরণের পাজামা পরা অতীব গর্হিত। সীমার উচ্চ ঐতিহ্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। ওঁর স্বভাবই হল অবাধ্যতা করা। ওঁর পরলোকগত পিতাও এই অবাধ্যতার জন্যই আজ আর এ জগতে নেই!"

সবাই মি:ল ডাফিনের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে, সেণ্ট-মার্টিনের লোক, মঁসিয়ে এমিয়ট ও লারোস, মঁসিয়েল উতিল ও লা এগ্রিয়েবল ও আর সকলে অনুমোদনের ভঙ্গীতে সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর প্রসপার খুড়ো একটু দূর থেকেই বলে ওঠেন, আমি হলাম ব্যবসায়ী লোক, আমার ভোট তাই রিজার্ভ রইল।

সীমার নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়, পুনরায় সে অনুভব করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কতখানি বিঘ্ন ও বাধা জড়িয়ে আছে, 'তুশ' পরিবার' ও দু কোটি ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থতুষ্ট অভিসন্ধির সংযুক্ত প্রচেষ্টার হাত থেকে দরিদ্র জনগণকে রক্ষা করা কত কঠিন। ওরা নিয়তই ডাফিনের কানের পাশে ঘুরে ঘুরে ফিস ফিস করছে, দক্ষিণ থেকে বামে, বাম থেকে দক্ষিণে চলেছে ও:দের এই খেলা। আর ওঁর মুখ ক্রমশঃই গম্ভীরতর হয়ে ওঠে, মুখ ম্লান হতে ম্লানতব হয়ে যায়, ভ্রূযুগলের কুঞ্চন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সীমার পানে ফিরে তিনি বললেন —"এখন শুনছি যুদ্ধ পরিচালনা করার মত অর্থ নেই আমাদের, যুদ্ধ যদি চালাতে হয় তাহলে নতুন ট্যাক্স বসাতে হবে ; সে ট্যাক্স দরিদ্রদেরই দিতে হবে। 'তুশ পরিবার' আমাকে জানিয়েছেন যে তাঁরা জেরবার হয়ে পড়েছেন আর কিছুই দেবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। আর ডিউক দ্য লা ত্রেমইল প্রতিবাদের স্থরে চেঁচিয়ে ওঠেন—অসম্ভব! অসম্ভব! এ প্রশ্ন ওঠে না। নোটারী লেভাতুর এবং 'তুশ পরিবারের' সকলেই প্রতিবাদ জানালেন, বিশেষতঃ ২৭ নম্বর পরিবার আর দু কোটি ক্ষুদ্র আমানতকারীর দল চীৎকার করে আর শূন্যে চারকোটি হাত আন্দোলিত হল। আর পাহাড়ের মত স্থানু ও বর্ষীয়ান মার্শাল পেঁত্যা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, আত্মসমর্পণ করুন।"

ব্যথিত ডাফিন লীজন দ্য অনরে হাত বুলাতে বুলাতে সীমাকে বললেন—"দেখছ ত! ফ্রান্স যুদ্ধ চায় না, চায় যুদ্ধের অবসান।"

এইখানেই গিলে দ্য রেইসের প্রবেশ—কোমরে হাত রেখে উনি ঘোষণা করেন—"মাননীয় ডাফিন আপনি যা দেখছেন, তা প্রকৃত ফ্রান্স নয়, এই ভদ্রলোকদের ফ্রান্স আর আমাদের ফ্রান্স এক নয়।" রেইসের কণ্ঠ স্পষ্ট, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল। আর পেরী বাসটিড এগিয়ে এলেন—বেঁটে-খাট লোকটি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শাদা পাকা

পাকা চুল, মাথা উঁচিয়ে ভিকতর হুগোর বাছা বাছা বাণী আর জীন জাউরেসের কথা আওড়াচ্ছেন। তবুও সবাই করুণার ভঙ্গীতে হাসে ও মাথা নেড়ে বলে—"আহা লোকটির ভীমরথী ধরেছে।"

সীমা চটে গেল, সে বোঝে যে বৃদ্ধ এবং কিঞ্চিৎ নির্বোধ হলেও পেরী বাসটিড খাঁটি কথাই বলছেন, তাই ও ভ্রূ কুঁচকে ডাফিনকে বলল —"আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত মহামান্য ডাফিন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এরা যা বলছেন ফ্রান্স তা থেকে বিভিন্ন। তারপর 'তুশ' পরিবার'ও ক্ষুদ্র আমানতকারীর দলের দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল—"এই 'তুশ পরিবার' ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন। ওঁরা কিষাণদের ধরে নিয়ে আসেন, তারা বন্ধকী ঋণ শোধ করতে না পারলে তাদের এল্‌ম গাছের ডগায় ঝুলিয়ে দেন নেকড়ে বাঘের মুখে। আপনারা ঐ নোটারী লেভাতুরের বিযাক্ত শয়তানী বাণীতে কাণ দেবেন না।"

মঁসিয়ে লেভাতুর এবার অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে এগিয়ে আসেন, তার সঙ্গে আসেন অন্যান্য ব্যবহারজীবের দল। সহসা নোতরদামের সেই ক্যাথিড্রেল যেন বোঝাই হয়ে গেল। ওদের কালো পোশাক হাওয়ায় আন্দোলিত হয়—কালো পোশাক আর সাদা ফ্রিল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, সীমার কেমন মনে হল এদের যেন পখীর মত দেখতে - নোতরদামের ছাতের ওপরকার গারগয়েলের মত মুখের ভাব —সবাই পোশাকপরা আর মাথায় টুপী।

সহসা মঁসিয়ে লেভাতুর একখানি প্রকাণ্ড কাগজ নিজের তাম্র আচ্ছাদনীর ভিতর থেকে বার করে নিয়ে পাখীর মত গলায় বলে ওঠেন —"এটি হল শান্তির প্রস্তাব, শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এসেছে, এখনই এল, প্রস্তাবটি খুবই ভালো ও সুবিধাজনক। এই প্রস্তাব উপেক্ষা করে যুদ্ধ পরিচালনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।" পাখীর মত

গলায় উনি চেঁচিয়ে কথাগুলি বললেন আর নোতরদামের সেই কক্ষে সকলে সমস্বরে বলে ওঠে—"ফ্রান্স শান্তি চায়, যুদ্ধ চায় না।"

ডাফিনকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, তিনি ওদের কথায় প্রায় নতি স্বীকার করতে উদ্যত—দুঃখের সঙ্গে কাঁধ নাড়ছেন, অনুশোচনার ভঙ্গী, এখনই হয়ত বলবেন—"বেশ, তাহলে আমাদের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করা যাক।"

কিন্তু সীমা এগিয়ে এসে পতাকা হাতে ধরে দৃঢ় ভঙ্গীতে চীৎকার করে ওঠে—"ফ্রান্স কি শান্তি চায়?" তার মনে হয় সমস্ত ঘরখানি তার কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, তার কথার শ্লেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর 'দুশ পরিবার', দুকোটি ক্ষুদ্র আমানতকারীর আর আইন-জীবিদের দিকে তাকিয়ে সে ফেটে পড়ে—"ফ্রান্স, আপনারা ফ্রান্সের কতটুকু জানেন?" তৎক্ষণাৎ যে সব কথা সে কোনোদিন বলতে পারবে আশা করে নি সেই কথাই বলে উঠল, সে বুঝতে পারে ফ্রান্স কি, আর তার সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে। পাখীর মত মুখ নিয়ে আইন-জীবিরা তার দিকে ভয়ংকর ভাবে তাকায়, তাদের তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়ে সীমাকে ঠোকরাবার চেষ্টা করে, ক্ষুদ্র আমানতকারীদের তলোয়ার ওর সোনালি বর্মে এসে লাগে, তাদের চীৎকার অন্তরে এসে আঘাত করে, এদের পিছনে প্রসপার খুড়ো ভীত ও শংকিত মুখে তাকিয়ে আছেন, আরো দূরে মাদাম মুখোসধারীর মতো নিষ্প্রাণ মুখে বসে আছেন। তবু সীমা কাউকে বা কোনো কিছুকেই ভয় করে না, এমন কি প্রসপার খুড়োকেও আঘাত দিতে ওর ভয় নেই। ডাফিনকে শক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে এসেছে, তাঁকে এই দুঃখকর শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেবে না, সে জানে তাকে কি বলতে হবে, ফ্রান্স কি।

সীমা কথা বলতে শুরু করে, সে প্রস্তুত হয়ে আসে নি। কিসের পর কি বলতে হবে জানে না, কি ভাষায় যে বলছে তাই ভেবে পায় না।

তবে এটা বোঝে মুখ থেকে কথা সহজেই বেরিয়ে আসছে, তার কণ্ঠে ও জিহ্বাগ্রে আজ কার বাণী প্রতিধ্বনিত।

'দুশ পরিবারে'র কথা সে বলে, ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসেছে এই ইঁদুরের দল, নির্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জ লুণ্ঠন করেছে, বিধ্বস্ত করেছে, আর পৃথিবীর অপর ইঁদুরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সীমা চীৎকার করে বলে—"এসব সহ্য করলে চলবে না। এদের উড়িয়ে দিতে হবে, যদি কোনো পথ না থাকে এই সংক্রামিত দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে ওদের উৎখাত করতে হবে। শিকড় শুদ্ধ উবড়ে আগাছাদের পুড়িয়ে ফেলে সুন্দর দ্রাক্ষাকুঞ্জকে রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স তোমার খড়্গ উদ্যত করো, আগুন জ্বালাও—"

সীমা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে যায়—সবাই নীরব। সীমার শিক্ষয়িত্রী মামসেল রুসিলও ওখানে ছিলেন। প্রথমটায় তীব্রভাবে মাথা নেড়ে তারপর বেশ উৎসাহভরেই সব কথা শুনতে লাগলেন। শত্রুদল ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে– মাদামের ফুলো ফুলো মুখ অদৃশ্য হয়—দুকোটি আমানতকারীদের হাত নামে আর 'দুশ পরিবারে'র সোনালি বর্ম কোথায় ম্লান হয়ে যায়, আর আইনজীবিদের কালো পোশাক ক্যাথিড্রালের ছাতে মিলিয়ে যায়।

সীমার দিকে অসংখ্য উদ্দীপ্ত মুখ তাকিয়ে থাকে। সীমার সকল বন্ধুরাই সহসা যেন সেখানে এসে দাঁড়ায়। ইতিয়েন ওর মুখের পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়—পেরী বাসটিডের কুঞ্চিত মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আর গীলে দ্য রেইস গোঁফে চাড়া দিয়ে তার জোরালো গলায় হেঁকে ওঠেন—"বহুৎ আচ্ছা, বেশ বলেছে মেয়েটি— ওদের ধাপ্পাবাজী ফাঁস হয়ে গেছে। এখন বোঝা যায় যে ও পীয়র প্ল্যানকার্ডের মেয়ে।"

ডাফিন পুনরায় তাঁর রক্তিম পোশাক পরেছেন, তাঁর মুখখানি

পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠল—চোখ দুটি ভ্রূযুগের নীচে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সুরেলা গলায় ঘোষণা করলেন—"সীমা, তুমি আমাকে সত্যই সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়েছ, আমি তোমাকে টাকা ও সৈন্যবাহিনী দেব—মাদাম কি বলছেন সে বিষয় আমি কিছুই ভাবতে চাই না —"

তার পর সুরু হয় অগ্রগতি, সীমা প্রথমত ট্যাংকেই উঠেছে—তার সামনে এক বিরাট, উজ্জ্বল আকৃতি জ্বল জ্বল করছে, তাঁর পরিচ্ছদ গতির বেগে চাকচিক্যমান। সীমা দেখল ইনি তারই আরাধ্যা দেবী। "ইংগড্ ভিকটরী"—বিজয়ের দেবী। এইবার সে আর তাঁকে চলে যেতে দেবে না। এখন ওঁকে স্পষ্ট ও দেখতে পেয়েছে, বুঝেছে উনি কে!—অসহিষ্ণু সীমার সারা দেহ কম্পমান। সীমা ওর ট্যাংকটিকে সর্বোচ্চ গতিবেগে চালনা করে, কিন্তু সেই কুৎসিৎ বিরাট যন্ত্র উড্ডীয়মানা দেবীকে ধরতে পারে না। মাঝে মাঝে সীমা প্রায় তাঁকে ধরে ফেলে আর কি, দেবীর গতিবেগ মন্দ হয়ে আসে, কিন্তু তা শুধু অধিকতর বেগে উড়ে চলার বিরতি। বোঝা গেল পক্ষধারিণী দেবী ওকে মোহিনী মায়ায় আন্দোলিত করছেন,—সহসা তিনি গতিবেগ কমিয়ে সীমার মুখের পানে স্মিতহাস্যে তাকালেন। চমৎকার হাসি, আর সীমা যেন দীর্ঘক্ষণ পূর্বে এ হাসির কথাই জানত, এ যে সেই হেনরিয়েটের পাংশু পাণ্ডুর মুখ।

সীমার মনে অপার আনন্দ। সীমা ফ্রান্সকে অনুভব করে—অনুভব করে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।

সীমা একটা সর্পিল তীরস্থিত লক্ষ্য করে, এক স্থান থেকে অপরাঞ্চলে বিজয় যাত্রার অগ্রগতির চিহ্ন। সীমা দেখল ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দে উচ্ছ্বল, তার বিজয়ের ফলে ওরা একদিন ছুটি পাবে। সীমা দেখে সারা জগৎ মানচিত্রের ওপর ছোট ছোট পতাকা লাগিয়ে সীমার অগ্রগমন চিহ্ন এঁকে দেয়, এত দ্রুতগতিতে সীমা এগিয়ে চলেছে যে

ওঁরা ঠিক তাল রাখতে পারছেন না। আত্ম-গোপন করে। সীমা পিছনের সীটে বসে সব দেখে—আর আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে,

তারপর এলার্ম ঘড়ি বেজে ওঠে, তার শব্দ বেড়ে ওঠে, আওয়াজ ক্রমশঃই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই ঘণ্টাধ্বনির কারণ রাইনের ক্যাথিড্রালে ডাফিনের অভিষেক হচ্ছে। ক্যাথিড্রাল "সেলের" আগুনে বিধ্বস্ত। ছাদের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র এসে ভিতরে প্রবেশ করছে, আর অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে উঠছেন। তাতেও কিছু এসে যায় না, ঘণ্টা বাজছে, নীল আকাশে বিমানের ঝাঁক উড়ছে—আর ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে—মার্সাই সুরে ব্যাণ্ড বাজছে—সবাই সমস্বরে জাতীয় সংগীত গাইছে। বর্ম পরিহিত সীমা ঘন-নীল পোশাকে সেইখানে দাঁড়িয়ে পতাকা আন্দোলিত করছে। এখন সে বোঝে পঁচিশ লায়ার খরচ করা অন্যায় হয় নি। সীমা চারপাশে পরিচিতদের খোঁজে। গীলে স্থ রেইস এসেছেন, কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, "মামসেল—তুমি আমাদেরই একজন। এতদিন তোমাকে ভুল বুঝেছি।"

সীমার ইচ্ছা হয় প্রসপার খুড়ো আছেন কি না একবার দেখে—মাদাম হয় ত তাঁকে আসতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি এসেছেন, তাঁর মুখে একটা গর্বের ছাপ, তিনি এগিয়ে এসে একটু সংগোপনে ওর পিঠে সস্মিত ভঙ্গীতে একটা চাপড় মেরে আনন্দ প্রকাশ করলেন। সীমা একটু বিব্রত হয়েছিল—কিন্তু উনি এসেছেন দেখে আনন্দ বোধ করল।

সীমা তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল—কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলে উনি প্রসপার খুড়ো নন, ওর পরলোকগত পিতৃদেব—পীয়্যর প্ল্যানকার্ড। আর ওর বাবা বললেন—"খুকী, তুমি চমৎকার কাজ করেছ, আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি সত্যিই আমার সুযোগ্য সন্তান।"

সীমার আজ অপরিসীম আনন্দ—মানুষের এত আনন্দ হয় না—হতে পারে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

স ং ঘা ত

এক

সেতু

সরু অথচ সুদৃঢ় হাত দুটি কোলের ওপর রেখে সীমা একটু ঝুঁকে বসেছিল। যথারীতি মাদামের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করেছে। তারপর মাদাম বিশ্রাম করতে গেছেন আর সীমা বসে বসে বাসন ধুচ্ছে। এতক্ষণে কাজ শেষ হ'ল, বহুদিন পরে আজ আর কিছু কাজ তার হাতে নেই, করবারও কিছু নেই। অন্যান্য দিনের দুপুরের মত আজ আর শহরে যেতে হবে না। কিছুই অর্ডার দেবার নেই, নেওয়ার কিছুই নেই। আগামী সময়টুকু সম্পূর্ণ ওরই আয়ত্তাধীন।

এ এক অনভ্যস্ত অনুভূতি। মধ্যাহ্ন সূর্যালোকিত সুসজ্জিত বাগানটির দিকে তাই শূন্য দৃষ্টিতে ও উদাস মনে, বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বসেছিল সীমা।

এমন সময় সহসা এই বিস্ময়কর অবস্থা সম্পর্কে ওর মনে একটা অপূর্ব চেতনা জাগল। সীমা অলস ভঙ্গীতে বসে আছে, চারিদিক ঘিরে শান্ত সমাহিত এই স্তব্ধ বাড়িটি, সমুখে এই চমৎকার বাগান, প্রতি ঝোপ, প্রতি গোলাপটি সুরক্ষিত আর ওদিকে তারই চতুর্দিক বিধ্বস্ত ও বিব্রত ফ্রান্স-নগরী।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সীমা—এই অদ্ভুত পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই সে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। কোনো কিছুর জন্য তাড়া নেই। অল্প সময়ের ভিতর অনেক কাজ সেরে নেবার তাগিদ নেই। এ যেন কেমন লাগে। অবশেষে উঠে পড়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে সীমা নিজের ঘরে এসে ঢুকলো।

এখানে এই প্রথম মধ্যাহ্নটুকু একটু ক্লান্তিকর, সীমা বিছানার প্রান্তে

এসে বসল, চোখের সামনেই ওর বইগুলি রয়েছে, পেরী বাসটিড যেগুলি দিয়েছেন সেগুলি রয়েছে সবার ওপর। এখন কি পড়বে? হাত বাড়িয়ে দিয়েও একটু ইতস্ততঃ করে হাতটা সীমা সরিয়ে নিল।

আজ আর যে শহরে যাবার প্রয়োজন নেই এতে সীমা একটু অ-খুশি হয়েছে। সারা দেশে যখন বিরাট বিপর্যয় ঘটে চলেছে তখন এইভাবে চুপ করে বসে থাকা অসহ্য। শহরে সব কিছুরই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা যায়। সেখানে যা দেখা ও শোনা যায় তা বেদনাদায়ক বটে, কিন্তু কিছু না দেখা বা না শোনা আরো খারাপ।

মাদাম ভেবেছেন এই দিনটি ও বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু যদি শহরেই যায়, কি হয়? নিজে থেকেই কিছু কেনা-কাটা করতে দোষ কি? ওদের লক্ষ্য নেই, তুচার কৌটো জমাট তুধ সংগ্রহ করে রাখলে উপকারই হবে। ক্যাফে ন্যাপোলিআঁ বা বোমণ্টেও কিছু পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং সীমা শহরে যাওয়াই স্থির করল।

নিজের ইচ্ছামত কাজ করবে স্থির করে সীমা বেশ সাহসী হয়ে উঠল। মাদাম এই কালে পায়জামা পরা অনুচিত মনে করে থাকেন— কিন্তু এই সর্বব্যাপী হট্টগোলের ভিতর কে তার দিকে নজর দেবে? তা ছাড়া, পায়জামা পরার সুবিধাও আছে; ভিড়ের ভেতর দিয়ে তাড়া-তাড়ি ও সহজে যাতায়াত করা যায়, পায়জামার একটা নিরাপত্তা আছে——সীমা দেরাজ থেকে পায়জামা বার করল।

এই ঘন-সবুজ পায়জামাটী প্রসপার খুড়োর উপহার। ক্যানে থেকে বেড়িয়ে ফেরার সময় এই উপহারটি উনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। গোড়া থেকেই মাদাম জিনিসটি অপছন্দ করে আসছেন। তবে নিজের ছেলের দেওয়া উপহার বলে কোনো কথা বলতে চান নি। সীমা তুচারদিন মাত্র জিনিসটি ব্যবহার করেছে, কারণ যুদ্ধ বাধতেই ওর বিরুদ্ধে মাদামের একটা চমৎকার অছিলা জুটে গেল।

আজ মাদামের নির্দেশের ওপর কোনো শ্রদ্ধা না রেখেই সীমা সেই ঘন-সবুজ পায়জামা বার করে পরল। তারপর বিরাট বেতের ঝুড়িটি হাতে ঝুলিয়ে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল।

সংকীর্ণ ও ঘোরালো পার্বত্য পথ বেয়ে সীমা চললো, প্রাচীন ও রঙীন বাড়িগুলির প্রতি-প্রস্তরখণ্ডটুকুও ওর পরিচিত, এখন পথে পথে যেসব শরণাগতের দল আলস্য ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যেও আর নূতনত্ব নেই। তবু আজ শহরটি কেমন পরিবর্তিত মনে হয়— অধিকাংশ প্রাক্তন বাসিন্দারা আর নেই, ভাঙা বাড়ির ছাতের নুড়ি নোড়া যেমন খসে পড়ে তেমনই তারাও শহর থেকে খসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে অভিবাদন ও দু'একটি কথা বিনিময়ে সীমা অভ্যস্ত ছিল। এই সব কথার সাধারণতঃ সামান্যই মূল্য, অনেক ক্ষেত্রে আবার একান্ত অনর্থক, কিন্তু এই অর্থহীন কথাগুলি আজ শোনা গেল না বলে সীমা অপরিসীম বেদনানুভব করতে লাগল।

একটা আকস্মিক সংবাদ পেয়েই শহরের অনেকেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। এখন মনে হয়, এখনও আবার কয়েকজন রয়ে গেছেন। সেদিন নদীর সেতুর ওপর সংঘটিত শোচনীয় ঘটনার নিদারুণ সংবাদ পেয়েই তারা সরে পড়েছে।

ব্রীজের ওপর দিয়ে ৭ ও ৭৭নং রাস্তায় পৌঁছবার একমাত্র উপায়। চার ঘণ্টা ধরে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে জনতা এই ব্রীজের ওপর আটক পড়েছিল, অসহায় ভাবে বিজড়িত অবস্থা। জার্মান বৈমানিকরা উড়ে এসে বোমা ফেলে যেতে পারে সকলের মনেই এই আতংক, কিন্তু যারা বরাবর বলে এসেছে এখানে কোনো বিপদ নেই, এতদিন পর্যন্ত তাদের কথাও ফলেছে। এই জেলাটির সামরিক গুরুত্ব নাই। সেই কারণেই সামরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করা যায় নি। আর শহরটিতে এতাবৎ বোমাও বর্ষিত হয় নি। কিন্তু এতৎসত্বেও জার্মান বৈমানিকরা সেতুর

ওপর এসে পলাতক শরণাগতদের ওপর গুলি চালিয়েছে—ফল হয়েছে ভয়ংকর। কতগুলি যে নিহত হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। সবাই শুধু জানে তারা সংখ্যায় অনেক। আর আহতদের অবস্থা আরো শোচনীয়। জনবহুল পথ বেয়ে এ্যামবুলান্স অতি মন্থর গতিতে চলেছে; হাসপাতালগুলি বোঝাই হয়ে উঠেছে। আহতদের নেভারস্ অঞ্চল পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়েছে।

যুদ্ধ যে সেণ্ট মার্টিন পর্যন্ত এই ভাবে এগিয়ে এসেছে এই কারণে অধিবাসীবৃন্দ যারা এতদিন কোনো রকমে আটকে ছিল তারাও আতংকিত হয়ে উঠল। সেদিন নদীর ওপরকার এই সেতুটি উড়িয়ে দেওয়ার কথাও শোনা যেত। তাই যদি করা হয় তাহলে দক্ষিণ-মুখী রাস্তাগুলি সব বন্ধ হয়ে যাবে আর সবাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। পালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তি শতবার বিচার করে অবশেষে তারা থেকে যাবেন স্থির করেছিলেন। এখন আবার তারা বিচার শুরু করলেন। মঁসিয়ে লা রোস বা অমিয়টের—বা আরো অনেকের মত পালানোটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর একদিনের ভিতর স্থির করে ফেলতে হবে, হয়ত কয়েক ঘণ্টার সময় মিলবে। নিজেদের মধ্যে বা অপরের সঙ্গে আলোচনা করে, সবাই ইতিকর্তব্য স্থির করতে লাগল। এমন কি সীমাকেও তারা মতামত জিজ্ঞসা করল।

সীমার মনে এতটুকু সন্দেহ বা সংশয় ছিল না। ওরা যদি পালায় ত রাজপথে ভিড় বাড়িয়ে সেনাবাহিনীর যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করবে। ওদের থাকতেই হবে। এতদিন আশা ছিল জার্মানদের সেণ্ট মার্টিন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে, আর তা না হলেও দক্ষিণাঞ্চলের চাইতে ওখানেই ওদের প্রয়োজন বেশী।

সীমা বুঝলো ব্রীজের ওপরকার এই ঘটনা বাসিন্দাদের চাইতে শরণাগতদের বিভিন্ন ভাবে ঘা দিয়েছে। অতীতে শরণাগতদের

একমাত্র বাসনা ছিল এগিয়ে যাওয়া, যতদূর যাওয়া যায় ততই ভালো, নিরাপত্তার দিক থেকে দূরত্বই কাম্য। ক্রমশঃ কিন্তু এই বাসনা চাপা পড়লো। ব্রীজের ওপরকার ঘটনা শরণাগতদের মনের তীক্ষ্ণ উদাসীনতা বাড়িয়ে তুললো। আর এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন, কোথায় গিয়ে জার্মানদের মুখে পড়বে একথা চিন্তা করার আর কি প্রয়োজন, বিপদ সর্বত্রই। ব্রীজের এই ঘটনাতে এই কথাই প্রমাণিত হল যে এই সেণ্ট মার্টিনের চাইতে পথেই বিপদ আরো অধিক। খাবার জিনিসের অভাব, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব, তবু তারা থেকে যাবে স্থির করল। এই অঞ্চলে দু' তিন দিন কাটিয়ে এই শোচনীয় ছোট্ট জায়গাটি ওদের ভালো লেগেছে। "হল অফ জাস্টিসের" ঘরের বিছানা বা "প্লাস দু জেনারেল গ্রামোর" কোণটুকুও ঢের বাঞ্ছনীয়। আর দূরে যাবার বাসনা ওদের নেই।

ভ্যাপসা গরমের ভিতর শরণাগতদের দল কাফেগুলির সামনে বসে আছে। ব্রাণ্ডি বা অন্যান্য ধরনের সুরাপান করছে, ঝিমোচ্ছে বা ক্লান্তভাবে কথা বলছে। একই ধারায় এইভাবে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ক্যাকে ন্যাপোলিয়ঁার লাল ও জরদা রঙের ক্যাম্বিসের প্রাঙ্গণ সীমা ঝুড়ি হাতে নিয়ে পার হয়ে এল। ঘন-সবুজ পায়জামায় এই দীর্ঘদেহা দৃঢ়মুখাকৃতিবিশিষ্ট মেয়েটিকে ভালোই দেখাচ্ছিল, তাই পুরুষেরা তার মুখের পানে তাকাতে লাগল। টেবিলের পাশ বেয়ে পথ করে নিয়ে সীমা যাবার সময় কে কি বলছে কান পেতে শোনে। একটি টেবিলে তর্ক চলছিল, জার্মানরা কাল আসতে পারে। কেউ ই ঠিকমত জানে না, তবু সবাই নিজস্ব মত জোর করে আঁকড়ে আছে। একজন বললেন, চার দিনের আগে ওরা এখানে আসতেই পারে না। এই সামরিক গুরুত্বহীন একটা অকিঞ্চিৎকর জায়গা দখল করার চাইতে

অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওদের হাতে আছে। আরেক জন বলছিলেন, ওরা অবিশ্বাস্য রূপে দ্রুতগামী ও নিখুঁত, যদি ওরা ৭ ও ১৭ নং রাস্তা ধরে অগ্রসর হয় তাহলে এই পূর্বদিককার অংশটুকু ওরা নিশ্চয়ই অধিকার করবে। তৃতীয় ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ বয়স্ক, তিনি বললেন যে—জার্মানদের পক্ষে এখানে আসার কোনো কথাই ওঠে না। শুধু ম্যাজিনো লাইন নয় লয়রে আমাদের সৈন্যাবস্থান এমনই করা হয়েছে যে তা ভেদ করে আসা জার্মানদের অসাধ্য। জার্মানরা তাদের কিছু সৈন্য এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ত এখানে পাঠাতে পারে না। বাকী সবাই অদ্ভুত মুখাকৃতি করে নীরব রইল, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন বললেন—ওরা যদি এখানে আসত, তাহলে আমাদের এই শোচনীয় প্রতীক্ষার অবসান ঘট্‌তো।

ইতিমধ্যে সেতুর দুর্ঘটনা সম্পর্কিত নতুন নতুন গুজব নিয়তই ছড়াতে লাগল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। ঠিক ঠিক সংখ্যা পর্যন্ত বলে দেয়। একজন খবর দিলেন, ২১৪ জন নিহত, আর ৮৯ খানি এ্যামবুলান্স তাঁরা স্বয়ং গুণেছেন। আরেকজন, তাঁর মুখাকৃতি বেশ গম্ভীর, তিনি জোর গলায় বললেন—১৬৮ জন নিহত, আর এ্যামবুলান্সের সংখ্যা ৯৮। প্রথম ব্যক্তি তাঁর সংখ্যা আঁকড়ে রইলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের বক্তব্য ধরে বসে ফুলতে লাগলেন; উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি লাগে আর কি।

সীমা নীরবে দাঁড়িয়ে আগ্রহভরে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

এই সময় একজন তরুণ এসে ঢুকলেন। রোগা, লম্বা, জোড়া-ভ্রু ও তীক্ষ্ণ মুখ। সীমার হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠল, ইতিয়েন শহরে এসেছে। ঠিক এই সময়ে ইতিয়েন ওকে দেখতে পেয়ে টেবিলশ্রেণী পার হয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। খুশিতে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, একটু

বেয়াড়াভাবেই সীমার হাত দুটি হাতের ভিতর চেপে ধরে ইতিয়েন তাকে কাফের ভিতর এসে বসবার আহ্বান জানালো।

এ এক অস্বাভাবিক, অশ্রুত আমন্ত্রণ। কিন্তু মাদামকে না বলে এভাবে চলে আসাও ত অস্বাভাবিক, কাফে ন্যাপোলিআঁতে ঘন-সবুজ পাজামা পরে সীমা যে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাও কি কেউ আগে শুনেছে? কালই এর জন্য দায়ী। সীমা ইতিয়েনের আমন্ত্রণ গ্রহণে ইতস্ততঃ করল না।

কাফে ন্যাপোলিআঁর ভিতরটি প্রায় অন্ধকার, ধোঁয়াটে, ভিতরটা একরকম শূন্য, আর বাইরের উত্তাপের তুলনায় ভিতরটিতে বেশ আরামদায়ক ঠাণ্ডা। এইখান থেকে লাল ও জরদা রঙের ক্যাম্বিসে-ঘেরা কাফের চাতাল দেখা যায়, আরো দূরে পার্ক, মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দুগ্লাস এ্যাপেল সাইডার নিয়ে দুজন তরুণ-তরুণী একটি মর্মর টেবিলে বসত। উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধ, উভয়ে উভয়ের, এখন এই ছায়াচ্ছন্ন শীতলতা, ভালর মাঝে সংরক্ষণী প্রাচীর হয়ে উঠেছে। শান্তির সময়েও ষোলো বছরের ইতিয়েনকে বেশ গম্ভীর ও চিন্তাশীল দেখাত। আজ তাকে দেখে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, আজ আর তার স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ ভঙ্গীতে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

চ্যাটিলো থেকে সে অতিকষ্টে চলে এসেছে, এই দুঃসময়ে বাপ ও মাকে একা ছেড়ে রেখে আসতে তার ইচ্ছা ছিল না। ওর বাপ-মাও কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এক সময়ে ওদের মনে হ'ল যে কোনও উপায়ে চলে যেতে হবে, আবার পর মুহূর্তেই ভাবেন যে-কোনও অবস্থায় থেকেই যাবেন। বাবা যদি থাকার মত করেন, মা চলে যাওরার স্বপক্ষে যুক্তি দেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হ'ল, দেখা গেল ভুল জিনিস বাঁধা হয়েছে। নূতন করে বাঁধা হ'ল, অবশেষে কিন্তু থাকা স্থির হওয়ায় বাঁধা জিনিস আবার খুলে ফেলা হ'ল।

সীমার কাছে মাথাটা এগিয়ে নিয়ে ইতিয়েন বলে—এ এক অসহ্য অবস্থা! নিজেদের ভিতর বলেই বলছি! কি যে করা উচিত তা আমি নিজেই দীর্ঘকাল স্থির করতে পারিনি। তারপর অকপটে বলে—আর সবায়ের চাইতে আমার স্বপক্ষে যুক্তি অনেক বেশী। সবাই বলছে জার্মানরা নাকি শাদা পোশাকের সামরিক বয়সের যুবকদের কড়া চোখে দেখছে, সন্দেহ করছে সামরিক পোশাকের বদলেই শাদা পোশাক ধরেছে। ও:দের চোখে সন্দেহজনক এমন অসংখ্য যুবকদের ওরা ধরে রেখেছে, ওরা একবার ধরতে পারলে আর ছাড়বে না। আমাকে আবার বয়েসের অনুপাতে বড় দেখায়। তারপর গর্ব ও হতাশার ভঙ্গীতে বলে—আমি কিন্তু জার্মানদের হাতে ধরা পড়তে চাই না, এখানে তাই তেমন নিরাপদ বোধ করি না।

সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখে হাসির রেখা ফুটলো। তারপর সহসা সিদ্ধান্ত করে বসে—এখন আমি বুঝি কি করতে হবে। আশ্চর্য! এখানে তোমার সঙ্গে বসেই আমার মনে হল কথাটা। আমার এমন আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, আমি থাকবো—হয়ত জার্মানরা এলেও আমাদের কিছু করার থাকবে।

এই কথায় সীমার হৃদয় আবেগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এখানে ওরা উভয়ে একত্রে বসে নিজেদের পথ, নিজেদের কর্তব্য নিজেরাই স্থির করছে, যারা নিজেদের পথ খুঁজে নেয় তাদের মতই আজ ওরা সিদ্ধান্ত করতে বসেছে। দীর্ঘায়ত করুণাঘন ডাগর চোখ দুটি দিয়ে ইতিয়েনের মুখের দিকে তাকিয়ে সীমা আগ্রহভরে বলে—নিশ্চয়ই থাকবে, আর নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করতে পারবে। কিন্তু এখনই তা ঘটবে না—তারপর গলার স্বর নিচু করে বলে—এখনো ম্যাজিনো লাইনে রয়েছে, আর পশ্চিম লয়রে আমাদের সৈন্যাবস্থান দুরতিক্রম্য। গত যুদ্ধে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে 'মার্নে'তে এর চাইতে বড় বিপদের মুখে আমরা

পড়েছিলাম। কথাগুলোয় বেশ জোর দিয়েই বেশ বিশ্বাস নিয়ে বলে সীমা।

ইতিয়েনের দৃষ্টি বন্ধুতা ও শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ। কিছুকাল উভয়ের মুখে আর কথা নেই। বাহির থেকে শরণাগতদের ফিস্‌ফাস আর গ্লাসের আওয়াজ ভেসে আসে। কেউ রেডিয়োর বোতাম ঘোরায়, আর মাঝে মাঝে মার্সাই সঙ্গীতের সেই সুর ভেসে আসে—"আক্স আরম্‌স সিটোওয়েন্স।"

সীমা সহসা শুরু করে—গত রাত্রে হেনরিয়েটকে স্বপ্ন দেখেছি। কথাটা বলার তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না বলেও থাকতে পারে না। সীমা, ইতিয়েন আর হেনরিয়েট একত্রে পার্ক-দ্য-কাপুসিনে ছোটবেলায় খেলা করেছে, উভয়ের মধ্যে অসংখ্য গুপ্তকথা ছিল, সকলের মধ্যে ওদের বন্ধন ছিল অবিচ্ছিন্ন। হেনরিয়েট তার ভাইটিকে নানাবিধ শ্লেষ-বাক্যে জর্জরিত করত, সীমার সামনেই। ইতিয়েন তার সকল বিপদে ওর কাছেই সহানুভূতির আশ্রয় খুঁজত। সীমাও প্রায়ই হেনরিয়েট সম্পর্কে আলোচনা করত। প্রেম ও প্রীতিভরেই সে আলোচনা চল্‌ত। তার মৃত্যুর পর যেন পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে তার সম্পর্কে কোনো কথা বলা বন্ধ করেছে।

এখন খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সীমা বলে ওঠে—গত রাত্রে হেনরিয়েটকে স্বপ্নে দেখেছি। ইতিয়েন তার মুখের দিকে আগ্রভরে তাকায়—সীমা বলে চলে—ওর কথা আমি কমই ভাবি, কিন্তু মাঝে মাঝে ওকে স্বপ্নে দেখি: কী আশ্চর্য বল দেখি, কাল রাতে ওকে দেখলুম যেন ওই—'জোন অব্ আর্ক'।

ইতিয়েন ওর এ্যাপেল সাইডার পান করে বলে উঠল—আশ্চর্য! সীমা আশা করছিল, ইতিয়েন প্রশ্ন করবে, তার জন্যই সে অপেক্ষা করেছিল, ভয়ও ছিল—কিন্তু ইতিয়েন এ বিষয় আর

জেদ করলো না। সে বরং প্রশ্ন করল—বাড়ির অবস্থা কি এখনও সেই রকম?

সীমা জবাব দিল—হ্যাঁ, ওখানকার অবস্থা কোনোদিনই সহজ নয়। ইতিয়েন বলল—তুমি সাহসী মেয়ে। পীয়্যর প্লানকার্ডের যোগ্য মেয়ে।

সীমার মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল।

উভয়ে উঠে পড়ে। ইতিয়েন কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে যায়। পালেস নইরেট যেখানে ডেপুটি প্রিফেকট্ থাকেন সেই বাড়ি অতিক্রম করল ওরা। শরণাগতদের সুদীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়ে আছে। তিনজন পুলিস পাহারা দিচ্ছে।

চারপাশের এই আতঙ্কের আবহাওয়া সীমার মনে সংক্রামিত হয় নি। তবে সে তার বিশ্বাস ও ধারণার সমর্থন খুঁজছিল। এই সব ঘটনাবলী সম্পর্কে যা প্রকৃত তথ্য তা শুধু জানা আছে ডেপুটি প্রিফেক্টরের সেক্রেটারী মঁসিয়ে জাভিয়েরের বাসটিডের।

মঁসিয়ে জাভিয়েরের সতর্ক ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ, চোখ দুটি বাদামী রঙের। সীমার ধারণা ওর মেজাজ বাপের মতোই রুক্ষ। বাপের এই মেজাজের জন্য কৈশোর-যৌবনের অনেক উদ্দামতাকে মানিয়ে নিয়েছেন মঁসিয়ে জাভিয়ের। যখন উনি গম্ভীর ভাবে ধীর পদক্ষেপে ডেপুটি প্রিফেক্টরের অফিসে উঠতেন, যখন মামলাকারীদের যুক্তি শুনতেন, তখন কিন্তু বোঝা যেত না যে এই লোকটির আসল প্রকৃতি তার বাপের মত। যে ভাবে তিনি তাঁর ভীষণ মেজাজ সংযত করে রাখতেন সীমা বিশেষ করে তার প্রশংসা করত।

মঁসিয়ে জাভিয়ের, পীয়্যর প্লানকার্ড ও চার্লস-মেরী লেভাতুর একসঙ্গে স্কুলে পড়েছেন। পীয়্যর প্লানকার্ডকে যেভাবে উনি ভালো-বাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন সেইভাবেই ইনি লেভাতুরের সঙ্গে লড়েছেন, আর সীমা তাঁর অতিশয় প্রিয়।

সীমা প্রতীক্ষমান শরণাগতদের সুদীর্ঘ লাইন দেখেছে, সে ভালো-ভাবেই জানত যে আজ মঁসিয়ে জাভিয়ের অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু তাঁর সদুপদেশ, শ্লেষাত্মক কণ্ঠ শোনার জন্য সীমা উদগ্রীব। আজও হয় ত সীমার জন্য এতটুকু সময় তিনি করে উঠতে পারবেন না।

ইতিয়েনকে বিদায় জানিয়ে বিশেষ হাঙ্গাম না করেই সে ডেপুটি প্রিফেক্টরের অফিসে ঢুকে পড়ল।

এই শক্তিময় প্রাচীন প্রাসাদের অন্তরালে আজ নেমেছে সংশয়ের ছায়া। বাইরের বারান্দায় যদিও প্রবল পাহারা বসেছে, তবু ভিতরকার অফিসের দরজাগুলি উন্মুক্ত। সব অফিসেই সবায়ের প্রবেশাধিকার রয়েছে, আর শরণাগতেরা অফিসারদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসাররা তাদের বলছেন যে তোমরা শহর ছেড়ে চলে যাও। খাবার দাবার জিনিষপত্রের বড়ই অভাব, তারা আরো দক্ষিণে চলে যায়, সেখানে তবু খাবার জিনিসের অভাব নেই। তাছাড়া পথের ভিড় আগেকার চাইতে একটু কম, জার্মানরা ইতিমধ্যে ইওন এমন কি লে ক্রিউসট ছাড়িয়ে চলে এসেছে। একথাটা যে সম্পূর্ণ আজগুবি তা বোঝা গেছে। পলাতকরা কিন্তু মুহ্যমান ও সন্দিগ্ধ। আরো আগে যেতে হলে সেরিন নদীর ওপরকার ব্রীজ পার হতে হবে, আর ঐ ব্রীজের ওপর যে বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে সে বিষয়ে জনগণের মনে যে ত্রাস সঞ্চারিত হয়েছে তা বিদূরণ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। জনতা তাই উত্তেজিত হয়ে বলে—আপনারা কোনোমতে আমাদের এড়িয়ে যেতে চান, আমরা ব্রীজের ওপর মরি কি অন্যত্র মরি তাতে আপনাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

এই হট্টগোল ও জনতার ভিতর উদ্বেগাকুল চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডেপুটি প্রিফেক্টর মঁসিয়ে কর্ডিয়ের, তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। তারা কিন্তু আরাম চায় না, চায় দু-একটুকরো রুটি আর রাতের জন্য একটু আশ্রয়, ছোটদের জন্য চাই দুধ, রুগ্নের জন্য ওষুধ। সীমা জানতো

যে ডেপুটি প্রিফেক্টর ও তাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সীমা একথাও জানে যে ইচ্ছা থাকলেও জনতার মতোই তিনি অসহায়।

সীমা জানতো ডেপুটি প্রিফেক্টরের অফিসের কাজকর্ম আসলে ম সিয়ে কাডিলিয়র নয় ম'সিয়ে জাভিয়েরই দেখে থাকেন। দুঃখের বিষয় ম'সিয়ে জাভিয়েরের ক্ষমতা খুব কম। ওপরওলাদের দৌর্বল্যের বিরুদ্ধে তাঁকে নিঃশব্দে লড়তে হয় তাতেই তিনি খুশি, আর এতখানি করে এতটুকু ফললাভ হয় তার জন্য তিনি ক্ষুব্ধ।

সীমা ওঁর অফিসঘরে ঢুকলো—সীমার দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন, কিন্তু এমন ভঙ্গী করলেন যাতে বোঝালো যে তিনি ব্যস্ত। একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে তিনি তর্ক করছেন। সীমা যে অপেক্ষা করতে লাগল তাতে যেন তিনি একটু বিস্মিত হলেন, কিন্তু তাঁর আপত্তিও বোঝা গেল না। অফিসে তিনজন লোক ছিল, বোঝা গেল তারাও বাস্তুত্যাগীর দল, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তারা কথা শুনছে। সীমা তাদের পাশে দাঁড়ালো।

জানা গেল যে পুলিস অফিসারটি তার লোকজন নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। প্যারীর ট্রাফিক পুলিসবাহিনীর লোক এরা, দক্ষতা ও শিক্ষায় প্যারীর পুলিসবাহিনী অতুলনীয়। বিপজ্জনক অংশে ট্রাফিক পরিচালনা করার জন্য অফিসারটিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। ম'সিয়ে জাভিয়ের তাঁকে বলছিলেন যে সেরিন ওপর দুটি অফিসার দিতে। তিনি বলেছিলেন, তা যদি করা হয়, তাহলে বাস্তুত্যাগীদের একটা অংশকে সেণ্ট মার্টিন ত্যাগ করতে রাজী করা যেতে পারে। সামান্যতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার সামর্থ কারো নেই, কাজেই বাস্তুত্যাগীদের যেতে হবে। কিন্তু ওরা সেরিন নদীর সেতু সম্পর্কে আতঙ্কিত।

পুলিস অফিসার তাঁর কোনো লোককে সেতুর ওপর রাখতে রাজী ন'ন। তাঁর হাতে অল্প সংখ্যক লোক। তাঁর হাতে যদিও ক্ষমতা

আছে তবু তিনি হুকুম পেয়েছেন সুদূর দক্ষিণে ট্রাফিক পরিচালনা করার। তাছাড়া তাঁর আশঙ্কা এখানে যাদের রেখে যাবেন তারা জার্মানদের কবলে পড়ে যাবে। চোস্ত ফরাসী ভাষায় তিনি বহুবিধ আপত্তি উত্থাপন করছিলেন, আর যেন বড় তাড়া এই ভাবে পুনঃ পুনঃ হাতঘড়ি দেখতে লাগলেন।

সেই তিনজন বাস্তুত্যাগীর সঙ্গে সীমা নীরবে দাঁড়িয়েছিল। সে নিঃশব্দে ও অসীম ধৈর্যভরে তাদের বক্তব্য শুনছিল, ও পর্যায়ক্রমে বক্তাদের মুখের ওপর তার চোখ ফিরছিল। মঁসিয়ে জাভিয়েরের আকৃতি ওর ভালোভাবেই জানা। মুখের দক্ষিণ দিকে ওঁর যে বিরাট চিহ্ন আছে তা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সীমা বুঝছে যে উনি মনে মনে নিজের এই রাগকে সংযত করার চেষ্টা করছেন, শত শত দুর্গত জনগণকে বাঁচাবার জন্য উনি চেষ্টা করছেন. ওঁর শহর সেণ্ট-মার্টিনকে অধিকতর দুর্দশার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ওকে অত্যন্ত কূট-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে, তাই প্যারীর এই অফিসারবৃন্দের সামনে যা বলা উচিত তা বলার জন্য মুখ খুলতে চান না। বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে সীমাও এই প্যারীর অফিসারদের মনোভাব বুঝেছে। ওদের পাঠানো হয়েছে সুদূর দক্ষিণের বিপজ্জনক ঘাঁটিতে শান্তি স্থাপনের জন্য, সেইটুকুই উনি করবেন, মধ্য-ফ্রান্সের এখানে ওখানে পাহারা ছড়িয়ে রেখে দিতে রাজী ন'ন। ওঁর মনোভাব বোঝা যায়,—সীমা কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে বুঝতে পারে এখানে যে শরণাগতের দল দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাথায় কি খেলছে। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে তাদের দুর্দম আশা ও দৃঢ়তার দিকে লক্ষ্য করার কিছুই নেই। মনে মনে মঁসিয়ে জাভিয়েরের মত সীমাও শরণাগতদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছে, কৌশলে প্যারীর এই লোকগুলিকে আটকাবার চেষ্টা করছে।

মঁসিয়ে জাভিয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন,—পুলিস অফিসাররা

এলোমেলো উত্তর দিচ্ছেন উদাসীনভাবে। তাঁরা তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চান। তিনজন বাস্তুত্যাগী আর ঝুড়ি হাতে সীমা তাঁদের কথা আগ্রহভরে শোনে।

ডেপুটি প্রিফেক্টর এলেন,—বিষাদভরে ও ভদ্র ভঙ্গীতে তিনি বললেন —সজ্জনবৃন্দ, আপনারা কি এখনো কিছু মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি? সেতুর ঘটনা সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু নূতন সংবাদ এসে পৌছেচে। তিনি বললেন -সেখানে যা ঘটেছে তা এতই বীভৎস ও শোচনীয় যে তা কল্পনাতীত। ম সিয়ে জাভিয়ের জোর দিয়ে কথাটি শেষ করে বলেন—এখন যদি কোথাও বিপদ থাকে, তাহ'লে এই সেরিন নদীর সেতু।

যুক্তি তর্ক শুনে পুলিস অফিসারটি বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে, তিনি বললেন—স্টাফের কাছে আবেদন জানিয়ে ব্রীজটাকে উড়িয়ে দিলেই ত' পারেন। তাছাড়া,—তিনি আবার বলেন—এইসব দুর্ঘটনার খবর গোড়ার দিকটায় অযথা অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। এই বলে তিনি দস্তানায় হাত ঢাকলেন।

তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী সীমা লক্ষ্য করছিল। এইবার হয়ত উনি যাবেন, কিন্তু যে কোনো উপায়ে ওঁকে থামাতে হবে। যে কোনো উপায়ে ওর লোকজনের কিছু অংশ এখানে রাখবার জন্য ওঁকে রাজী করতেই হবে। সীমা সহসা বলে উঠল—"২১৪ জন নিহত হয়েছে।" জরদা ও লাল রঙের ক্যাম্বিসের ছাউনী নীচে আহত ও নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কলহরত শরণা-গতদের সীমা মানসচক্ষে দেখতে পায়। যে লোকটি ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীরভাবে নিজস্ব 'সংখ্যা' আঁকড়ে ধরেছিল তাঁকেও সীমা দেখতে চায়।

সীমা পুনরায় বলে ওঠে—২১৪জন নিহত, ৮৯ খানি এমবুলান্স নেভারসে গেছে, তবুও অনেক আহতদের ছেড়ে যেতে হয়েছে। নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ভাবে ঝুড়ি হাতে শীর্ণাকৃতি সীমা দেয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে

ছিল। কিন্তু তার সুন্দর পরিষ্কার কণ্ঠস্বর দীপ্ত সুরে ধ্বনিত হ'ল। সীমা নিজেই বোঝে না কেমন করে এতখানি সাহসভরে সে এত কথা বলতে পারল। পুলিস অফিসার বা ডেপুটী প্রিফেক্টরের অফিসের লোকজন মঞ্চের সেই লোকগুলির চাইতে প্রকৃত সংখ্যা হয়ত ভালো করেই জানেন।

সবাই সীমার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, সে সোজাসুজি চেয়ে আছে, যেন কিছুই হয় নি, কথাটা যেন তার মুখ থেকেই বেরোয় নি— ঘরে একটা ক্ষণিক স্তব্ধতা বিরাজ করে। প্যারীর সেই পুলিসের ভদ্র-লোকটি তখনও হাতের দস্তানা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তারপর মঁসিয়ে জাভিয়ের বা সীমার দিকে না তাকিয়েই হয়ত উনি মনে করেছিলেন সীমাও শরণাগতদের একজন—আবেদনকারীকে লোকে যে ভাবে সম্বোধন করে সেই ভাবে বললেন—আচ্ছা আমি সেরিন নদীর সেতুর ওপর দুজন পাহারা রেখে দেব। তারপর মঁসিয়ে কার্ডেলিয়রের সঙ্গে উনি বেরিয়ে যান।

মঁসিয়ে জাভিয়ের দ্রুতগতি সীমার সামনে এসে দাঁড়ান, সহসা ওঁকে ঠিক যেন সীমার বাবার মত দেখায়। সীমার মাথার ওপর হাত রেখে প্রসন্ন হাসি হেসে, তার মাথাটা নেড়ে দিয়ে তিনি বলেন—তোমার কি হয়েছে সীমা? ব্যাপারটি কি?

সীমা নিজেই জানে না সে কি ভাবে এই সব ভদ্রলোকদের সামনে মুখ তুলে, এতখানি সাহসভরে এত কথা বলে গেল। কিন্তু তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী তার কাছে মোটেই অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। তার মনে হয়েছিল প্রাণ গেলেও তার এই কথাগুলি বলা উচিত।

মঁসিয়ে জাভিয়ের বললেন—এইবার শরণাগতদের কি ভাবে পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।" সীমা যাবার জন্য প্রস্তুত। মঁসিয়ে জাভিয়ের বললেন—সীমা, তুমি অতি চালাক মেয়ে—তোমার বাবা থাকলে কত খুশি হতেন।

দুই

মঁসিয়ে লে মার্কুই

ভিলা মনরেপোতে ফেরবার সময় হয়ে এল। কিন্তু সীমা একথা ভাবতেও পারে না। আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ, কুয়াশায় সীমা মুসড়ে পড়েছে। কথা কইতে তার এতটুকু কষ্ট হয় নি, সে সহজেই কথা কয়েছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলেছে অথচ তার ফল ফলেছে চমৎকার। সীমার আনন্দ হয়েছে কিন্তু মন সংশয়াচ্ছন্ন।

সীমা এমন একজনকে চায় যার সঙ্গে দুটো কথা বলা চলে, সীমা ইতিয়েনকে খোঁজে। সীমা তার বাড়িতে যেতে চায় না কারণ তার বাবা-মার সামনে সে কিছু বলতে চায় না—সীমা পথ দিয়ে চলে, কাফে ন্যাপোলিওঁ পার হয়ে যায়—ওখানেও ইতিয়েন নেই।

সীমা শহরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। তারপর সহসা এ্যাভিন্যু দ্য পার্কে। প্লানকার্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর গ্যারেজের দিকে এগিয়ে যায়।

সীমা খুব দ্রুতগতিতেই চলে, তার বাঁকা ঠোঁটে হাসির রেখা। আজ আর তাকে লাল পাম্পের ধারে দাঁড়াতে হবে না। আজ আর লোকের প্রসাদ ভিক্ষা করতে হবে না। আজ আর লাল পাম্প নেই, ছায়া ঢাকা বেঞ্চের নীচে কেউ বসে নেই। আজ শরণাগতদের চলাচলের বন্দোবস্ত করার জন্য লরিগুলি ঘুরছে। ডেপুটি প্রিফেক্টরের অফিস ছেড়ে আসার পর একঘণ্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই মঁসিয়ে জাভিয়ের ও ডেপুটি প্রিফেক্টর প্রসপার খুড়োর কাছে খবর পাঠিয়েছেন—আর লরিগুলো হয়ত পথে বেরিয়ে পড়েছে।

আজ আর তার মরিসকে ভয় নেই, সীমা আজ এমন কাজ করেছে যদ্বারা প্রমাণিত হবে যে সে নেহাৎ 'ভিলা মনরেপোরই একজন' মাত্র নয়। আজ যদি মরিস তার অশ্লীল ইঙ্গিত করে তাহলে তার জবাব সীমা দেবে। আজ তা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার শক্তি তার হবে।

কিন্তু মরিস কিছু করবে না, আজ আর সে অফিসেই হয়ত থাকবে না। সেও হয়ত, ইতিয়েনের মত শুনেছে সামরিক বয়সের ছেলেদের সন্ধানে জার্মানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জার্মানরা এলে তাদের বিপদ। আর মরিস ত আর ইতিয়েন নয়, মরিস বসেদের জন্য অপেক্ষা করবে না। আইনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, মিলিটারী প্লানকার্ড কোম্পানীতে যে কাজ নিয়ে বসে থাকে, এমন অবস্থায় সে যে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! সে পালাবে, নিরুদ্দেশ হবে, মাদ মের ভাষায় চম্পট দেবে।

সীমা এখন অফিসে। বুককীপার পেরুর কাছে শূন্য ঝুড়িটি রেখে সীমা বললে, কিছুই পাওয়া গেল না। ও নিজেকে এবং পেরুকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যেন ও দৈনন্দিন কাজেই বেরিয়েছে। মঁসিয়ে পেরোঁ বিষাদভরা কণ্ঠে বললেন, কিছুই পাওয়া যাবে না মামজেল, তা জানি। তাঁর খরগোসের মতো মুখখানা আগের চাইতেও অসুখী দেখায়। উনি অভিযোগের সুরে বলতে থাকেন, সবই ভেঙে পড়ছে, মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ড কেন যে সেই ভয়ঙ্কর দিনের অপেক্ষায় চুপ করে বসে আছেন বুঝি না। সব লোকজনই প্রায় চলে গেছে, এমন কি বুড়ো আর্সেন পর্যন্ত। ভেবে দেখো লোডিং ইয়র্ডে একটা দারোয়ান পর্যন্ত নেই। অথচ আমি যখন কর্তাকে প্রশ্ন করলাম, সত্যিই কি উনি এখানে থাকতে চান, উনি তখন বিশ্রী কেমন একটা ভঙ্গী করলেন। অবশ্য বুঝি এই ব্যবসার জন্যে উনি যে কতখানি দায়ী তা উনি নিজেই বোঝেন। অফিস যদিও সম্পূর্ণ ফাঁকা তবু—সীমার কানের কাছে মুখ এনে উনি

খুব মৃদুস্বরে বললেন, উনি আমাদের কর্তা, প্রাচীন রোমানদের মতো কঠোর ও সাহসী। ভেবে দেখো স্বয়ং মাদাম মিমারেলস্ এখানে এসে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে কত সাধাসাধি করলেন। কিন্তু উনি কাজ ছেড়ে যাবার লোকই নয়, পাকা রোমান। ব্লণ্ড, সুশ্রী, স্থূলাঙ্গী মাদাম মিমারেলের আকৃতি মনে মনে কল্পনা করে সীমা। ওঁকে একলা যেতে দিয়ে সাহসী প্রসপার খুড়োর অনেকখানি আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে বুককীপার আরোও বলেন, এ বুরোক্রাটগুলো কিনা ওঁর উপর একটার পর একটা দাবী চড়িয়েই চলেছে। কাল তাদের দুখানা পিউগট, আজ একখানি রেণো গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ওরা কিন্তু সারা দোকানটাই চায়। টেবিলের ওপর একখানি দলিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখো না দশ মিনিট আগে মঁসিয়ে কর্ডেলিয়র আমাকে ঐরকম একটা কাগজের টুকরা পাঠিয়েছিল। অধিকাংশ শরণাগতকে সরাবার একটা উপায় নাকি তিনি বের করেছেন। এখন আমাদের সবগুলি ট্রাক ও গাসোলিন তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। মঁসিয়ে প্লানকার্ডের মতো লোকের কাছে এরকম প্রস্তাব আনতে ওরা সাহস করে। বুড়ো বেলিফ জিন্ন প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ছায়ায় বসে আছে উত্তরের অপেক্ষায়। ওকে ত সহিষ্ণু হতেই হবে। ও হল বেলিফ। এই কাগজের টুকরো এখন কর্তার কাছে নিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। তারপর সীমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, স্যাটালিন আবার এসেছেন বিস্ময়ে সীমার মুখে নির্বোধের ছাপ ফুটে উঠলো।

সে বলে উঠল, এও কি সেই মদের ব্যাপার···? তার কথা শেষ করতে পারল না। মঁসিয়ে পেরোঁ কিন্তু ওর কথা শুনছিলেন না। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সশব্দে চিন্তা ব্যক্ত

করলেন, হয়ত এই চিঠির ফলে মার্কুই-এর সঙ্গে ওর ব্যবসাটা ভালো জমবে। কষ্ট করে উনি জিনিসটা তুলে নিয়ে প্রসপারখুড়োর গোপন অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সীমাও অফিস ছেড়ে বেরুল। সীমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্যালোকে এই করা প্রাঙ্গণটি বিশ্রী ঠেকছিল। গাছের ছায়ার নিচে বেঞ্চের তলায় কারা বসে আছে সীমা দেখার চেষ্টা করে। প্যাকার, জর্জেস ড্রাইভার আর রিচার্ড তিনজনেই বসেছিল। এরা সত্যিই কিন্তু তেমন বুড়ো হয় নি। শুধু লোকের অভাবে ওদের কোনরকমে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। আর বসে আছে বুড়ো বেলিফ, জিন্ন মরিস ওখানে নেই।

এতে তবু সীমার মনে কিঞ্চিৎ স্বস্তি এলো। ঐ অসভ্য লোকটা সর্বদাই কেবল অপরের সমালোচনা করে, অথচ নিজে একটি ভীরু। এদিকে নিরাশও হল একটু। আজ ওর অভব্য উক্তি তার মনে প্রচ্ছন্ন জয়ের আনন্দ এনে দিত।

সহসা অকারণে সীমার মনে এতক্ষণ যে স্ফীতভাব ছিল সেটা কেটে গেল। তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ঐ বেঞ্চিতে তিনজন বসে আছে। ওদের সামনে দিয়ে যদি চলে যায় তাহলে বিশ্রী দেখাবে। ওরা হয়ত মনে করবে ও হয়ত ক উকে খুঁজছে, হয়ত মরিসকেই। লজ্জায় সীমার মুখ লাল হয়ে উঠল। অথচ কিছুই যেন হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে সোজা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে গ্যাসোলিন পাম্পের দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

ঐখানে সীমা দাঁড়িয়েছে। লোকগুলো ওর দিকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত-ভাবে তাকাল। অথচ একটা অনাসক্ত ভাব। অত্যন্ত গরম আর এই উত্তেজনার পর সীমা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। সেই সংগেই যেভাবে বারবার ও ভিলা মনরেপোর নীতি লঙ্ঘন করেছে সে কথা ভেবে

ওর মন শঙ্কায় ভরে উঠল। ও নিজের দায়িত্বে শহরে গিয়েছিল। মাদামের নির্দিষ্ট নিষেধ সত্বেও ও সেই ঘন নীল রং-এর পায়-জামা পরেছে। ডেপুটী প্রিফেক্টরের সঙ্গে হঠকারির মতো তর্ক করেছে। যখন এইসব কথা কানে যাবে তখন মাদামই বা কি বলবেন, আর খুড়োমশাই বা কি বলবেন?

খরিদ্দাররা এসে গ্যাসোলিন নিতে লাগল। সাধারণতঃ যা আসে তার চেয়ে অনেক বেশী। নিশ্চয়ই সংবাদ চালু হয়ে গেছে যে সেতু ও রাস্তা দিয়ে চলাচল করা এখন সম্ভব।

গ্যারাজের বদ্ধ ও বিশ্রী আবহাওয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সীমা দাঁড়াল। সীমার হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মরিস, সে এখনও তাহলে এখানে রয়েছে, থেকে গেছে। সীমা তার প্রতি অবিচার করেছে।

সে এতক্ষণে সবার সঙ্গে এসে জুটেছে। মুখ ভাবটা এমনি করেছে যেন আগে ওকে লক্ষ্যই করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, ও বাবা, মামজেল প্লানকার্ড। একবার কোমরে হাত দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে বললে, মামজেল প্লানকার্ড—সেই মন ভোলানো পায়জামাটি পরে আবার বাহার দিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সবাই-এর সঙ্গে বসে সে হাই তুলে ধূমপান করতে লাগল। সে বললে, এখানে আমরা জার্মানদের জন্যে বসে আছি। আর সীমার দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে বললে, আর ওরা অন্ততঃ জানে কিসের অপেক্ষায় ওরা বসে আছে। এইসব নরনারীরা অন্ততঃ একটা ধারা মেনে চলে আর শেষ পর্যন্ত তাই আঁকড়ে বসে থাকে। প্লাসগ্রামোর শরণাগতেরা হঠতে পারছে না বলে অন্নাভাবে মরছে, আর ওপর তলায় মার্কুই আর আমাদের মালিকের মদের পিপে সরানোর কারবার চলেছে। পৃথিবীতে আগুন লেগেছে কিন্তু ওদের কিছু ভয় নেই, এই আগুনের আঁচেই ওদের কারবারের হাঁড়ি চাপিয়ে বসে আছে।

সীমা পাম্পের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকখানি বিষ মিশ্রিত হলেও মরিসের কথার কিঞ্চিৎ সত্য আছে। ও সব কথাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাড়িয়ে বলে। পৃথিবীতে যদি আগুন না লাগাত, সব কিছুই আগেকার মত শৃঙ্খলামণ্ডিত হয়ে চলত, তা হলে প্রসপারখুড়ো হয়ত খুশি হতেন। মরিসের ভাষায় সেই আগুনের ওপর হয়ত তিনি আর ব্যবসার হাঁড়ি চাপাতেন না। হয়ত মাদাম মিমারেলের সঙ্গে থাকাটাই পছন্দ করতেন। প্রসপার খুড়ো ভালোমানুষ ও ভদ্র। শরণাগতদের নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করতেন। কিন্তু উনি ব্যবসায় বিশ্বাসী, ব্যবসায় অনুরাগী। এই ব্যবসাটি উনি গড়ে তুলেছেন। আর মরিস মনে করে যারা লোকের দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থা গুছিয়ে নেয়, সীমা তাদের দলে। তার এই ধারণা নিষ্ঠুর ও দুষ্ট।

যারা বেঞ্চে বসেছিল তারা সবাই মালিককে নিয়ে পরস্পর ঠাট্টা করতে লাগল। মাদাম মিমারেলকে ওরা আসতে যেতে দেখেছে। তাই মিলিয়ে দুই-আর-দুই-এ চার করছে। ওরা বলছিল, বড় লোকদেরও অবশ্য অনেক সমস্যা। বেচারা মঁসিয়ে প্লানকার্ডকেও মনস্থির করতে হল যে প্রেয়সীর সঙ্গে চলে যাবেন না। এইখানে বসে লাভের কড়ি গুনবেন আর ট্রাকের ওপর নজর রাখবেন। প্যাকার জর্জেস দার্শনিক ভঙ্গীতে বললে, যখন লাম্পট্য ও লোভের মধ্যে বিচার করতে হবে তখন ওরা লোভটাকেই বেছে নেয়। এরপর ওরা স্যাটালিনকে নিয়ে আলোচনা চালায়। ওরা বলতে লাগল, কুকুরের গায়ে যত এঁটুলি ওরও নাকি তত টাকা। দু'চার গাড়ি বোঝাই মদের জন্যে ওঁর ভাবনা কি! কিন্তু আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডে মদের দাম বেশী। আর জার্মানরা সেই দাম দেবে না। তাই ওর মত দাম্ভিক লোকও কাসেল থেকে বেরিয়ে এসে মঁসিয়ে প্লানকার্ডের মত একজন সাধারণ লোকের কাছে ট্রাকের জন্যে গুনগুন করছে। মরিস বলে

উঠল, আমি এক বোতল পার্ণদ আর দশ প্যাকেট গলোই বাজি রেখে বলছি যে, জার্মানরা যখন আসবে তখন এই মাকু´ই তাদের সঙ্গে দিব্যি মাখামাখি করবে।

বৃদ্ধ বেলিফ জিন্ন অনেকদিন কাজ করছে। তার মনিব ডেপুটী প্রিফেক্টের কাছ থেকে একটু সহিষ্ণুতা শিখেছে। সে বললে, মাকু´ই এতখানি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন একথা ভাবাটা একটু বাড়াবাড়ি। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে উনি কিঞ্চিৎ ফ্যাসিবাদী! মরিস ঠাট্টা করে বলে, হুঁ, কিঞ্চিৎ ফ্যাসিবাদী! যেন মেয়েটি কিঞ্চিৎ অন্তঃসত্বা! আবার সে জোর দিয়ে বলে, কি জিন্নো, বাজী ধরবে? বেলিফ বেশ মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে জবাব দেয়, আমি ত আর জুয়াড়ী নই। বুড়ো ড্রাইভার রিচার্ড মরিসের দিকে ফিরে বললে, তুমি যে এখনও এখানে আছ এতেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার মতন যদি অত চুল চিরে বিচার করতে হয় তা হলে ত জার্মান আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম না। মরিসের জবাবের জন্য সীমা অপেক্ষা করতে পারে না। হাই তুলে সে একটু কৃত্রিমভাবে জবাব দেয়, আরে রামঃ! উনিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত লোকের পোশাকের দিকে তাকাবার চাইতেও জার্মানদের আরো অনেক কাজ আছে। আর এই সেণ্ট মার্টিনে আমি সহজেই প্রমাণ করব যে আমি বেসামরিক ভদ্রলোক।

বুড়ো তবু ছাড়ে না। বলে, জার্মানরা অত মূর্খ নয়। ওরা একবার ধরতে পারলে সোজা তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। মরিস বিরক্তি ভরে জবাব দেয়, যত বাজে কথা, ননসেন্স।

সীমার মনে হল, মরিস নিজেও জানে যে সব কথাই গুজব নয় এবং ননসেন্স নয়। আর এখানে পড়ে থাকায় গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে ও কেন পড়ে আছে? হয়ত অত্যন্ত দাম্ভিক

ও গর্বিত বলেই। ওকে যে কেউ ভীরু সন্দেহ করে তা ওর কাম্য নয়। এতটুকু সন্দেহ ওর সহ্য হবে না। ওর সাহস, ওর দম্ভ তাই নানা অজুহাতের ভিতর প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্রস্‌পার খুড়ো ও আর একটি ভদ্রলোক অফিস থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকটি ক্ষুদ্রকায় বটে কিন্তু বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গাত্রচর্ম ম্লান, মাথার চুল কালো, আর টিকোলো নাকের ওপর বাদামী রং-এর কঠিন এক জোড়া চোখ। তাঁর পরনে অশ্বারোহীর পোশাক। যখন প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেল তাঁর ঘোড়ার চাবুকটি পায়ের বুটের ওপর ধীরে ধীরে আঘাত করছেন। সীমা কখনো মার্কুস ডি সেণ্ট বিশ্রন্‌কে কাছ থেকে দেখেনি। সীমা তাঁর দিকে বেশ বিদ্বেষ ও বিশ্লেষক দৃষ্টিতে তাকাল, —কিঞ্চিৎ ফ্যাসিবাদী। সীমার দুঃখ হ'ল এই লোকটির সঙ্গে প্রসপার খুড়ো ব্যবসার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সন্দিগ্ধ কৌতূহলে যারা বেঞ্চের উপর বসেছিল তারা এঁদের দুজনের গতিভঙ্গী অলসভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা যখন খুব কাছে এসে পৌঁছুলেন তখন বেলিফ জিন্ন উঠে দাঁড়ালো। বুড়ো ড্রাইভার রিচার্ডও ধীরে ধীরে উঠল ; মরিস ও প্যাকার জর্জেস কিন্তু বসে রইল। ওরা দুজনে বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওখানে অল্পই ছায়া, প্রস্‌পার খুড়ো ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন। মার্কুই এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যে তাঁর মুখের অর্ধাংশ ছায়ায় পড়েছে। উনি সেই ভাবেই বুটের ওপর চাবুক নিয়ে আছড়াতে লাগলেন।

কর্মচারীবৃন্দ নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সহসা প্রস্‌পার খুড়ো গলা পরিষ্কার করে বললেন, বন্ধুগণ, মার্কুইএর সঙ্গে আমরা একটা চুক্তি করেছি। বেওয়াজ পর্যন্ত তাঁর মাল পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছি। এইসব মূল্যবান জিনিস শত্রুর হাতে পড়া উচিত নয়। এই কাজটি

অত্যন্ত মূল্যবান আর প্লানকার্ড কোম্পানীও চুক্তি পালন করতে ইচ্ছুক। এখন এটা সম্পূর্ণ করার ভার তোমাদের হাতে।

কর্মচারীরা নীরব রইল।

নিজের কানকে সীমা বিশ্বাস করতে পারে না, প্রতিষ্ঠানের পিতৃতুল্য প্রধান হিসাবে বেশ বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে তিনি প্রসঙ্গত কথাগুলি বললেন। সীমা বিশ্বাস করতে পারে না যে খুড়ো সত্য সত্যই শরণাগতের বদলে মদ বয়ে নিয়ে যেতে চান। এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক স্যাটালিনের সামনে কোন কথা না বলতে পারার দুর্বলতার ফলেই উনি এইভাবে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন; আসলে কিন্তু ওর অত ঝোঁক নেই। উনি আশা করেছিলেন যে ওর কর্মচারীরা বলবে, এ কার্য অসম্ভব।

বেলিফ ভিন্ন একজন খাঁটি লোক : সে তাড়াতাড়ি বললে, মঁসিয়ে লেস্‌ঢ্যাস্‌ প্রিফেক্টের কাছ থেকে আপনার জন্যে একটা চিঠি এনেছি মঁসিয়ে প্লানকার্ড; মঁসিয়ে পেরু কি আপনাকে সে চিঠি দেয়নি? মঁসিয়ে লেস্‌ঢ্যাস্‌ প্রিফেক্ট আপনার জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন।

কেউ একটি কথাও বলল না। তারপর কারো মুখের পানে না তাকিয়ে স্যাটালিন বললেন, আমি মোটা টাকা দোব যদি জিনিসগুলি নিরাপদে বেওয়ানে পৌঁছায়। আমি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দোব। প্রস্‌পার খুড়ো সেই সঙ্গে যোগ করেন, এটা বোঝা উচিত যে মঁসিয়ে লে মার্কুই ফরাসী সম্পত্তি যাতে জর্মানদের হাতে না পড়ে তার জন্যে উৎকন্ঠিত। কিন্তু মার্কুই গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, অত কথা বলার দরকার নেই প্লানকার্ড। আমার উদ্দেশ্য কি তা আমিই বুঝি।

পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে সীমা ঢোক গেলে, কপালের ঘাম মোছে। প্রসপার খুড়োর এতখানি বলা উচিত হয় নি। মার্কুই-এর হয়ে এতখানি টানার দরকার ছিল না।

মরিস কড়া গলায় বেশ ধীরে ধীরে এই বিষয়ে কথা বলে, আমার বিশ্বাস মাল পৌছান সহজ হবে না। জার্মানরা যদি আমাদের কাছ থেকে মাল কেড়ে নেয় তাহলে আমরা কি করতে পারি? পথের উপর প্রমাণ করা শক্ত যে আমরা অসামরিক লোক। এখানে অবশ্য তা করা সহজ। এখানে মঁসিয়ে প্লানকার্ড আপনিই আমাদের হয়ে বলতে পারবেন। মরিস বেশ ওজন করে এবং বিচার করে যেন তার এই সুচিন্তিত যুক্তিগুলি বলল। কিন্তু সে বেশ সাহসভরে প্রসপার খুড়োর চোগের দিকে চেয়ে রইল।

মার্কুই তখনও অন্যদিকে তাকিয়ে বুটের ওপর ঘোড়ার চাবুক আছড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ একটু সাহসের দরকার। কথাগুলো কোমলভাবে হলেও তার ভিতর যথেষ্ট ঔদ্ধত্য ছিল।

মরিসও সেইরকম নরম গলায় শান্তভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ, একটু সাহসের দরকার। এইসব শরণাগতেরা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। ওরা কেবল নিজেদের কথাই ভাবে। মনে করে ওদের সরাবার জন্যেই বুঝি গাড়িগুলোর সৃষ্টি। ফরাসী সম্পত্তির উপর তাদের কোন শ্রদ্ধাই নেই। এমনও হতে পারে যে গাড়ি থেকে পিপেগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে ওরা রাস্তায় চড়ে বসবে।

সকলে নীরব।

শুধু বুটের ওপর ঘোড়ার চাবুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সীমা পাম্পের ধারে দাঁড়িয়ে; উদ্দাম আবেগে তার হৃদয় পরিপূর্ণ। তার অন্তর বলতে লাগল, তুমি শুধু মরিসকে একলাই কথা বলতে ছেড়ে দিও না। তুমি যেন ওদের কেউ নও, অন্য দলের, এভাবে কাজ করো না। কিছু বলো। যা সত্য তা প্রমাণ কর। সীমা ঢোক গিলল, তারপর এই অপ্রীতিকর স্তব্ধতা ভেঙ্গে খুব জোরে নয় অথচ সাহসভরে এই ভ্যাপসা গরমের ভেতর বললে, শরণাগতরা আর কি করতে পারে?

সকলে পাম্পের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কৃশাঙ্গী দীর্ঘদেহা সীমা ঘন সবুজের পায়জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ঘর্মাক্ত ও লাল। ওর বঙ্কিম ঠোঁট দুটি চেপে ধরে বেশ চিন্তাকুল চিত্তে অথচ কঠিনভাবে সীমা শূন্যপানে তাকিয়ে রইল।

বেঞ্চের উপর থেকে মরিসের গলায় স্পষ্ট সবিস্ময় ধ্বনি ফুটে উঠল, এ্যাঁ?

মার্কুই সহসা তীক্ষ্ণ ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন চলে, এসো প্লানকার্ড। তুমি আমার লোকজনদের ভাল শিক্ষা দাও নি। হতাশা ও রাগে প্রসপার খুড়ো সীমা থেকে আরম্ভ করে সকলের দিকে তাকালেন, তারপর পুনরায় সীমার মুখের দিকে তাকালেন। অনুরোধ জানাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনিও ভেবেচিন্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যাটালিনের সঙ্গ নিলেন। বাড়ির দিকে যেতে যেতে স্যাটালিন শুধু বললেন, এদেশে যা কিছু ঘটুক না কেন ডিসিপ্লিন বা নিয়মনিষ্ঠা একদিন না একদিন ফিরে আসবে।

ওরা অফিসঘরের দিকে মিলিয়ে যাবার পর বুড়ো রিচার্ড ড্রাইভার কেশে গলা পরিষ্কার করে থুথু ফেলে মরিসকে বলল, এখন আমাদের চলে যাওয়া উচিত। স্যাটালিনের সঙ্গে চালাকী নয়।

মরিস গজগজ করতে বলে, "কি বুড়ো, আমি ঠিক বলি নি? আমি যদি ওর মদ বয়ে নিয়ে যাই তাহলে শরণাগতরা আমার মাথাটি উড়িয়ে দেবে। এমন কি ঐ সবুজ পায়জামাপরা আধপোড়া ফচকে মেয়েও তা বুঝেছে। সুতরাং ঐ হতভাগা ফ্যাসিস্তও বুঝুক।

বৃদ্ধ পুনরায় বললে, আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে সরে পড়া উচিত।

ওর এই অভব্য উক্তি সত্ত্বেও সীমা মনে মনে গর্ব অনুভব করে। মরিস বেশ ভালোভাবেই বোঝে যে এই বিবরনের কথা বলতে ওর কতখানি সাহসের প্রয়োজন হয়েছে।

তিন

রাঁধুনীর ত্রুটি

সন্ধ্যায় খাবার ঘর যথারীতি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, খাবার টেবিল সেইরকম জাঁকজমকের সঙ্গে সাজানো। এখনও আগেকার প্রথা অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা করা প্রসপার খুড়োর কাছে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার ; স্নায়ু যখন ক্লান্তি ও অবসাদে অবসন্ন তখন পারিবারিক জীবন চিরদিনের মত শান্ত মসৃণ গতিতে চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

খুড়ো যখন গাজর বা সার্ডিং খাচ্ছেন সীমার দৃষ্টি তখন তাঁকে অনুসরণ করছে। তার আজকের এই নির্লজ্জ ব্যবহার সম্পর্কে খুড়ো কিছু বলবেন সে তাই শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। খুড়ো কিন্তু মার্কুয়ের আগমন বা কর্তৃপক্ষের জরুরী দাবী সম্পর্কে একটিও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে না। বরং তিনি তুচ্ছ ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক কথা বলে সময় কাটিয়েন দিলেন। খুড়োর আহারের দিক থেকে দৃষ্টি সরালো না সীমা, পরবর্তী পদ যাতে তাড়াতাড়ি এনে দিতে পারে তাই সতর্ক থাকে। তার মনে কিন্তু আজকের মধ্যাহ্নের ঘটনাবলী আলোকিত হতে লাগল। বোঝাই দেওয়ার উঠানে দাঁড়িয়ে ওর পক্ষে অমন স্পষ্ট করে কথা বলা নির্বোধের কাজ হয়েছে। স্যাটালিন বা খুড়োর মুখের ওপর ওভাবে কথা বলে ওর কি লাভ হয়েছে? মাদামের কথাই ঠিক, ও উদ্ধত, অবাধ্য ও অভব্য।

তবে মরিস কিন্তু আজ বুঝেছে যে ও কোথায় আজ দাঁড়িয়েছে। সে বুঝেছে যে ও আর সবায়ের দলে নয়। আর শুধু ঢং দেখিয়ে বেড়ায় না। শেষ-মেষ ও তবু কিছু একটা করেছে।

প্রসপার খুড়ো স্ত্যাটালিনের কথা প্রতিধ্বনি করে চলেছেন একথা ভাবতেও মনে ব্যথা লাগে। যেভাবে তিনি তাকে অনুসরণ করলেন তা দেখলে মনে কষ্ট হয়। ওঁর যে এতখানি দাস মনোবৃত্তি হতে পারে তা সীমা কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। উনি সীমার বাবার ভাই। তাঁর সতাত ভাই। সেইরকম লালচে চুল, সুগঠিত পুরু ঠোঁট তারও ছিল। এমন কি, সবাই বলে, গলার স্বরও নাকি তাঁরই মত। কিন্তু পীয়্যার প্লানকার্ড দেশকে সাধারণের প্রতি ন্যায় বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। আর প্রসপার প্লানকার্ড তাঁর কর্মচারীদের বলেছেন স্ত্যাটালিনের মদ বয়ে নিয়ে যেতে। প্রাঙ্গণে ওভাবে ওদের কথা না শোনাই ওঁর উচিত ছিল। প্রসপার খুড়োকে সমর্থন করার চেষ্টা করলেই হত। তিনি দয়ালু অনেক ভালো কাজ তিনি করেছেন। ওর ওপরও তিনি অনেক সদয় ব্যবহার করেছেন। তিনি তার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত বিচার করেন না। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে তিনি কঠিন সংগ্রামের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। যে বিরাট ব্যবসা তিনি ফেঁদেছিলেন তা সহসা সংকটের মুখে, তিনি তা আগলে রেখেছেন। মঁসিয়ে এমিয়ট বা ল্যা রোসের মত পালিয়ে যান নি।

এই প্রীতির মনোভাব কিন্তু অক্ষুণ্ণ রইল না। খুড়োর সঙ্গে প্রাঙ্গণে স্ত্যাটালিনের বেড়াতে দেখে তার এই মনোভাব কেটে গেল।

তার অভব্য ব্যবহার সম্পর্কে খুড়ো মাদামকে কি বলেন তাই শোনার অপেক্ষায় ছিল সীমা। কিন্তু তিনি কিছুই না বলাতে সেই মর্মপীড়া অনুভব করতে লাগল। খুড়ো কি তাকে বোঝবার চেষ্টা করছেন? তিনি কি বুঝেছেন যে বাপের উপযুক্ত মেয়ে হিসাবে সে অন্য কিছুই করতে পারত না?

তার ভঙ্গীমায় কিন্তু এই বৈপ্লবিক মনোভঙ্গী ফুটে উঠে নি। সে মাদামের খাবার দিয়েছে, খুড়োর খাবার দিয়েছে, নিজেও অল্প কিছু

খেল। তারপর ডিসগুলি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী পদ, সব্জী মিশ্রিত রোস্ট দিয়ে এল।

সে যখন পরিবেশন করছিল তখন খুড়ো পুনরায় যারা সব সেণ্ট মার্টিন থেকে পালিয়েছে তাদের কথা বলছিলেন। তিনি বললেন গতকাল এই ধরনের পলায়ন তিনি অনুমোদন করেন নি। আজ তিনি স্বীকার করলেন যারা পালিয়েছে তাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। বিশ্বস্তসূত্রেই জানা গেছে যে সাত ও সাতাত্তর নম্বর রাস্তা এখন প্রায় জনহীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বললেন, তিনি যদি এখন তার কতকগুলি ট্রাক দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেন তবে তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। তার ওপর চারদিকে শোনা যাচ্ছে যে জার্মানরা অধিকৃত শহরে তাদের দাবী জোরালো করবার জন্যে অনেককে ধরে রাখছে। তা যদি এখানে হয় তা হলে তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে এবং খ্যাতনামা দেশ-প্রেমিক বলে তাঁরও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

সীমা খাওয়া থামিয়ে ওঁর মুখের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল। উনি বসে আছেন, ব্যঞ্জনামণ্ডিত পুরুষালি মুখ। ওঁর সুরেলা গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন, উনিও চলে যেতে চান। শরণাগতদের সমস্যা ডেপুটি প্রিফেক্টারের দাবী তিনি এড়িয়ে যেতে চান। জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দায় থেকে তিনি সরে যেতে চান।

তিনি বলছিলেন, আমি অবশ্য বলছি না যে আমি মরে যেতে চাই। বরং যদি তা করি তা হলে তা ভয় পেয়ে করব না। করব ব্যবসার মুখ চেয়ে, অনেক ভেবে চিন্তেই আমাকে সে কাজ করতে হবে। এক হিসাবে দেখতে গেলে আমার কি কর্তব্য নয় ট্রাকগুলি ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিকে রক্ষা করা? কেমন মা, তোমারও কি তাই মনে হয় না? এই বলে তিনি কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাংস ও সব্জীর ওপর

ঝোল ঢাললেন। মাদাম বসে আছেন প্রকাণ্ড তাঁর শরীর। এতক্ষণ তিনি খুব কম কথাই কয়েছেন। আজ তিনি অন্যদিনের চাইতে একটু গম্ভীর। এখন তিনি বললেন, যদি তুমি করতে, যদি, যদি···আমার মনে হয় এখন যে সময়ের ভেতর আমরা দিন কাটাচ্ছি তার মধ্যে এই সব বাজে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার অবসর নেই। তারপর একটু হেসে বললেন, সংকটকালে অবশ্য কথাটা ঠিকই তবে আমার মনে হয় আমার এই বয়স সত্ত্বেও আমি একাই জার্মানদের সঙ্গে যুঝতে পারব। সেণ্ট মার্টিনে যে তোমার মত একজন লোক আছে যে জার্মান ও জন-সাধারণকে দেখাতে পারে যে বিপদের সময় কিভাবে কাজ করা উচিত, এ একটা বড় কথা। তিনি বসে আছেন তাঁর জোড়া চিবুক বুকে এসে ঠেকছে, সুদৃঢ় ও গম্ভীর মুখ, মাদাম সোজা হয়ে বসে আছেন এবং অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

কি রকম কৌশলে প্রশংসার ছলে মাদাম খুড়োকে তিরস্কার করলেন সীমা মনে মনে তার তারিফ করল। খুড়োও জোর করে একটু হাসলেন। তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ মা, এ এক অলস চিন্তা। মার দিকে মাথা নুইয়ে তিনি শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর পুনরায় আনন্দ সহকারে অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষরা যে ঘোড়ার সাজ প্রত্যাখান করেছিলেন মঁসিয়ে বিলের দোকানে সেটি এখনও সাজানো আছে। এই রকমই সব আজে বাজে কথা তিনি বলতে লাগলেন আর খেতে লাগলেন। মাদামের তিরস্কার যে রকম আত্মসংযমের সঙ্গে তিনি হজম করলেন সীমা তা দেখে খুশি হল।

সহসা তিনি প্লেটটি সরিয়ে রাখলেন। চীৎকার করে বললেন, আমি একশবার বলেছি ক্রীম গ্রেভিতে নাটমেগ (জায়ফল) দেবে না! ছিঃ ছিঃ ক্রীম গ্রেভিতে নাটমেগ! সমস্ত দিনের খাটুনির পর এই আমাকে

খেতে হবে। কারুর কী আমার জন্য এতটুকু বিবেচনা নেই। এ আমি খাব না। এ অতি বিশ্রী।

সীমা তার মুখের দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইল। একথা সত্যি একবার তিনি বলেছিলেন ক্রীম গ্রেভিতে খুব বেশী নাটমেগ তিনি পছন্দ করেন না। ভিলা মনরেপোয় কিন্তু এই ভাবে ক্রীম গেভিতে কিছু নাটমেগ দেওয়া নিয়ম। ঠিক যেটুকু দরকার ও সেইটুকু দিয়েছে। আগে আগেও ও সেই রকম দিয়েছে এবং তিনি সেই রকম গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া মাদাম নিজেও গ্রেভির স্বাদ গ্রহণ করেছেন।

ইতিমধ্যে রাগ আরো বেড়ে চলল। "আমাকে জব্দ করার জন্যে এই সব করা হয়েছে। যত সব পাজী বদমাইস। বাড়িতে রেখে মেয়ের মত মানুষ করার এই ফল। প্রতিদানে তুমি শুধু আমার কর্মচারীদের ক্ষেপিয়ে ক্ষান্ত নও আবার খাবারও নষ্ট করে দিচ্ছ।"

মঁসিয়ে প্লানকার্ড যখন উষ্মা প্রকাশ করছেন সীমা তখন মাথা নীচু করে আছে। সীমা যে ভয় পেয়ে তার দিকে তাকাতে পারছে না তা নয়, সে এই ভাবে তাঁর মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করে হঠাৎ খুড়োর কি হল। তার ব্যবহারে সীমা একটু লজ্জিত হল। বোঝা যাচ্ছে যে আজ প্রাঙ্গণে সীমার ব্যবহারে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন তাই তিনি এখন তাকে যা নয় তাই বলে চলেছেন। সীমা মাদামের দিকে তাকাল। মাদাম ত ক্রীম গেভির ব্যাপার সব জানেন, তিনি কি তাকে সমর্থন করবেন না।

মাদাম কিন্তু মঁসিয়ে প্লানকার্ড রাগ করতেই মুখ তুললেন। একবার সীমা ও একবার খুড়োর মুখের দিকে তিনি তাকালেন। যে সময়ে তিনি তাঁর রাগের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করলেন, "পরিণামে তুমি শুধু আমার কর্মচারীদের ক্ষেপিয়ে তুলছ।" সীমার মনে হল মাদামের কঠিন চোখে সে যেন পুঞ্জীভূত ঘৃণা লক্ষ্য করল। না হয়ত তার ভুল

হয়েছে। হয়ত এ শুধু তার নিছক কল্পনা। মাদাম শান্ত হয়ে বসে আছেন।

খুড়োর বলা শেষ হয়েছে; তিনি তখনও সীমার দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছেন ও জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। মাদাম কি বলেন সীমা তাই শোনার অপেক্ষায় ছিল। তিনি কি তাকে সাহায্য করবেন? তিনি কি তাঁর ছেলেকে বকবেন? অবশেষে মাদাম মুখ খুললেন, বললেন, সীমা আমার সিগারেট আর দেশলাই দাও, কণ্ঠস্বরে এতটুকু আবেগ নেই। সীমা সিগারেট ও দেশলাই দেবার পর মাদাম শান্ত গলায় বললেন টেবিল পরিষ্কার কর।

বিনা বাক্যব্যয়ে সীমা টেবিল পরিষ্কার করল। রান্নাঘরে গিয়ে ছোটখাটো কাজ করতে লাগল। এদিকে বাইরের ঘরে খুড়ো চুপি চুপি কথা কইছেন শোনা গেল। সম্ভবত সীমার সম্বন্ধেই মাদামকে কিছু বলছেন। সীমা বোঝে যা ঘটেছে সে কথা তিনি নিশ্চয়ই সদয়ভাবে মাদামকে বলছেন না। তিনি হয়ত আসল কথার একটা অংশ মাত্র বলবেন। সীমা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে ভালো হত। সীমার এখনো বিশ্বাস ওঁকে হয়ত সে বোঝাতে পারবে, তিনি ওর বাবার ভাই কিন্তু মাদামের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। মাদাম কোন দিনই তাঁর সতিন পো পীয়্যারকে ভালো চোখে দেখেন নি। এখন যখন মাদাম পর্যন্ত এ কথা শুনলেন তখন প্রসপার খুড়োর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা বৃথা।

সীমা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার সামনে এখনো বিশ্রী পনেরো মিনিট সময় পড়ে রয়েছে। সম্ভবত তার খারাপ দিন ত আসন্ন কিন্তু তবু তার ভয় নেই। সে জানে যে সে ঠিক কাজই করেছে।

সে যখন ফিরল মাদাম তখন টেবিল থেকে সরে গিয়ে সেই বড় চেয়ারটিতে বসেছেন। 'ডেসার্ট' খাবার পূর্বে তিনি কদাচিৎ

নড়েন না। এবার কিন্তু তা করেছেন, সেই বিরাট দেহ নিয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। তিনি তাঁর চশমাটি তুলে নিয়ে সীমার মুখের দিকে তাকালেন। মাদামের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। সীমার অন্তরভেদ করে সে দৃষ্টি ভিতরে যেতে চায়, সীমা কিন্তু অচল, অটল। মাদাম তার চশমাটি নাবিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন আর তৎক্ষণাৎ সীমা বুঝল কিছুক্ষণ আগে তার চোখে যে ঘৃণার দৃষ্টি দেখছিল, তাতে তার ভুল হয় নি। মাদাম কোমল অথচ ধীর কর্কশ গলায় বললেন, তা হলে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল। তোমার অবাধ্যতা দূর করার জন্যে যতদূর করা সম্ভব, আমি বুড়ো মানুষ, তা করেছি। তোমাকে সৎপথে চলার সুযোগ দিয়েছি, এখন দেখছি সবই বৃথা। লোডিং ইয়ার্ডে যেই নিয়মানুবর্তিতা ভেঙ্গেছে—আমাদের দোষে অবশ্য নয়, অমনি তুমি তোমার অবাধ্যতা দেখিয়েছ, যে খুড়ো তোমার জন্যে এত করেছে তাঁকে তাঁরই কর্মচারীর সামনে অপমান করেছ। তুমি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পিছন দিক থেকে ছুরি মেরেছ। আর কখন? যখন সকল ভদ্রলোকের এইসব ছোটলোকের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়ানোর দরকার ঠিক সেই সময়।

তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। সীমা সেই ভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। মাদামের কথায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি বলে যান, এ ত' আর সীমাকে গালাগাল দেওয়া নয়, মাদাম অভদ্রের মত গলায় যা বলছেন তা তার বাবা পীয়্যর প্ল্যান-কার্ড ও তার ঠাকুর্দার ওপর লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। সীমা জানত এই কয়েক বছরের পুঞ্জীভূত বিষ ঢালবার একটা অবসর তিনি পেয়েছেন।

মাদাম বলে চলেছেন সময় যদি এত খারাপ না হত তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে অন্য কোথায় বিপদের মুখে পড়তে হত। আমি আমার ছেলেকে বলতুম আজই তোমাকে দূর করে দিতে, কালকের জন্যে অপেক্ষা করতুম

না। আমি ওকে বলতুম কোথায় কিছু টাকা কড়ি দিয়ে তোমায় পাঠিয়ে দিতে। সেই হলেই আমরা সব দিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। শান্তির সময় আমি তোমার মত অকৃতজ্ঞ মেয়ের মুখ দেখতেও আমার ছেলেকে বারণ করতুম। কিন্তু এখন যা সময় পড়েছে তোমার মত মেয়েকে আমাদের এ বাড়িতে সহ্য করতেই হবে। তবে এই শেষ, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি আগাগোড়া বেয়াড়া ও বদমাইস, তোমার শরীরে খারাপ রক্ত, তোমার বাবাকেও আমরা জানতাম। তাকে আমরা সাবধান করে দিয়েছিলুম, কিন্তু আমাদের সে কথায় তিনি কান দেন নি। এখন সে আর এ জগতে নেই।

সীমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর মুখখানি বদ্ধ, ওকে বেশ নম্র দেখাচ্ছে, কিন্তু তেমন বাধ্য নয়।

মাদাম বেশ কোমল অথচ কঠোর কণ্ঠে বললেন, এখন আর ও আমাদের চোখের দিকে চাইবে না। সীমা যদিও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল তবু মাদামের মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। এখন সে একটু মাথা উঁচু করে সোজাভাবে দাঁড়াল।

প্রসপার খুড়ো তাঁর স্বাভাবিক দ্রুত ভঙ্গীতে পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি সেই রকম রাগতঃ স্বরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ মা। ও যখন পাম্পের কাছে দাড়িয়ে লোকগুলিকে ক্ষ্যাপাচ্ছিল তখন ওর বাপের কথা আমারও মনে হল। তিনও ছেলেবেলা থেকে ঐ রকমই ছিলেন। কে তাঁকে কংগোয় গিয়ে নিগ্রোদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপাতে বলেছিল? কিন্তু সেই ছিল তার স্বভাব। যত সব ছোটলোককে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সীমাহীন লোভের আগুন না জ্বালিয়ে সে থাকতে পারত না! সে নিজের বাসা নষ্ট করে দিয়েছিল। কেন না সেখানে তার জায়গা ছিল না। সেণ্ট মার্টিনে কোথাও তার যাবার জায়গা ছিল না বলেই সে কংগোতে গিয়েছিল।

এই উত্তেজিত লোকটি যখন এদিক ওদিক পায়চারী করছিল তখন সীমা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার দীর্ঘায়ত কালো চোখে সংশয়ের ছাপ এই স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা, নির্বুদ্ধিতা ও ঘৃণার অভিব্যক্তিতে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এই রকম বিশ্রী জঘন্য কথা উচ্চারিত করতে গিয়ে খুড়ো লজ্জিত হচ্ছেন না? আশ্চর্য!

সহসা প্রসপার খুড়ো রেগে ফেটে পড়লেন, "আমার দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থেক না।" তিনি তার দিকে এগিয়ে এলেন তাঁর লোমশ মাংসল হাত দিয়ে সীমার কাঁধ দুটি ঝাঁকানি দিতে লাগলেন। সীমার লাগল। তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "আমার ভাইঝি আমার মুখের উপর বলছেন 'পলাতকরা' তা হলে কি করবে? আমার গাড়ি চুরি করে নেবে কেড়ে নেবে। তোমার ও তোমার বাবার পক্ষে সেই-টেইসঙ্গত। তোমরা চাও অরাজকতা, তাহলেই তোমরা জনপ্রিয় ও বড় হতে পারবে।" সীমার মাথার খুব কাছে গিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। তাঁর নিঃশ্বসে মদের ও খাদ্যের গন্ধ। তাঁর পুরুষালি চেহারাটা যেন দুমড়ে মুচড়ে ব্যঙ্গচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে; তার কপিশ চক্ষে একটা পাশবিক দৃষ্টি। সহসা সীমার মনে হল যে ওঁর এই আশ্চর্যজনক পুরু কান বিস্ময়ের বস্তু নয়!

খুড়ো তখনও রেগে বলছেন, গলার স্বর কিঞ্চিৎ নরম করে বলেন: "আমি তোমার ওপর অনেক সদয় ব্যবহার করেছি, আমার উচিত ছিল তোমাকে মেরে কালা করে দিয়ে এই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের জন্য একেবারে ক্ষিদে তেষ্টা বন্ধ করে দি।"

তিনি ওকে ছেড়ে দিলেন। আবার পায়চারি করতে লাগলেন। সীমা তেমনই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভয়ঙ্কর লোকটির জন্য সে লজ্জিত, সে সত্যিই দুঃখিত।

মাদাম বললেন, "প্রসপার তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না বাবা।"

প্রসপার খুড়ো রাগে ফুলতে ফুলতে গিয়ে টেবিলে বসলেন। মাদাম বললেন, "তুমি কিছু খাও বাবা, একেবারে কিছুই খাও নি।" একটু ইতস্তত করে যেন খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাংসিয়ে প্লানকাড খানিকটা চীজ মুখের ভিতর পুরে দিলেন সেই সঙ্গে একটু মদও গলায় ঢেলে দিলেন, তারপর যান্ত্রিক গতিতে আহার করতে লাগলেন।

চার

বৈমানিক

পরদিন অপরাহ্ণে প্রায় অভ্যাসের বশেই সীমা পুনরায় সহরে গেল; এবারও বাইসিকল সংগে নিয়েছিল। পুনরায় বাজারের ঝুড়ি হাতে নিয়েছিল, আর তার পরনে ছিল সেই ঢিলা পায়জামা।

পথ এখন আর তেমন জনবহুল নয়; অধিকাংশ পথচারী হল সৈনিক। সীমা সোজা লোডিং ইয়ার্ডে চলে গেল। পথ খানিকটা পাহাড়ের চড়াই। সীমাকে বাইসিকেলটা ঠেলে নিয়ে যেতে হল। আর গরমও তেমনি। যাই হোক ও তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। যেন ওর সময় বাঁধা আছে।

গতদিনের উত্তেজনার পর সে ভালোভাবেই ঘুমিয়েছে। কিন্তু সকালে পূর্বদিনের কথা স্মরণ হওয়াতে সে প্রসপার খুড়ো ও মাদামের সামনে ভীত ও উদ্ধতভাবেই বেড়িয়েছে। কিন্তু প্রসপার খুড়ো ব্রেকফাস্টে বসে যখন এমন ভাব দেখালেন যে কিছুই যেন হয়নি তখন ও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল। তিনি বেশ মিত্রভাবাপন্ন, অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগলেন এবং যথানিয়মে অফিসে বেরিয়ে গেলেন। মাদামও আশ্চর্য রকম শান্ত ও নম্র। গত রজনীর উদ্দাম অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্নমাত্র নেই।

লোডিং ইয়ার্ডের দিকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে সীমা বোধহয় দশবার এই কথাটা ভাবল। সে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল না তো, সে স্বকর্ণে শুনেছে প্রসপার খুড়ো তার বাবাকেও অবাস্তর [illegible] গালাগাল করেছেন। সে দেখেছে মাদামের চোখে

অনিয়ন্ত্রিত ঘৃণার আগুন; প্রসপার খুড়োর কঠোর পেষণে তার কাঁধে এখনো কালসিটে পড়ে আছে। ওরা দুজনেই আবিষ্কার করেছেন যে ও পীয়্যর প্ল্যানকার্ডের মেয়ে। ওরা কি ভেবেছেন যে বিগত রজনীর ঘটনার পর সে কি করে পূর্বের মত ওদের সঙ্গে দিন কাটাতে পারে।

সীমা এসে পৌছল। লোডিং ইয়ার্ডের সামনের ছোট্ট কাচের ঘরটি শূন্য দেখে বিস্ময় লাগে। সেখানকার চেয়ার ও ডেস্কের মত বুড়ো আর্সেন স্থাণুর ন্যায় অচল পদার্থ।

লোডিং ইয়ার্ডে প্রচণ্ড রৌদ্র। পুরাতন ড্রাইভার, মরিস, রিচার্ড, প্যাকার জর্জেস সবাই মিলে বেঞ্চে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। মরিস যথারীতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "গুড আফটার্ নুন্, মামজেল।"

সীমা তার বাইসিকেলটা চেয়ারের গায়ে হেলিয়ে রেখে পাম্পের দিকে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ রিচার্ড বলল, "আমরা আজকাল আর পেট্রল বিক্রী করছি না। কর্তা সমস্ত চাবি দিয়ে দিয়েছেন। হয়ত আমরা পেট্রল পাম্প জন্মের মত বন্ধ করে দিলুম। কিংবা যতক্ষণ ডেপুটি প্রিফেক্টর এখানে থাকবেন ততক্ষণের জন্য।"

মরিস মন্তব্য করল: "ফ্রান্সের ধীরে ধীরে মৃত্যু হচ্ছে। মঁসিয়ে কর্ডেলিয়্যর রূপে সরকার গাড়ি ও কর্তার পেট্রল আদায়ের চেষ্টা ছাড়েনি। এমন কি ডেপুটি প্রিফেক্টরেরও আর তত গাড়ি নেই। কিন্তু তাতে মঁসিয়ে লেস্‌স্যাস প্রিফেক্ট সফলকাম হননি। বৃদ্ধ নিনোর মোটার সাইকেলে সবেগে মঁসিয়ে লেস্‌স্যাস প্রিফেক্ট এসে হাজির। বেলিফের পেছু ধরে মোটার সাইকেলের পিছন দিকে বসে বৃদ্ধ পিতৃভূমির গৌরব বীরদর্পে বলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ প্যাকার জর্জেস বলল, "ও রকম মুখ্যুর মত চেঁচিও না।"

মরিস জবাব দিল, "আমি তোমার মত নোংরা বুড়োর সঙ্গে কথা বলিনি। আমি কথা বলছি মামজেলের সঙ্গে।"

পাম্পে চাবি দেওয়া, তাই লোডিং ইয়ার্ডে সীমার কোন কাজ নেই। সে চলেও যেতে পারে। কিন্তু সে ইতস্ততঃ করতে লাগল, অবশেষে কিঞ্চিৎ সংশয়ান্বিতচিত্তে ছায়াঘেরা বেঞ্চের তলায় এগিয়ে গেল। সে জানে সে যা করতে যাচ্ছে সেটিও একটি অবাধ্যতার ভান। বিদ্রোহ ও বিপদের সময় সে কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে; প্লানকার্ড পরিবারও তার মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তুলছে। ম্যাদামের চূড়ান্ত হুসিয়ারী সে উপেক্ষা করছে।

যদিও বেঞ্চে অনেক জায়গা ছিল তিনজনে সসম্ভ্রমে সরে বসল। মরিস গজগজ করতে লাগল। সীমা তাদের সঙ্গেই বসল।

সীমা প্রত্যাশা করেছিল ওরা কালকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে। মনে মনে তাই তার ভয় ছিল। কিন্তু কাল সে যা করেছে কথার ভাবে তা সে নষ্ট করতে চায় না। কিন্তু যখন তিনজনের কেউই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করল না তখন সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করল।

রিচার্ড বলল, "সে ক্যাফে ডি ন্যাপোলিয়ঁতে বেতার মারফৎ শুনেছে তুয়োর শহর তখনও লড়ছে। প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রাণপণে লড়ছে।" সীমার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতেই ত প্রমাণিত হচ্ছে আমরা যুঝতে পারব। মেয়রের সৈন্যশ্রেণী যুঝতে পারবে। কিন্তু মরিস বলল, "ছোটরা এই রকম সাহস দেখিয়ে কি করবে, বড়রা যদি লড়তে না চায়?"

তারপর সে অঙ্গভঙ্গী করে তুয়োরকে যেন মুছে দিলে।

এইবার ও ডেপুটি প্রিফেক্টের আগমন সম্বন্ধে বলতে লাগল। শরণাগতদের চলাচল সম্পর্কে কোন কথা আর এই আলোচনার বিষয় রইল না। মাথামোটা বুড়ো আরো দুটি গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আর শরণা-

গতদের একটা বড় দল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং ওরা হয়ত অন্য কিছুর সম্পর্কে বলছে। বেলিফ জিনো যে এ সময়ে এখানে নেই এ অতি দুঃখের কথা। সে জানে কি হচ্ছে। কিন্তু আজ যেন সেও কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করছে। সে আজ আর ওদের সঙ্গে বসেনি। অফিসের ভিতর চলে গেছে। যাই হোক সে তার বন্ধু প্যাকার জর্জেসকে কিছু ইঙ্গিত জানিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে হুকুম এসেছে যে জার্মান অধিকার যখন আর রোধ করা যাবে না তখন সমস্ত যানবাহনের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে সে সব জিনিস শত্রুর হাতে আর না পড়ে। বে-সামরিক কর্তৃপক্ষদের এ সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর সহায়তা করতে বলা হয়েছে। ডেপুটি প্রিফেক্টকে এই রকম অস্বস্তিকর-ভাবে এতটা দৌড়ে আসতে হয়েছে কর্তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বিশ্রীভাবে এবং একটু একটু করে প্যাকার জর্জেস্ এই সব কথা বিবৃত করেছে।

মরিস মন্তব্য করল, "আমি কর্তার জন্য চিন্তিত নই। আমি দশ প্যাকেট গলোইজ ও এক কোয়ার্ট আপেল বাজী রেখে বলছি। কর্তার জিনিস নিরাপদে থাকবে। জার্মানদের সঙ্গে আলোচনা করবার সময় যতকাল না হবে ততকাল এই ভাবেই ডেপুটি প্রিফেক্টের সঙ্গে কথা চলবে।"

সীমা চীৎকার করে উঠল, "না তা নয়।"

মরিস তার পানে বিদ্রূপ ভরে তাকিয়ে বলল, "কি মামজেল, আমার বাজীটা ধরা হবে?"

সীমা উত্তর দেবার পূর্বেই গ্যারেজের চাবি দেওয়ার দরজার ঘণ্টা দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজতে লাগল। সীমা দৌড়ে গিয়ে গর্তে চোখ দিয়ে দেখল। বাহিরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন ব্রিটিশ উর্দি-পরা বৈমানিক। সীমার পক্ষে তাঁর কথা বলা শক্ত বলে মনে হল। কারণ তিনি অদ্ভুত ভঙ্গীতে ফরাসী ভাষা উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু সীমা

তাঁর কথা বুঝল। লোকটি বড় নাছোড়বান্দা। চলে যাবার জন্যে তাকে একটা উপায় করতে হবে। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাকে পালাতে হবে, এবং তিনি শুনেছেন এক মাত্র প্লানকার্ড ট্রানস্পোর্ট কোম্পানী তাকে সাহায্য করতে পারে। সীমা তাকে আসতে লিখল।

অন্ধকার গ্যারেজ পার হয়ে তিনি এসে আলোকিত উঠানে দাঁড়ালেন। তিনি চোখ কুঁচকালেন। চলবার সময় তিনি একটু খুঁড়িয়ে চলছিলেন। লোকটাকে বিশ্রী দেখাচ্ছিল! মুখে তার বেয়াড়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর তিনটি প্রাণী নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল। সীমা বিনীতভাবে প্রশ্ন করল, "মঁসিয়ে আপনার জন্য কি করতে পারি?" লোকটি বার বার বলতে লাগল তাঁকে যেতে হবে। কাছাকাছি কোন বিমানঘাটিতে গিয়ে হাজির হতে হবে। লোকটি কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও বিশ্রী ভঙ্গীতে বলল, বৈমানিকদের এখন বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং সে কোন মতেই জার্মানদের হাতে পড়তে চায় না। কথা বলতে তার জড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ কাঁপছে। লোকটির বয়স খুব কম। সীমা মনে মনে সঙ্কল্প করল লোকটিকে সাহায্য করতেই হবে।

অন্যান্য সকলে তখনও নীরব। ওদের এই অভদ্রতায় সে বিরক্ত হয়। সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি লেগেছে?" তিনি বললেন, "তাঁর প্লেনটা গুলি করে নামান হয়েছে। তিনি প্যারাশুটে নেমেছেন। কিঞ্চিৎ কেটে ছড়ে গেছে।" তিনজনেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে কিন্তু কেউ কথা বলছে না। সেই ইংরাজতনয় ও সীমার মধ্যে কথোপকথন চলেছে।

সীমা একটু থেমে বলল, "আমরা আপনাকে সাহায্য করব। ওঁকে আমরা সাহায্য করব, কেমন মরিস, করব না?"

মরিস আগন্তুকের দিকে তাকাল, সীমার দিকে তাকাল, তারপর ধূমপান করে অলস ভঙ্গীতে বলল, "তুমি যদি ওঁকে সাহায্য করতে চাও মামোজেল, তা হলে তোমার সে কাজে বাধা দেবার আমার কিছু নেই।" এবং তার পরে তার গলার স্বর না বাড়িয়ে একরকম মধুর কণ্ঠেই বলে চলল, "কিন্তু তোমার কি হয়েছে? তুমি কর্তার সঙ্গে দেখছি খেলা শুরু করেছ। এই ত গতকাল তোমার দু পয়সার রাগ দেখিয়েছ। আমাদের যখন কিছু বলবার হবে তখন আমরা আমাদের ফাঁদ পাতব। কিন্তু সুখের পায়রা, এখন ফ্রান্সের ধ্বংস হচ্ছে, তুমি তার ভেতর থেকে বুঝি আমোদও উত্তেজনা পাচ্ছ?"

সীমার মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বৃদ্ধ রিচার্ড বলল, "আহা ওকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।" বৃদ্ধ প্যাকার জর্জেস কিঞ্চিৎ বেয়াড়া ভাবেই আগন্তুককে বলল, "মঁসিয়ে আসুন ছায়ায় আসুন। একটু আপেল সাইডার খাবেন? আমাদের কাছে খুব ভাল আপেল সাইডার আছে "

আগন্তুক সম্ভবতঃ মরিসের কথা ভালো বুঝতে পারেনি। সে বলল, "পেট্রল বা যানবাহন পাওয়া বড় ব্যয়সাধ্য। আমার টাকা আছে। ইংরেজী টাকা। ফরাসী টাকার চেয়েও হয়ত এখন তার দাম বেশী। আমাকে এখন দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। আমাকে বোর্দো যেতে হবে। মঁসিয়েরা আপনারা আমার কথা বুঝছেন ত'।"

প্যাকার আমন্ত্রণের ভঙ্গী করল আর বৈমানিক ওদের মধ্যিখানে গিয়ে বসল। সীমা সেই রকম আধো আলো আধো ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে মরিসের দিকে তাকায়। মরিস ধূমপান করছিল।

বৃদ্ধ রিচার্ড বলল, "তুমি যদি তোমার মোটার সাইকেলটা ওঁকে দাও মরিস, তাহলে উনি হয়ত পৌঁছে যেতে পারেন।

মরিস ব্যঙ্গ করে বলল, "আমার মোটার সাইকেলটা বেচে দোব! কেন আমি কি ফতুর হয়ে গেছি মনে কর?"

বৃদ্ধ সেই রকম একগুঁয়ের ভঙ্গীতে বলল, "তা হলে তুমিও পালাতে চাও ?"

মরিস প্রতিবাদ করে বলে, "আমি ত তা বলিনি। আমি এখনো মনস্থির করিনি। অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখতে হবে। এখন এই অবস্থায় মোটর সাইকেলটা দিয়ে দেওয়া আহাম্মুকি হবে।

প্যাকার পানীয় নিয়ে এল। নিজের জন্য কিছুটা ঢেলে নিয়ে সবাইকে দিল। তারপর বৈমানিককে উদ্দেশ করে বলল, "আপনার স্বাস্থ্য মঁসিয়ে।" সীমা তখনও সেই রকম আধা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ সেই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "আমি তোমায় বলছি মরিস, তুমি যদি পালাতে চাও ত আজই যাও। অনেক পরে দেরী হয়ে যাবে। আমি বরং একটা কথা বলি। মোটার সাইকেলটা নিয়ে নিজে যাও আর এই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নাও।"

মরিস উদ্ধত ভাবে বলল, "তোমার মুখ বন্ধ কর। আমি ত তোমাদের আগেই বলেছি আমি সহজে নড়ছি না। আগে দেখব অবস্থা কি রকম দাঁড়ায়।"

বৃদ্ধ তবু বলে, "তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। তখন হয়ত জার্মানরাই তোমার মোটর সাইকেল নিয়ে নেবে। মরিস, আমি হলে হয় সাইকেলটা টেনে বার করতুম নয় বিক্রী করতুম। ইংরেজী পাউণ্ড তত খারাপ নয়।"

সীমা উত্তেজিত ভাবে মরিসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট খুলল। মরিস সহসা তার ওপর ফেটে পড়ল, "তুমি চুপ করে থাক। তোমার ও কালামুখ আর খুলো না।" কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সে অসীম ঘৃণাভরে সীমার আপাদমস্তক দেখতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথায় জোর দিয়ে চড়া গলায় বলতে লাগল, "যারা বড়লোক এই তাদের রীতি। ভিলা মনরোপোয় থেকে আর কত ভাল হবে।

মাথা মোটা নিজে মজুতদার, সে নিজের জন্যে কোটী কোটী টাকা করে আর যুদ্ধ বানচাল করবার চেষ্টা করে। আর মামজেল একটা ছ'ড়ে যাওয়া ইংরেজের ঠ্যাঙের জন্য করুণা প্রকাশের ভাণ করছেন। আর তাই করে ওরা ওদের বিবেক বাঁচিয়ে রেখে দেশভক্ত সাজছেন। যত সব ইয়ে! যাও না ওর সঙ্গে এতই যদি দয়া। ওর সঙ্গে শুয়ে পড। তোমার ও দু'পয়সার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দাও। এই বলে সে আপেল সাইডার পান করতে লাগল।

সীমার মনে হল ও যেন তাকে ধরে প্রহার করল। সে উঠে দাড়াল। হাত পা তার কাঁপছে চোখে তার জল। ধীরে ধীরে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে উদাসীন ভঙ্গীতে মরিস সেই ইংরেজটিকে প্রশ্ন করল, "একটা প্রথম শ্রেণীর মোটার সাইকেলের জন্য আপনি কত খরচ করতে পারেন মঁসিয়ে?"

সীমা অস্থির হয়ে দাঁড়াল। তার হৃদয়ে যেন কে তীব্র আঘাত হানল। এই পরিবর্তন সহসা এল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আনন্দ এসে তাকে তরঙ্গের মত ঘিরল। এই মরিস কি মানুষ সে! সীমা ভাবল সকলে হয়ত তার আনন্দ লক্ষ্য করবে। সে তা হতে দেবে না। সে দ্রুতপায়ে দ্রুত গতিতে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গ্যারেজের ভিতর ঢুকে গেল।

সেখানে সে অন্ধকারে উত্তাপের ভিতর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বসে ভাবতে লাগল, নিজের মনে মনে হেসে বলল, "এই মরিস, মরিসটা কি অদ্ভুত লোক! লোকটা সত্যি ভাল। কিন্তু ভাল হতে লজ্জা পায়। লোকটা ওকে গালাগালি দিয়েছে, অশ্লীল কদর্যতার সঙ্গে গালাগালি দিয়েছে শুধু নিজের ভব্যতা বাঁচাবার জন্যে। ভাগ্যক্রমে ইংরেজটি তার নোংরা মন্তব্য কিছু বুঝাতে পারেনি। আর ঐ দুটি বুড়ো লোকের পক্ষে এতে আর কি এসে যায়।

সে শুনতে পেল মরিস বেঞ্চের অপর সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কেন সে ইংরেজটির প্রস্তাব গ্রহণ করছে। সে বলল, সে এখানে থাকতে চায়, সে প্রমাণ করতে পারবে যে সে বে-সামরিক ব্যক্তি ও ট্রাকের কাজে প্রয়োজন তার বেশী। দ্বিতীয়তঃ যদি তেমন কোন বিপদ ঘটে তাহলে তার পক্ষে পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়। আর সেখানে মোটার সাইকেলের চেয়ে বাইসিকল করে যাওয়াটা সুবিধের হবে। সংক্ষেপে অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে মোটার সাইকেলের চাইতে ইংরেজী টাকারই এখন তার কাছে দাম বেশী। একথা অবশ্য এখন নিরর্থক সে জানে এবং অপরেও জানে, আর সীমাও তাই জানে, সে যে ভব্যতার খাতিরে এটা করছে না এটুকুই প্রচ্ছন্ন রাখতে চায়। গ্যারেজের অন্ধকারে বসে সীমা আনন্দে ইংরেজের সঙ্গে মরিসের এই দর-কষাকষি শোনে। সে শুনল, বেচারাকে আশা থেকে নিরাশায় ওরা দমিয়ে দিচ্ছে। তাকে ঐ নিয়ে রহস্য করছে। অবশেষে তাকে মোটার সাইকেল, গাসোলিন, খাদ্য, রাস্তার মানচিত্র প্রভৃতি দিয়ে পথে চালু করে দিল।

সীমা তার বাইসিকল আর ঝুড়ি নিয়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রাঙ্গণের ভিতর আর না ঢুকে সোজা অফিসের গেট দিয়ে বাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

পথে ডেপুটি প্রিফেক্টরের মোটার সাইকেল তাকে অতিক্রম করে গেল। সামনে বেলিফ বৃদ্ধ জিনো বসে আছে। আর পিছনে বসে আছেন বৃদ্ধ জিনোর কাঁধে হাত দিয়ে মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফেক্ট। লোকটিকে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। বোঝা গেল প্রসপার খুড়োর কাছে ওর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। খুড়োর চাইতে সীমার মঁসিয়ে কডেলিয়রের ওপর রাগটাই যেন বেশী হয়ে উঠল। তার অদৃশ্যমান মোটার সাইকেলের দিকে সীমা মরিসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকিয়ে রইল। এই দ্রুত পশ্চাৎ অপসারণ সরকারের পক্ষে কি প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা।

পাঁচ

সংঘাত

পরদিন প্রাতে সীমা তার সাইকেল ঠেলে সেণ্ট মার্টিনের দিকে যখন যাচ্ছিল তখন তার রৌদ্রতপ্ত মুখ, চওড়া চোয়াল ও অবিনীত কপাল বেশ প্রশান্ত মনে হচ্ছিল। কোথাও এতটুকু ভাবাবেগের চিহ্ন নেই। কিন্তু এই শান্ত মুখখানির পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে আবেগজনিত উত্তেজনা।

ও যা স্থির করেছে তা সম্পন্ন করবার অসহিষ্ণুতায় ওর শরীর কাঁপছে। সেই সঙ্গে কাজটি স্থগিত রাখবার জন্য সীমা মনে মনে সুযোগ খুঁজে! বারবার ও পকেটে হাত দিয়ে চাবি ও দেশলাই খুঁজছে। বারবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও মনে মনে যে কাজ করবে তার কল্পনা করে। আবেগ চেপে রাখতে ওকে ভীষণ কষ্ট করতে হচ্ছে।

যে সময় ও মনস্থির করেছে সেই মুহূর্তের কথা মনে হল। গতকাল রাত্রে ডিনারের সময় প্রসপার খুড়ো ডেপুটি প্রিফেক্টরের সঙ্গে ওঁর কথোপকথনের কথা বলে যাচ্ছিলেন।

প্রসপার খুড়ো নিশ্চয়ই বিষয়টি একটু অতিরঞ্জিত করে এবং তাঁর মনের মত করে বলছিলেন। যাই হোক সীমার ধারণা ডেপুটি প্রিফেক্টর কি চেয়েছেন তা ও বুঝেছে। তিনি কি ভাবে কথা বলেছেন আর প্রসপার খুড়ো কি ভাবে জবাব দিয়েছেন সবই যেন ওর জানা। সে যদিও উপস্থিত ছিল না তবুও মঁসিয়ে কডিলেয়র অনুরোধ ও খুড়োর ক্রুদ্ধ ও শ্লেষাত্মক প্রতিবাদ, দীর্ঘ বক্তৃতার টানা-পোড়েন আর তারপর ডেপুটি প্রিফেক্টের সরোষে প্রস্থান।

একজন আর্মি অফিসার তার আগে প্রসপার খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ট্রাক ও গ্যাসোলিন ধ্বংস করতে বলেছিলেন। প্রসপার খুড়ো নাকি ডেপুটিকে বলেছেন ক্যাপ্টেন যদি তার বুদ্ধিহীন কাজ না করে থাকতে পারে তাহলে আপনিও আপনার এই বোকার মত অনুরোধ করে আমায় বিব্রত করবেন না। তিনি নাকি বলেছেন, আমার ব্যবসা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না। তিনি নাকি আরো বলেছেন, "আপনাদের কি ধারণা আমি এখানে গ্যাসোলিন জমিয়ে রেখেছি জার্মানরা চুরি করবে বলে। আমিও কচি খোকা নই। এটা জানবেন ওরা আমার কাছ থেকে মটগার্ড বা একবিন্দু গ্যাসোলিন চুরি করতে পারবে না। আর কি করতে হবে ও কখন করতে হবে তা ঠিক করব আমি, এই আমার জেদ।"

প্রসপার খুড়ো যখন তার চূড়ান্ত উত্তর উচ্চারিত করলেন তখনি সীমা স্থির করেছিল এ কাজ তাকে স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে। নিজেকেই লোডিং ইয়ার্ডে যেতে হবে। তখনি, সেই মুহূর্তেই সীমা তার সংঘাতের পরিকল্পনা করেছে। সেই সময় সীমা মনে মনে ভেবেছিল প্রসপার খুড়ো নিশ্চয়ই শত্রুরা আসবার আগে জিনিসপত্র ধ্বংস করে ফেলবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ উনি হলেন সেণ্ট মার্টিনের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। উনি হলেন প্লানকার্ড, প্রকৃত প্লানকার্ড বংশের ছেলে। আসলে তার আপত্তি হল পথে। তিনি তার নিজের ব্যবসার মালিক ও প্রভু হয়েই থাকতে চান। অপরের কাছ থেকে হুকুম বা হুমকি শোনবার লোক তিনি নন।

এই হয়েছিল ব্যাপার। ডেপুটি প্রিফেক্টের সঙ্গে এই কথাবার্তাটুকু না হলে সবই হয়ত ভাল চলত। কিন্তু এখন মঁসিয়ে কডিলেয়র এ ব্যাপারে নাম ঢুকিয়ে সব গোলমাল করে দিয়েছেন। এখন আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রসপার খুড়োকে প্রকৃত পথ খুঁজে নিতে হবে।

হয়ত তার জন্য অনেক সময় লেগে যাবে। জার্মানরা যে কোন সময়ে শহরে এসে পড়বে। কিন্তু যদি সত্যই দেরী হয়ে যায়, জার্মানরা এসে পড়ে, জিনিসপত্র যদি ধ্বংস করবার পূর্বে তাদের হাতে চলে যায় তাহলে প্লানকার্ড পরিবারের কি অপরিসীম লজ্জা। এই কারণেই প্রসপার খুড়োর হাত থেকে দায়িত্বভার ওর নিজের হাতে নিতে হবে। সে পীয়্যর প্লানকার্ডের মেয়ে। তারপর একবার কাজ শেষ হলে প্রসপার খুড়ো মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। আর তখন সীমা তার কাছ থেকে হয়ত ধন্যবাদ ও প্রশংসা পাবে।

গত রজনী থেকে এই কথা সে একশবার ভেবেছে। কিন্তু পক্ষ ও বিপক্ষের সকল যুক্তির এদিক ওদিক বিবেচনা করে গোড়া থেকে সীমা তার সিদ্ধান্ত আঁকড়ে আছে। প্রসপার খুড়ো তাঁর রিপোর্টের কথাটি ভাববার আগেই সমস্ত ব্যাপারটি ও ভেবে রেখেছে!

খুড়োর রিপোর্ট সম্পর্কে মাদামের মন্তব্যে সীমা আরো দৃঢসংকল্প হয়ে আছে। মাদাম বলেছিলেন, "কলমপেশা লোকগুলো ঐ রকমই হয়। ওরা শুধু আমাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে ওদের উদ্ধত্য পরিতপ্ত করতে চায়।" আর "তোমার ঐ কয়েক বিন্দু গ্যাসোলিন জার্মানদের কাছে —কি? ফিলিপের কি ধারণা যে ওরা ওদের ট্যাংকের জন্যে তোমার ঐ গ্যাসোলিনটুকুর উপর নির্ভর করে আছে?"

সীমা তখনই মনে মনে এই প্রশ্নের জবাব দেয়ঃ হয়ত এত লোকে এই কথা ভাবে বলে ওরা মুস্কিলে পড়েছে। সীমার স্পষ্টই মনে হয় যে শত্রুর ট্যাংকের চাইতেও মাদামের যুক্তি অধিকতর ভয়ঙ্কর।

চড়াই-এর রাস্তা শেষ হয়ে এল; সীমার সামনে সোজা সমতল পথ। বাইসিকলে উঠে সীমা খুব জোরে চালিয়ে দিল। নিজেকে অত্যন্ত মুক্ত ও সুখী বলে মনে হল। একটা পূত গাম্ভীর্যে তার মনটা ভরে যায়। আজকের দিনটি ওর কাছে বড়ো। ওর জীবন আজ অর্থপূর্ণ। সীমার উদ্দেশ্য ও কর্ম আজ তার সামনে বিরাট ও উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে আজ সে উৎসবের উপযোগী করে তুলেছে, বাড়ি থেকে বেরোবার পূর্বে বাগানের হোস পাইপ নিয়ে দ্বিতীয়বার স্নান করেছে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে। সীমা হাসল। গায়ের ওপর জল ছড়িয়ে পড়ার সময় সে যে কি আনন্দ ওর হয়েছিল সেই কথা মনে পড়ে। সবাই ওর দিকে চিরদিন অবহেলার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে ভিলা মনরেপোর দরিদ্র ভাইঝি আর লাল পাম্পের কাছে দাসীর মতো দাঁড়িয়ে তেল বিক্রী করে। এখন সেণ্ট মার্টিন যে একটা সম্ভ্রান্ত শহর, বিনা যুদ্ধে সে জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তা প্রমাণ করবার ভার পড়েছে এই মেয়েটির ওপর।

পথটি সহসা বাঁক নিয়ে খাড়া চড়াইয়ে সেণ্টমার্টিনের দিকে উঠেছে। অনেক আগে সীমা যখন ছোটো ছিল তখন এই খাড়াই সত্ত্বেও সে উঠে গেছে ; মাঝে মাঝে হেনরিয়েটের সঙ্গে বাজী রেখেছে কে কতক্ষণ এভাবে থাকতে পারে। আজো সে আর নামলো না, সোজা সাইকেল চালিয়ে দিল। একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। সবাই গাড়ি ঠেলে নিয়ে যায় কিন্তু ও আজ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর। সাইকেল চলেছে, সীমা প্যাডেল করছে, বাইসিকেল এঁকে বেঁকেই চলেছে। অত্যন্ত গরম। সীমা হাঁপায়, এ নেহাতই গোঁয়াতুর্মি, কিন্তু আর একটুখানি পথ আর একটু এগিয়ে গেলেই পথের বাঁকে পৌঁছানো যাবে! ঠোঁটে খুশীর ফাঁকা হাসি টেনে সীমা চড়াই-এ ওঠে।

যখন এভাবে যাওয়া নেহাতই অসম্ভব হয়ে উঠল, মনে হল প্রাণ যেন গলায় এসে পড়েছে, তখনই সে নামল। এক মুহূর্তের জন্য বাইসিকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সীমা তার মুখের ঘাম মুছল। তার মুখে তখনও সেই হাসি লেগে আছে। কিন্তু তখনই তার সেই আনন্দ যেন মুছে গেল। এই অকারণ পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শহরে যাবার পথ যে আর দূর নয় এই কথা ভেবে তার আনন্দ হল।

বাকী পথটুকু সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলে সীমা। কয়েকজন সৈনিক বেঞ্চের ওপর বসে আছে। তাদের অত্যন্ত শান্ত দেখাচ্ছে। তাদের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকায় সীমা। তার মনে সন্দেহ জাগে এইসব সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করা কি সম্ভব হবে? কিন্তু তখনই তার মনে পড়ে তুওর শহরে কি প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে ওদের লড়তে হয়েছে। গতকাল খবর পাওয়া গেছে চারদিন ধরে ওরা লড়ছে। হয়ত আজো সেই ভাবে ওদের লড়াই চলেছে।

দ্রুতগতিতে আরো জোর দিয়ে ও সাইকেল ঠেলে। ওর যা উদ্দেশ্য তা ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। "এখন যদি নয় ত' কখন? তুমি যদি না পার ত' কে পারবে?"

সীমা পোর্ট সেণ্ট-লাজারে পৌঁছল। সত্যই ত' শহরে ও কি চায়? সোজা লোডিং ইয়ার্ডে চলে গেল না কেন? ও হ্যাঁ, একটা অজুহাত চাই, ঘটনাকালে শহরে ওকে যে দেখা চাই; ডেপুটি প্রিফেক্টরের ওখানে সবাই ওকে দেখলে ভালো হয়। সকলেই গোপনে ভাববে যে প্লানকার্ড পরিবার এই কাণ্ডটি করেছে কিন্তু কেউই প্রকৃত কাণ্ডটা যে কি হয়েছে তা জানতে পারবে না. তা হলেই এই ব্যাপারে ওদের বিজড়িত করা সহজ হবে না। এ সব অতি সহজ ব্যাপার, সীমা মনেমনে সবই হিসেব করে রেখেছে।

যদি কোনো ছুতার প্রয়োজন না থাকত তা হলে অনেক আগেই লোডিং ইয়ার্ডে হাজির হত। এই চিন্তা মনে উদয় হওয়ায় ওর মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অসহিষ্ণুতায় সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সংঘাতের মুহূর্তের কথা ভেবে ও শঙ্কিত হয়ে উঠছে। উপস্থিত কাজটুকু স্থগিত রাখার জন্য ও আনন্দিত।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে অসমতল ও বাঁকানো গলিতে সে সাইকেলটি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গতকালের পর সেণ্ট-মার্টিনের আরো একটু

পরিবর্তন হয়েছে। পথে মাত্র দু'চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। শহরটি শ্মশানক্ষেত্রের মতো শান্ত। শত্রুর আগমন আশঙ্কায় শহরটি নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। প্রাণহীন বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে। খড়খড়িগুলি বন্ধ। অসহ্য গরম। ভারী পদক্ষেপে সীমা সেই গরমে এগিয়ে চলে, প্রেতের মতো শূন্যতা তার মনে বিশেষ করে বাজে। বাড়িগুলি এত উজ্জ্বল ও রঙদার বলেই এই নিদারুণ শূন্যতা তার মনে বড়ো বাজে। সীমার মনে হয় যেন তারই চারপাশে পাঁচিল ঘেরা হয়েছে। সীমা হেঁটে চলে, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। ফুটপাথের উত্তাপ যেন তার পা পুড়িয়ে দিচ্ছে আর বাইসিকেলটাও যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠছে। যদিও একটিও পরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছেনা, মাঝে মাঝে অচেনা দু'একটা সৈনিক ঘুরছে, তবু ওর মনে হয় যেন সারা শহর ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আর ওর মতলব তারা ধরে ফেলেছে।

সবচেয়ে বেয়াড়া ব্যাপার এই যে, যেসব বাসিন্দারা রয়ে গিয়েছেন তাঁদের ত দেখা যাচ্ছে না। সীমার স্কুলের সাথী আদ্রিয়েন ভইসিনের বাড়িতে সীমা এসেছিল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সেখানে কেউই নেই। বাড়িটি বিশৃঙ্খল; বোঝা যায় তাড়াতাড়ি যেন সব চলে গিয়েছে। হাওয়া অত্যন্ত গুমোট আর অসহ্য গরম। সীমা বসবার ঘরে যায়। মঁসিয়ে ভইসিন নানাবিধ রঙের অনেকগুলি পাখী খাঁচায় রেখেছিলেন, পাখীগুলি আছে কিন্তু তারা আর বেঁচে নেই।

সীমার কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। বাড়ি ছেড়ে পথ বেয়ে সাইকেল ঠেলে আবার সে চলে। এখনো পর্যন্ত পরিচিত কারো সঙ্গে ওর দেখা হয় নি যে অন্তত বলতে পারবে ওকে দেখেছে। প্লাস সেন্ট-লাজারের পথপ্রান্তের এক ছায়া-ঘেরা বেঞ্চ থেকে যখন একজন ওকে ডাকল তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লোকটি মরিস। এলম গাছের তলায় বসে আছে। মুখে ছায়া

পড়েছে। সে একা নয়। তার সঙ্গে একটি মেয়ে বসে আছে, মেয়েটিকে কেমন অশ্লীল দেখাচ্ছে। লোডিং ইয়ার্ডে লোকে বলত মরিস নাকি অনেক মেয়ে নিয়ে ঘোরে। তবে যাই হোক ওকে দেখে সে খুশি হয়েছে। অলসভাবে মরিস বলে, "কি মামজেল, সাত বছরের মতো মাল মজুত রাখছ না কি?"

যে কাজের জন্য সীমা এসেছে সে কথা মনে ভাবে। এমন কি অভ্যাস বশে পকেটে চাবী ও দেশলাইতে হাত দেয় আর মরিসের এই নির্মম অবিচারে ও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করে।

বড় বড় কালো চোখ দুটি মেলে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মরিসের মুখের দিকে। মরিস হেসে বলে, "কিছু মনে করে বলি নি।" তারপর ভদ্রভাবে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, "এসো না, বসো ঐখানে, গতকাল তুমি বৈমানিকদের ব্যাপারে বেশ সাহায্য করেছিলে, অর্থাৎ ঠিক আমার মনের মতোই কাজ করেছো। লোকটা আমাকে কিছু দিয়েছে, তোমাকে কমিশন দোবোখন। চলো না, নেঁপোলিয়নে গিয়ে জার্মানরা আসবার আগে এক গ্লাস বীয়র টানা যাক।"

সীমা ইতস্ততঃ করে ভাবে: সে যদি মরিস আর এই অভব্য চেহারার স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাফেতে যায় ত' মাদাম কি মনে করবেন? এ এক বেয়াড়া কথা; দুদিন আগেও একথা ও অসম্ভব বলেই মনে করত আজ কিন্তু অবস্থা বিভিন্ন। আজ ও নিজেকে শহরে দেখাতে চায়। সুতরাং কাফে নেঁপোলিয়নে গেলে নিজেকে দেখানোর সুযোগ মিলবে। তাছাড়া ও যদি ওর সঙ্গে না যায় তাহলে মরিস হয়ত ওকে আবার ভীরু ও উদ্ধত মনে করবে। বেঞ্চের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায় সীমা।

মরিস অন্যভাবে মুখ টিপে হেসে উঠে দাঁড়ায়। তারপর একটা ভঙ্গী করে বলে, "এই হল আমার বান্ধবী লুইসন, আর মামোজেল সীমা, আমার মনিবের ভাইঝি।"

সকলে নিকটস্থ কাফেতে যায়। লাল ও জরদা রঙের ছোট্ট একখানি পাথরের টেবলে ওরা বসে। কয়েকজন সৈনিক ও দু'চারজন শরণাগত এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে; স্থানীয় লোকেদের মধ্যে শুধু ছিটগ্রস্ত ঘড়িওলা ডারেউ বসে আছে। মরিসের নীল সার্ট যথারীতি খোলা। ড্রাইভার মরিস ও লুইসনের মতো মেয়ের সঙ্গে সীমাকে দেখে হোটেলের মালিক মঁসিয়ে গ্রাসে রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন। যাই হোক উনি তবু বলতে পারবেন, সীমাকে দেখেছেন।

যখন তিন গ্লাশ বীয়র ওদের সামনে রাখা হ'ল তখন সে বলল, "গতকাল মতভেদের ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়েছিল। কেমন তাই নয়? এইবার দেখা যাবে গাসোলিন আর ট্রাকের কি হয়।"

সীমা সচকিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকায়। সে কি ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে নাকি? মরিস বলতে থাকে, "তোমার এখনো ধারণা আছে নাকি যে আমরা জার্মানদের সঙ্গে যুঝতে পারব। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, হয়ত কয়েক ঘণ্টার ভেতরই আমরা বুঝতে পারব ঐ লোডিং ইয়ার্ডের ভিতর কি ঘটবে। তোমার ঐ সুন্দর চোখ দুটো যদি একটু খোলো মামজেল, তাহলে দেখবে যে আমাদের সাহসী সৈনিকবৃন্দ শুধু পূব আর উত্তর থেকেই আসছে না দক্ষিণ-পশ্চিম থেকেও আসছে। তার মানে হল এই যে, আমাদের সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেও শত্রুদের সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থাকে কি বলে জান? তার মানে চারিদিক থেকে শত্রুরা আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমরা আবেষ্টনের মধ্যে পড়েছি।"

আবেষ্টন, তাহলে হয়ত বাকী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা আমাদের ঘিরে ধরবে। সীমার মনে আতঙ্ক জাগল, নষ্ট করবার মতো আর সময় নেই। সীমা মনে মনে একটা সময় বেছে নেয়। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই যা করবার তা করে নিতে হবে।

সহসা সে বলে ওঠে, "আমাকে এখনি যেতে হবে।" একটা কথা তার মনে জেগে ওঠে, "এখন যদি নয় ত' কখন? তুমি যদি না কর ত' কে করবে?" ঠিক সেই সময়েই লুইসন যেভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তা দেখে সীমা বিরক্ত হয়ে ওঠে; হয়ত তার ধারণা সীমা তারই মতন আর একটা মেয়ে।

মরিস জবাব দেয়, "অত বেরসিক হয়ো না। একটু পান করে নিতে দোষ কি?" সীমা গ্লাসটা শেষ করে। বলে, "আমি এখন বাজি বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি। এক বোতল পেনরদ আর কুড়ি প্যাকেট গ্যলুই দিতে পারি।" মুরুব্বির ভঙ্গীতে সীমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে মরিস। সীমা তার দিকে তাকায়। সীমা শোনে তার নিজের কণ্ঠ থেকেই সহসা ধ্বনিত হয়; "আমি বাজীটা ধরলাম।"

মরিসকে বিস্মিত দেখায়। অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে সীমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, "বোঝা যাচ্ছে মামজেলের অনেক পয়সা। যাই হোক এটা একটা মস্ত বাজী।" কথা বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দেয় মরিস। পাথরের টেবিলের ওপর সেই খোলা সুদৃঢ় হাতখানি ক্ষণকাল লক্ষ্য করল সীমা,—তারপর হাতটি ধরল। লুইসন হেসে ওঠে। সীমা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "না, আমাকে এখনই যেতে হবে।"

সবিস্ময়ে মরিস প্রশ্ন করে, "কিন্তু অত তাড়া কিসের? আজ আর তোমার কিছু তাড়াতাড়ি করার নেই। কি আরও মাল আজ মজুত করবে নাকি? ভিলা মনরেপোর জন্যেও নয়।"

সীমা বলে, আমাকে প্রিফেক্টের অফিসে যেতে হবে। তারপর মরিসের চোখে সন্দেহের ভাব লক্ষ্য করে বলে, "মঁসিয়ে জাভিয়েকে একটা খবর দিতে হবে।"

শ্লেষভরে মরিস বলে, "ও তাই নাকি! তুমি সর্বদাই ব্যস্ত? তাহলে এক কাজ করো, দৌড়ে যাও খুকি।"

সীমা প্যালেস নইরেটের দিকে সাইকেল ঠেলে এগিয়ে চলে। সীমা বোঝে ম রস ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আর শুনতে পায় লুইসন হাসছে ; এতক্ষণে হয়ত ওরা ওকে নিয়ে নোংরা ইয়ার্কি করছে। ক্রমে সীমা প্যালেসে পৌঁছয়। প্রকাণ্ড প্রাচীন দরজায় তালা লাগানো। সীমা ঘণ্টা বাজায় না। তার নিজের প্রত্যাশা অপরের মন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলে। তার মনে হয় এই গেটের ওপারের লোকেরা জার্মানদের অপেক্ষায় আছে। ও ঘণ্টা দিলে তারা সচকিত হয়ে উঠবে। পাশের দরজা দিয়ে সীমা সাইকেল ঠেলে ঢোকে। সেইখান থেকে পরিচিত দ্বাররক্ষীর মুখ জানলার ফাঁকে দেখা যায়। সে সীমাকে দরজা খুলে দেয়।

লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "তুমি আবার এখানে কি চাও?" ওর আগমনে এইভাবে প্রশ্ন করাতে সীমা খুশি হয়ে ওঠে। সে বুঝিয়ে বলে "মঁসিয়ে জাভিয়েরের সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। আমার সাইকেলটা এখানে রাখতে পারি?"

বাড়ির ভিতর সকল অফিসররাই সমবেত আছেন, সকলে রবিবারের সেরা পোশাকে সজ্জিত, যে যার আসনে বসে আছেন। কেউ কথা বলছেন না। গম্ভীর ও বিষাদভরা মুখে তাঁরা বসে আছেন।

অপেক্ষমান দলের সেই অলসতায় তাদের সেই আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্যের ক্লেশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ডেপুটি প্রিফেক্ট তাঁর উত্তেজনা চাপতে পারছেন না, তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটি অফিসঘর থেকে অপর অফিসঘরে ঢুকছেন, জামাটা নাড়ছেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, বিষাদ ও বেদনাভরা অর্থহীন অনেক কথাই বলছেন! মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে কোনো কোনো অফিসরের কাঁধে হাত রাখছেন।

মঁসিয়ে জাভিয়েরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা থাকায় সীমা এখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে—এবার কিন্তু অত্যন্ত বিশ্রী ও অস্বচ্ছন্দ বোধ

হয় তার। তার অন্যতম কারণ হয়ত পায়জামা পরে আছে তাই, আজ এ ভাবে পায়জামা পরা একটু বেয়াড়া হয়েছে। মাদামের কথাই ঠিক, সবাই ওর দিকে অদ্ভুতভাবে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। সীমা কিন্তু ভেবে পায় না অন্য কোনো পোশাকে ও কিভাবে ওর সংকল্প সাধন করত। সকল অফিসরের কাছে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে সীমা। আজ সকলেরই ওঁকে দেখা প্রয়োজন।

সীমা মঁসিয়ে জাভিয়েরের অফিসে ঢোকে। তিনি যথারীতি ডেস্কে বসে আছেন। একটি হাত গালে রেখেছেন আর অপর হাতটি চেয়ারের হাতলে। তাঁর প্রকৃতিগত চাপল্য আজ শ্রান্তিতে চাপা পড়েছে; সীমার মনে পড়ে এই রকম আপন চেয়ারে বসা অবস্থায় ওর বাবাকে একদিন কিভাবে সে বিস্মিত করেছিল।

সীমা ঘরে ঢুকতেই মঁসিয়ে জাভিয়ের তাকিয়ে দেখলেন। সেইরকম বন্ধুত্বের ভাব দেখানোর চেষ্টা করলেন। এমন কি একটু রসিকতাও করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। বলেন: "তুমি এখানে কি মতলবে?"

সীমা উড়ো জবাব দেয়, "বাড়িতে আর ভাল লাগে না।"

মঁসিয়ে জাভিয়ের বলেন "মাদাম বিরক্ত হবেন না?"

সীমা কাঁধ নাড়ে, তারপর বলে, "সত্যি, পায়জামা পরে কি আমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে?"

চিঠিখোলার যন্ত্রটা নিয়ে মঁসিয়ে জাভিয়ের নাড়াচাড়া করছিলেন, গম্ভীর গলায় শ্লেষ মিশিয়ে তিনি বললেন, "জার্মানরা তোমার পায়জামা দেখে বিরক্ত হবে কিনা কে জানে?" সীমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই বিষণ্ণ মুখের পানে তাকিয়ে থাকে! অতি কষ্টে তিনি মনের ভাব চেপে রেখেছেন, মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়েছে। গাল বসে গেছে। সীমা তাঁর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে। এখনই এই মুহূর্তে ওকে চলে যেতে হবে, যাওয়ার পথে এই সদয় ও

সহৃদয় মুখের স্মৃতিটুকু নিয়ে যাবে। মসিয়ে জাভিয়ে ওর মুখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলেন, "কি ব্যাপার বলো ত?" কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সন্দেহের ভাব প্রকাশ পায়। সীমা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করেঃ ওঁকে সব কথা বলা কি ভালো হবে? উনি ওর বাবাকে ভালো-বাসতেন, সীমাকেও উনি ভালোবাসেন!

না, ওঁকে কিছুই বলা চলে না! ওঁকে এর ভিতর জড়ানো উচিত নয়, ওঁর মত একজন সরকারী কর্মচারীকে এঁর ভিতর না টানলেই ভালো। বেশ সপ্রতিভতার ভাণ করে সীমা বলে, "না, কি আর হবে? কিছুই নয়।

মঁসিয়ে জাভিয়ের বলেন, "এখন আমাদের সকলেরই নানা উদ্বেগ, নানা ঝঞ্ঝাট।" এই সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা তীক্ষ্ণ ঘণ্টাধ্বনি সারা বাড়িতে বাজতে লাগল। সীমা, এমন কি মঁসিয়ে জাভিয়েরও সচকিত হয়ে উঠলেন, সবাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, ব্যাপার কি! গেটের সামনে স্ত্যাটালিন দাড়িয়ে; মঁসিয়ে প্ল্যান্‌কার্ডের মজুত পেট্রোলে পুষ্ট তাঁর সেই সবুজ রঙের গাড়ি, ঝক্ ঝক্ করছে—পোশাক আঁটা সোফার ষ্টিয়ারিং-এ টান হয়ে বসে আছে। মঁসিয়ে জাভিয়ের বল্লেন, "ইঁদুরদের এখন মহা ফূর্তি।"

ডেপুটি প্রিফেক্টের অফিসে উনি গেলেন, সীমাও পিছনে চলল। অন্যান্য অফিসররাও এলেন, নিয়মানুবর্তিতায় ভাঁটা পড়েছে, - সবাই শুনতে চায় স্ত্যাটালিন কি বলতে চান। মঁসিয়ে কার্ডেলিয়র বিস্ময় দমন করে মার্কুই দ্য সেণ্ট ব্রিসনকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি ওঁকে অভি-নন্দন জানিয়ে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অফিসের দরজা খোলা। অফিসের পাশের ঘরে এমন কি দরজায় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। মার্কুই হয়ত মনে করেছিলেন ডেপুটি প্রিফেক্ট হয়ত সাক্ষীহীন অবস্থায় আলো-চনা করবেন, কিন্তু মঁসিয়ে কার্ডেলিয়র যখন তার কর্মচারীদের সরে যেতে বল্লেন না – তখন স্ত্যাটালিন কথা বল্লেন।

তিনি ভাঙা গলায় বল্লেন, "আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে যে জার্মান ভদ্রলোক এখানে আসবেন তাঁর কাছে হয়ত আমার নামের একটা দাম থাকবে, আমার মনে হয় মঁসিয়ে লে স্থস্ প্রিফেক্ট জার্মানদের অভ্যর্থনার কাজে আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি, স্বদেশের স্বার্থে জার্মান সৈন্যদের আগমন কালে আমার এখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ও কর্তব্য বলে মনে করি।" ওঁকে সাধারণতঃ যেমন দেখায় তার চাইতেও অধিক উদ্ধত মনে হয়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বাদামী চোখ টিকোলো নাকের ওপর থেকে যেন ঘৃণাভরে ডেপুটি প্রিফেক্টের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। অপরের উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন তিনি অচেতন।

সবাই মঁসিয়ে কার্ডেলিয়রের জবাবের জন্য অপেক্ষা করে, তিনি চিন্তা করছেন—বেশ বোঝা যায় ওঁর জিভের ডগায় একটু তীক্ষ্ণ জবাব এসেছে কিন্তু তিনি ঢোঁকে গিল্লেন। অবশেষে দুর্বলকণ্ঠে বল্লেন, "তা যদি মনে করেন, তাই হবে।" তারপর চেয়ারের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বসার ইঙ্গিত করলেন।

সীমা এই অবস্থা লক্ষ্য করল, লোকটির ঔদ্ধত্য দেখল; ডেপুটি প্রিফেক্টের অসহায় ম্লান মুখও দেখল, মসিয়ে জাভিয়েরের ক্ষিপ্ত মুখভাব দেখল। নিজের সিদ্ধান্তে সে নিজেই খুশি হল। সেণ্ট মার্টিন ফ্যাসিস্ট-দের উপযুক্ত জবাব দেবে।

সীমা বেরিয়ে পড়ল, অফিস ও পাহারা ঘরের ধার দিয়ে বেগে বেরিয়ে এল, ভাগ্যক্রমে প্রহরী ওকে লক্ষ্য করলো না। সীমা এইখানে বাইসিকল রেখে গিছ্‌ল; সবাই জানুক সে দীর্ঘকাল এখানেই ছিল, এই তার বাসনা।

এ্যাভেন্যু দ্য পার্কের দিকে সীমা এগিয়ে চল্‌ল। সীমার অত্যন্ত তাড়া, যে সময় ও নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল তার সিকি ভাগ ইতি-মধ্যেই ক্ষয় হয়েছে! তাকে অনেক দূর যেতে হবে, তাও আবার

পায়ে হেঁটে, সে অতি তাড়াতাড়ি হাঁটে—যাতে না ওকে দেখা যায়—এখন যেন ও ডেপুটি প্রিফেক্টরে আছে, দেয়াল ধরে সীমা এগিয়ে চলে।

ক্রমে সীমা ইতিয়েনের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল, ছেলেবেলায় যে সাংকেতিক আওয়াজ করত, সেইভাবে শীষ না দিয়ে পারল না। সীমা আধমিনিট অপেক্ষা করবে স্থির করেছিল, কিন্তু আধমিনিট কাটার পূর্বেই ও এসে হাজির।

ওকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে সে স্বভাববশে ওর হাত দুটি চেপে ধরল। এই ওর স্বভাব, বলল "সারাদিনই ভাবছি তুমি আসবে কিনা। মনে মনে ভয় ছিল ওরা হয়ত তোমাকে বাইরে আসতে দেবে না। সীমা জবাব দেয় না, সহসা হেনরিয়েটের কথা ওর মনে স্পষ্ট হয়ে জাগে। সে কত সাহসী কত নির্ভীক ছিল। তারপরই ওর মনে কেমন অকারণ আতঙ্ক সঞ্চারিত হ'ত। একবার গোরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে কিছুতেই সে জায়গাটি পার হতে চায়নি। তখন সীমা তার সেই আতংক দেখে হেসে উঠে জোর করে ওকে নিয়ে জায়গাটুকু পার হয়েছিল। হেনরিয়েট ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। এই রকম চার পাঁচ রকমের স্মৃতিকথা ওর মনে ভেসে এল। হেনরিয়েটের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করতে পারত, হেনরিয়েট পরিষ্কারভাবে বুঝত—কেন কি করতে হবে,—হেনরিয়েট হয়ত তার সঙ্গে যোগ দিত।

ইতিয়েন ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছিল। একই সঙ্গে ওরা প্রাচীন-কালের রঙদার বাড়িগুলির ছায়াঢাকা পথ ধরে চল্‌ল। পার্ক দ্য কান্‌সিনের পথ ইতিয়েন ওকে নিয়ে যায়; যখন ছোট ছিল তখন ওরা এই পথে কতবার এসেছে, হেনরিয়েটও সঙ্গে থাক্‌ত।

পার্কটা সম্পূর্ণ জনহীন, কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে এদিক ওদিক খেলে বেড়াচ্ছে, হয়ত ওরা শরণাগতদের সন্তান। তারা গোলমাল

করছে, এই নৈঃশব্দের মধ্যে ওদের চীৎকার একটু অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। সহসা তারা থেমে গেল, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

সীমা ও ইতিয়েন একটি ছোট বেঞ্চে বসে পড়ল। হাতে মাত্র তিন মিনিটের সময়, সীমা মনে মনে ভাবে। ওরা কথা বলে না, তখন ভারী গরম, একটি ঘুমন্ত পাখী নিকটস্থ ঝোপে ডাক্‌ছে,—উভয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল।

একটু পরে ইতিয়েন প্রশ্ন করল,—আবার হেনরিয়েটকে স্বপ্ন দেখলে নাকি?

সীমা জবাব দেয়- কেন যে সে এই জবাব দিল তা সে নিজেই বোঝে না—বলে—হ্যাঁ আমার ওপর সে একটা কাজের ভার দিয়েছে। একথা বলা অবশ্য নির্বোধের কাজ হল; একথা বলা ওর উচিত হয়নি—এখন হয়ত ও জানতে চাইবে, আর ওর জানার অধিকার আছে, কিন্তু কোনমতেই সে কিছু বল্‌বে না। যাই হোক্‌ ইতিয়েন কিছু জান্‌তে চাইলো না; সে শুধু ওর পানে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর মুখে কিন্তু আগ্রহশীল মিত্রতার ছাপ। ও কোনো প্রশ্ন না করাতে সীমা কৃতজ্ঞতা বোধ করল। সেইখানে সীমা হতভম্ব হয়ে বসে থাকে, নিজের বুদ্ধিতে নিজে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। এর পর সে নিজের অবসাদের ঘোর কাটিয়ে উঠে পড়ে, বলে, "আর নয়, আমাকে এখন যেতেই হবে।"

ইতিয়েন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই গম্ভীর বন্ধুতার দৃষ্টি তার চোখে, বলে, "বড় খারাপ হবে কিন্তু, আজকের দিনটিতে অন্ততঃ তোমার সঙ্গে আমি আরো একটু কথা বলতে চাই।"

না, না, আর এক মুহূর্তও থাকতে তার সাহস হয় না, সহসা তার মাথায় একটা মতলব জাগে, বলে: "শোনো, ইতিয়েন, আমার তাড়া আছে, বাড়িতে বাইসিকলটা রেখে এসেছি, ভেবেছিলুম পথে ভিড়

থাকবে,--এখন কিন্তু মনে হয় তাড়াতাড়ি চাকায় চেপে যেতে পারব, তোমার সাইকেলটা ধার দিতে পারো ?"

সে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, তাতে কি !"

দুজনে পিছু হেঁটে স্বল্প পথ পার হয়ে ইতিয়েনের বাড়িতে আসে। সীমা অপেক্ষা করে, সবই বেশ সুষ্ঠুভাবে ঘটে যাচ্ছে, এখন একটা বাই-সিকল পাওয়া গেল, ইতিয়েন ভিন্ন আর কেউই এ বিষয় কিছু জানবে না। ইতিয়েন সাইকেলটা এনে দেয়, সীমা বলেঃ ধন্যবাদ, ইতিয়েন। আরো বেশী বলতে ইচ্ছা থাকলেও রসনা সংযত করতে হল। উভয়ে উভয়ের পানে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর সে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে পড়ে পাড়ি দেয়!

তরুণী, গম্ভীর ও সুখী সীমা তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য ছুটে চলেছে তার নির্ধারিত পথই যে প্রকৃত পথ এই বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

পথ সম্পূর্ণ জনহীন, তার বাঁ দিকে শাদা সীমারেখা, পথটিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে, প্রসপার খুড়োই চেষ্টা করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বড় রাস্তা এইভাবে জনশূন্য দেখতে বিশ্রী লাগে, অথচ ক' দন পূর্বেও লোকজন ও গাড়ি ঘোড়ায় পথটি বোঝাই ছিল। স্তব্ধ পথ ধূসর শাদা শ্মশানের মত পড়ে আছে। জার্মানদের প্রতীক্ষারত পথ। তাহলে জার্মানদের জন্যই প্রসপার খুড়ো গত বছর পথটি এভাবে মেরামত করেছিলেন।

সীমা একান্ত একাকী। কেউ তার এই বিপজ্জনক যাত্রা দেখেনি,—না, একজন প্রায় দেখেই ফেলেছিল, সে পেরী বাস্‌টিভ। সে নিশ্চয়ই তার জানলার ধারে জার্মানদের প্রতীক্ষায় রয়েছে—সেই মূর্তি সীমার মনে জাগে। স্থাণুর মতো নিস্পন্দ নিশ্চল ভাবে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, শোকে ক্রোধে ও নিষ্ফলতার সহিত অভিমানে পীড়িত বৃদ্ধের ক্ষুব্ধ মুখখানি মনে পড়ে সীমার। ও যখন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, তখন

নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ওকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর কাছে ও একটা ক্ষুদ্র কণামাত্র, এ সময় কে এত তাড়াতাড়ি পথ দিয়ে চলেছে বা কি হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

দিনটি গরম, কিন্তু এত জোরে চালিয়েও সীমার গরম বোধ হয় না। এইবার রাস্তা নীচে নেমেছে,—প্যাডেল না চালিয়ে সোজা নামা যায়,—সীমা সোজা হয়ে বসে। তার চারিদিকে অনন্ত স্তব্ধতা। একটা অসীম নীরবতা তাকে ঘিরে আছে। এই নির্জনতা, নিসর্গের এই সম্পূর্ণ শূন্যতা ওকে পীড়ন করে। তার মনে হয় সে যেন অনন্তকাল ধরে এইভাবে সাইকেল চড়ে আসছে ; মনে হয় এই যাত্রার আর যেন শেষ নেই, শেষ হবে না। তার মনে হয় পূর্বেও যেন এই অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, এই দ্রুত, নিস্তব্ধ ও উদ্দাম যাত্রা, উদ্দাম উদ্দেশ্যের পিছনে সে যেন পূর্বেও ছুটেছে।

স্বপ্ন ভাঙতে চায় না সীমা, এতটুকু অবিচলিত না হয়ে নিজের কাজ করে যেতে হবে! এই ওর এক-মাত্র কাজ। সমগ্র বিষয়টি অসীম যত্ন সহকারে ও ভেবেছে। কিছুদিন পূর্বে গ্যারেজে সামান্য আগুন ধরে গিছল, সেই সময় ড্রাইভাররা এই অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। বিরাট অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণ সম্বন্ধীয় আলোচনাও হয়েছিল, আর সীমা স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গীতে সমস্ত আলোচনাটুকুই শুনেছিল, সে সব কথা তার মনে আছে, সেই রজনীতে এই কথার ভিত্তিতেই সে তার কর্মপন্থা স্থির করেছিল। যে কথা পূর্বে দশ-বিশবার চিন্তা করেছে সেই কথাটাই পুনরায় তাড়াতাড়ি ভেবে নিল। পুনরায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চাবি ও দেশলাই অনুভব করে। অভাব শুধু একটা পাথরের টুকরোর, সেটুকু সে রাস্তা থেকেই সংগ্রহ করে নেবে। একটা পাথরের টুকরো পথ থেকে সে বেছে তুলে নিল। এখন ওর সব জিনিসই যোগাড় হয়ে গেছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি যেন শহর থেকে দূরে এই রকম বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত তা খুবই ভালো হয়েছে। কাছাকাছি বাড়ি ঘরও নেই, বিস্ফোরণে কারো ক্ষতি হবে না। সবই ঠিক সময় মত ঘটবে। নীচের তলায় যদি আগুন ধরিয়ে দেয়, তাহলে আর সময়মত কেউ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিতে পারবে না। অপরপক্ষে ট্রাক ও গ্যাসোলিন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হবার পূর্বেই সে নিরাপদ অঞ্চলে পালাতে পারবে।

পথ পুনরায় সমতল হয়ে এল, তারপর আবার চড়াই,—সীমাকে পরিশ্রম করতে হয় বেশী। এই সর্বপ্রথম দু'চারজন মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া গেল। কয়েকজন সৈনিক পথের ধারে গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। তাদের অতিক্রম করে যাওয়ার সময় কেউ কেউ চীৎকার করে বলে ওঠে—"এই যে মামসেল, এসোনা আমাদের কাছে. আসবে না? আমরা জার্মানদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি।" -তারা বোতল তুলে ধরে দেখায়। ওরা মাতাল হয়ে পড়ে আছে জার্মানদের অপেক্ষায়। সীমা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

সীমা আজ যে পথে এসে পৌছল এইখানেই প্ল্যানকার্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাইভেট রোড বেরিয়েছে। প্রবেশপথ এখনও চেন দিয়ে ঘেরা। সীমাও তার বাইসিকল বাধা পেয়ে ধাক্কা খায়—চাবি দেওয়া সদর দরজার সামনে এসে সে দাঁড়ায়, ঠিক সময়েই এসেচে যাহোক।

কেউ আর এখন ওকে থামাতে পারবে না। গ্যাসোলিন ও এই লোডিং ইয়ার্ড এখন ওর তাঁবে। জার্মানদের হাতে নয়। মরিস এ'বার ওর বাজী হেরে গেল।

বাইসিকলটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে ও পাঁচিল ডিঙিয়ে প্রাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোডিং ইয়ার্ড শূন্য, মৃতের মতো সাদা। এই বিশাল প্রান্তরে

একমাত্র জীবন্ত প্রাণী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বড্ডই বেয়াড়া ও হতাশা লাগে। অফিসের প্রবেশ-দ্বারে টাঙানো ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখে সীমা। নষ্ট করবার মত এতটুকু সময় নেই। বাকী কয়েকটি মুহূর্তের চূড়ান্ত সুযোগ নিতে হবে। উদ্দেশ্যের কথা ভিন্ন আর কিছুই ভাবার নেই। পরিকল্পনা অনুসারে ওর কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে।

পথ থেকে কুড়িয়ে আনা সেই পাথরের টুকরোটা জোর করে আঁকড়ে ধরে সীমা। তার পরে তাই দিয়ে প্রাঙ্গন থেকে অফিসে যাবার কাঁচের দরজাটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। এই তীব্র আওয়াজে ও নিজেই চমকে উঠে। কাঁচের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলে সে দরজার খিলটি খুলে দিয়ে ভিতরে ঢোকে। এই করতে হাতটা জখম হয়ে যায়। সামান্য আঘাত, একটু ছড়ে গেছে, ও কিছুই নয়। শুধু একটু বিরক্তি হল এই ভেবে এঃ দ্বারা ওর পায়জামায় দাগ লেগে গেল।

অফিসে যাবার সিঁড়িতে ওঠে সীমা। বিশ্রী পাথরের সিঁড়ি যেন সীমাহীন, ওর পা যেন সীসার মতো ভারী, প্রতি পদক্ষেপেই কষ্ট করে চলতে হয়।

অবশেষে ও ওপরে পৌছল।

সীমা তার পকেট থেকে চাবিটা বার করে। ওর সামনের দরজায় চাবি। প্রসপারের ব্যক্তিগত অফিসের চাবি। খুড়ো এটি নিজের হাতে বাড়ি নিয়ে যেতেন ও নিজের বিছানার তলায় রাখতেন।

সীমা সেখান থেকেই নিয়ে এসেছে।

সে দরজার চাবি খুলল। বদ্ধ হাওয়া, বাইরে গুমোট গরম। ঘরের স্তব্ধতা ওকে পীড়িত করে তোলে। সহসা ওর পরিকল্পিত কাজের দুঃসাহসিক ও নিষিদ্ধ প্রকৃতি ওকে একটা শারীরিক সামর্থ্য এনে দেয়। এই ঘরে ও দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই প্রসপার খুড়ো তাঁর চিঠিপত্র রেখে দেন যা অপরে দেখতে পায় না। সে অবৈধ ভাবে এই ঘরে

ঢুকেছে। সীমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সহসা সেও তাড়াতাড়ি এই ভঙ্গী কাটিয়ে ফেলে। সে আরো একটি চাবির সন্ধানে এখানে এসেছে। গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কের চাবি। সে জানত চাবিটি কোথায় থাকে। প্রসপার প্রায়ই তাকে চাবি দিতেন এবং তিনি চাবি ফেরৎ দিলে এইখানেই সে রেখে দিত। ওপরের দ্বিতীয় ড্রয়ারের ডান দিকে চাবিটা আছে। এ বিষয়ে সীমা নিশ্চিৎ। কিন্তু যদি তা না থাকে তবে কি হবে? এই অল্প সময়টুকু তার কাছে ভয়ঙ্কর উদ্বেগের কারণ।

ড্রয়ারটি খোলা হ'ল। চাবিটা তেমনই পড়ে রয়েছে।

সীমা চাবিটা তুলে নেয়। সেই শীতল ধাতব পদার্থ তার ঘর্মাক্ত হাতে মৃদু আনন্দদায়ক শিহরণ এনে দেয়।

অবশেষে অবশ্য তার মনে অস্বস্তি জাগে। তার যেন মনে হয় মাদামের শয়তানি ভরা কঠিন চোখদুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মৃদু ও কর্কশ গলায় বলছে "বৃথাই তোমায় আমি বুঝিয়েছি। তোমার ঔদ্ধত্ব রোধ করে তোমাকে কিছুতেই ঢিট করতে পারলাম না।"

না সীমা অবাধ্য হয়ে একাজ করছে না। তার এ কাজ করার হেতু যে সে সীমা প্লানকার্ড, পীয়র প্ল্যানকার্ডের মেয়ে।

বাকী অংশটুকু অতি সহজ এবং সরল। সীমা নীচে গ্যারেজে নেমে যায়। তেল মাখানো ন্যাকড়ার টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। সযত্নে ও নিখুঁত ভাবে সীমা সেগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। নীচের তলায় সিঁড়িতে আর গ্যারেজে এইভাবে ছড়িয়ে দিল। যেখানে গেলে আর আগুন সহজে নিভবে না সেখানে পৌছতে কিঞ্চিৎ দেরী হবে। কিন্তু সীমা এমনভাবে পথ ঠিক করেছে যে উজ্জ্বল দিবালোকে সহজে তা বোঝা যাবে না।

এরপর সীমা ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়। চাবি খুলে ফেলে ছোট্ট ঢাকনাটি তোলে, তারপর আর একটি। ঠোঁট বন্ধ করে থাকলেও নাক দিয়ে গ্যাসোলিনের সামান্য গন্ধ পাওয়া যায়।

এখন সবই তৈরী। অনেক কিছু করতে হবে। সীমা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তা করেছে। এখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই অনন্ত সময় লেগেছে এই কাজ করতে। হয়ত এক ঘণ্টারও বেশী। সীমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে মাত্র চার মিনিট সময় কেটেছে।

এখন শুধু প্রথম নেকড়াটি জ্বালতে হবে। সীমা আবার নীচের তলায় চলে আসে! হাতে তার দেশলাই। এখনো দেরী হয় নি। ওকে শুধু শহরে ফিরে যেতে হবে। কিছুই হয়ত হবে না। না কিছু হয়ত একটা হবে। জার্মানরা আসবে সে ওদের হাতের ভিতর গিয়ে পড়বে। সে হয়ত জার্মানদের এই ট্রাক ও গ্যাসোলিন দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

"এখন যদি নয়ত কখন? তুমি যদি না পারতে কে করবে!" শলাকা জ্বলে ওঠে। তৈলাক্ত নেকড়ায় আগুন ধরে যায়।

তার সেই কালো গভীর চোখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আগুনের গন্ধ নাকে আসে। ধোঁয়া ওঠে। সীমা তাকিয়ে দেখে আগুন আর একটি নেকড়াকে গ্রাস করছে।

কিন্তু এখনো হয়ত নিভিয়ে ফেলা শক্ত হবে না।

সীমা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কুণ্ঠিত তার গতি। সে পিছু হঠে; আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। নির্দিষ্ট গতিতে আগুন জ্বল্‌ছে, সীমা ধাপে ধাপে রেলিং ধরে সিঁড়িতে ওঠে, তারপর সহসা দৌড়োতে সুরু করে। গ্যারাজে এসে আবার দাঁড়ায়। কলঘরে গিয়ে হাতের ক্ষতটা ধুয়ে ফেলে। অভিজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে সীমা পায়জামায় রক্তের দাগ শুখিয়েছে কিনা দেখে। সামান্য দাগ, উত্তাপে ইতিমধ্যে

শুখিয়ে গিয়েছে। সীমা সেটা ঝেড়ে মুছে ফেলে। বেশ ভালো করে স্নান করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে সময় কই ?

সীমা লোডিং ইয়ার্ড পার হয়ে আসে। তারপর ইতিয়েনের সাইকেল চড়ে পাড়ি দেয়।

তার হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ। আগুন তার নির্ধারিত গতি নিয়েছে। প্রসপার খুড়োর নাম এখন গ্লানি-মুক্ত। মরিস এতক্ষণে তার বাজী হারল। গ্যাসোলিন আর ট্রাক জার্মানদের হাতে আর কোনোদিন পড়বে না।

ছয়

প্রত্যাশাভরা রাত

ঐদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পূর্বে মাদাম ও সীমা যথারীতি ব্লু রুমে ব'সিয়ে প্ল্যানকার্ডের জন্য অপেক্ষা করছিল। সীমা তার অস্বস্তিকর চেয়ারটিতে সোজা হয়ে বসেছিল। মাদাম তার কালো সিল্কের পোশাক পরেছেন, চুল পরিষ্কার করে বেঁধেছেন, আর চেয়ারে শরীরটি মর্যাদা-মণ্ডিত ভঙ্গীতে বিস্তার করে দিয়েছেন।

সীমা ভিলা মনরেপোয় ফিরে বাগানে ও রান্নাঘরে তার নিয়মিত কর্তব্য সম্পাদন করেছে। প্রসপার খুড়ো বাড়ি নেই। মাদাম ওকে জানিয়েছিলেন যে প্রসপার খুড়োর মূল অভিসন্ধি ছিল সেণ্ট মার্টিনে আত্মপ্রকাশ না করা। কিন্তু বিস্ফোরণ হবার পর সে সংবাদ সহ্য করতে না পেরে ভিলা মনরেপো ছেড়ে খুড়ো শহরে মোটর নিয়ে ছুটেছেন।

সীমা যখন একথা শুনলো তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তবু তার মনে হতাশা জাগে। প্রসপার খুড়ো যখন সংবাদটি শুনবেন তখন তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সীমার সেখানে উপস্থিত থাকার বাসনা ছিল। সেই মুহূর্তে ওর মুখে বিস্ময় ও আঘাতের চিহ্ন দেখার বড় বাসনা ছিল। ওঁর মুখে গোপন আনন্দটুকু দেখার জন্য সীমার মনে আকাঙ্খা ছিল। প্ল্যানকার্ড পরিবারের নামে যে কলঙ্ক পড়ল না এই কথাটি ভেবে হয়ত ওর মনে যে আঘাত লাগা সম্ভব তা কেটে যেতে পারে।

এখন শহরে হয়ত সম্পূর্ণ ঘটনাটি উনি শুনতে পাবেন। হয়ত

অনুমান করবেন যে সীমাই এই কাণ্ডটি করেছে। সংশয়াচ্ছন্ন আবেগে হয়ত উনি টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন। হয়ত তিনি ভাণ করবেন যে সীমার কাণ্ড-কারখানা কিছুই তাঁর জানা নেই। হয়ত মনে মনে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবেন ও তাকে আলতো আদর করবেন।

ঘরখানি শীতল, স্তব্ধ ও ধূসর হয়ে আছে। মাদাম শান্তভাবে আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন—কিন্তু সীমা নিশ্চিন্তরূপে বোঝে এই তূষ্ণীভাব বাহ্যিক। সীমা ভাবে, মাদাম কি তার শহর পরিক্রমার কাহিনী জানেন? তার সম্ভাবনা আছে। রাস্তায় চলাচল করা সহজ হয়েছে, মাদামের কোনো বন্ধুবান্ধব হয়ত সংবাদ নিয়ে আসবেন। মাদাম যা কেউ আশা করে না তাও জানতে পারেন।

মাদাম সহসা বলে উঠলেন—ভেবে দেখ, আমার ছেলে আজ তার প্রাইভেট অফিসের চাবি খুঁজে পেল না। পঁচিশ বছরের ভিতর এই প্রথম এরকম ঘটলো। হয়ত ফিলিপির সঙ্গে অফিসে তর্কাতর্কি করার সময় উত্তেজনাবশতঃ সে ভুলে রেখে এসেছে। কিন্তু ওর নিশ্চিত ধারণা যে চাবিটা ও সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল, এমন কি সকালেও তা নাকি দেখেছে।

সীমা এতটকু বিচলিত হল না, কোনো জবাবও দিল না। মুখখানিতে সারল্য বজায় রেখেছে, সে যে চঞ্চল হয়েছে তার চিহ্ন দেখালো না। ঘরখানি যে এমন আঁধার হয়ে আছে তার জন্য সে আনন্দ বোধ করল।

কিছু পরে মাদাম বল্লেন: রেডিয়োটা খুলে দাও। রেডিও চলছিল। দিজন স্টেশন। এখন নিশ্চয়ই জার্মানদের হাতে। রেডিও জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রগমনের সংবাদ পরিবেশন করছিল। ইংরেজ সৈন্যদের ধ্বংস সংবাদও পরিবেশিত হল। তারা নাকি ইংলণ্ডে পালাচ্ছে। তারপর জার্মান কর্তৃক সদ্য অধিকৃত বারগাণ্ডির অংশ বিশেষ সম্পর্কে নির্দেশনামাও প্রচারিত হল। সর্বপ্রকার সাধারণ যানবাহনের

চব্বিশঘণ্টার মত চলাচল বন্ধ থাকবে। উৎপাদন ও খাদ্য সম্বন্ধীয় সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও অনুরূপ আদেশ। রাত্রি থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত নাগরিকদের ঘরের বাইরে বার হওয়া নিষিদ্ধ। তারপর স্থানীয় সংবাদ শুরু হল। সেণ্ট মার্টিন থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে, প্ল্যানকার্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর সমস্ত ট্রাকশুদ্ধ কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অধিকৃত অঞ্চলের সেনাবাহিনী ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এ বিষয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন।

সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সীমা এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল, যে সে উত্তেজনাভরে উঠে দাঁড়াল—তার সংগ্রাম সার্থক হয়েছে, সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। ঠিক মুহূর্তেই সে কাজ করেছে। সে যে ঘরে একা নেই, মাদামও রয়েছেন তা সে ভুলে গেছে। তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, দুটি হাতে চেয়ারের হাতল ধরে আছে, সেইখানেই ও দাঁড়িয়ে রইল। অসীম আন্তরিকতা ও অপরিসীম আনন্দে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মাদাম স্থাণুর মতো বসে আছেন; কিন্তু নিস্পৃহতার ভাব রক্ষা করার চেষ্টা আর নেই। তিনি বলছেন—হা ভগবান! তাহলে এই কাণ্ড!—হা ভগবান! এই হ'ল!—তিনি এমনই হাঁফাতে শুরু করলেন যে সীমা ভীত হয়ে উঠল। সে মাদামের কাছে এগিয়ে এল, সাহায্য করার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সাহসে কুলায় না।

অতি ধীরে ধীরে মাদাম শান্ত হয়ে এলেন। কোনো কথা বলতে বা কোনো প্রশ্ন করতে সীমার সাহস হল না।

তিন মিনিট পরে মাদাম আত্মস্থ হয়ে উঠলেন। বল্লেন: আমার ছেলের বুদ্ধি আছে, সে ঠিক কাজই করেছে, এই অবস্থায় শহরে উপস্থিত থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাঁচ মিনিট পরে সীমার যা অতি পরিচিত, মাদামের সেই মূর্তি ফিরে

এল। একটু শ্লেষভরে তিনি বল্লেন: হয়ত টেলিফোনটা চালু আছে,—জার্মানদের দেখছি আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে ঝোঁক আছে। একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি—মঁসিয়ে পেরোঁকে ডাক।

সীমা টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, টেলিফোন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে! মাদাম যে খুব বিরক্ত হয়েছেন তা মনে হয় না, তিনি হুকুম করেন—জানলা বন্ধ করে দাও, আলো নিভিয়ে দাও। সীমা হুকুম মত কাজ করে। তারপর মাদাম সরবে চিন্তা করেন, জার্মানরা হুকুম দিয়েছে রাতে কেউ রাস্তায় যেন না বেরোয়। আমার ছেলে হুকুম তামিল করতে জানে। আজ আর তাকে বাড়িতে আশা করা যায় না, আমরা এখন খাওয়া শুরু করতে পারি। মাদাম মতিস্থির করেন।

সীমা খাবার পরিবেশন করল, উভয়ে আহার করলেন। সীমা জানত মাদাম তাঁর ছেলের জন্য উদ্বেগাকুল হয়ে আছেন, তার নিজের চিন্তাও প্রস্পার খুড়োকে ঘিরেই। জার্মানরা কি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে? যাই ঘটুক না কেন ওঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। ডেপুটি প্রিফেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদের সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, আর জার্মানরা যদি তা না বিশ্বাস করে তাহলে সীমা নিজে গিয়ে তাদের বলে দেবে যে সে স্বয়ং এই কাজ করেছে, স্বেচ্ছায় এবং কারো প্ররোচনায় নয়।

খুব সম্ভব ওরা প্রস্পার খুড়োকে গ্রেপ্তার করেছে, তাহলে হয়ত ওঁকে সেণ্ট্ মার্টিনের জেলখানায় আটক রেখেছে। এই কয়েদখানা বাল্যে তার মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে। স্কুলের অতি কাছে ছিল এই বন্দীশালা, তার সুমুখ দিয়ে অতি শঙ্কিতচিত্তে অথচ রহস্যজনক ভাবে আকৃষ্ট হয়ে ও চলে যেত। এই কয়েদখানার পাঁচিলের আড়ালে ভয়ঙ্কর ও কি দুঃসাহসী লোকেরা থাকত—দস্যু ও নরঘাতক গুইত্রিয়ো সম্পর্কেই ওর আতঙ্কটা বেশী ছিল। ফ্রেঞ্চভিলে বদলী হওয়ার পূর্বে

সে এখানেই থাকত। বহুবার সে ও হেনরিয়েট এই সেণ্ট্ মার্টিনের জেলখানা সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এই প্রাচীন বাড়ীটি সম্পর্কে ওর চাইতে হেনরিয়েটের আগ্রহ ছিল বেশী। ওরা এর আশপাশে ঘুরে বেড়াত যদি কোনোক্রমে সেই দুর্দান্ত দুবৃত্তিকে দেখতে পায় এই আশায়। প্রস্পার খুড়ো এই জেলে আটক হতে পারেন এই চিন্তায় সে আজ কাতর হয়ে পড়ল। জীবনের যা কিছু ভালো ও সম্মানজনক ব্যবহারে যিনি অভ্যস্ত তাঁর কষ্ট হবে দ্বিগুণ।

মাদাম এমন ভাবে টেবলে বসেছেন যেন কিছুই হয় নি। সারাদিনের ঘটনাবলী এমন কি প্রস্পার খুড়ো সম্পর্কেও তিনি কোনো কথা বল্লেন না। খুব সামান্যই তিনি খেলেন তবু খেলেন।

অনেক পরে, সীমা যখন স্যালাড তৈরী করছিল তখন চোখের ওপর চশমাটি তুলে ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে, প্রসঙ্গত বল্লেন: তুমি ত আজ শহরে গিছলে, না সীমা ?

এখন খুব বেশী বা খুব কম কথা বলা সম্পর্কে সীমাকে সতর্ক হতে হবে। তাই সে শুধু বলল: হ্যাঁ।

মাদাম বল্লেন: শহরে কি ব্যাপার চলছিল ?

সীমা স্যালাড্ তৈরী করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর বলে: শহর একেবারে ফাঁকা। সব বাড়িই বন্ধ—দু চারজন সৈনিক ছাড়া কারো সঙ্গেই দেখা হল না। শহরটা এতখানি ফাঁকা আর কোনোদিন দেখিনি। আমি ডেপুটি প্রিফেক্টরের কাছে গিছলাম, ওরা সবাই জার্মানদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। সবাই ছুটির দিনের পোশাক পরেছে। স্যাটালিনও ওখানে ছিলেন। তিনি তার মোটর আর সোফার নিয়ে একেবারে হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছেন। সীমা কথাগুলি বলল—পাছে তাকে বলতে বাধ্য না করা হয় এই ভেবে। স্যালাড্ তৈরী হয়ে গেল। সীমা কাঠের পাত্রটি টেবিলে রাখে।

মাদাম সোজাসুজি প্রশ্ন করে বলেন : যখন বিস্ফোরণ হয়েছিল তখনও কি তুমি শহরে ছিলে ?

সীমার মুখ রক্তিম হল না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দেয় : আমি তখন বাড়ির পথে।

মাদাম এক সেকেণ্ড নীরব রইলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন : তুমি কি আজ সেই নীল ডোরাকাটা জামা পরেছিলে ?

সীমা বলল : না। সীমা মাদামের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে : আমি আমার পায়জামা পরেছিলাম।

মাদাম মুখে কাঁটাটা তুলে ধরে তারপর বললেন : তুমি যদি বিনা হুকুমে শহরে না গিয়ে থাকতে না পারো, অন্ততঃ পোশাক আশাকগুলো একটু ভদ্র ধরনেরও করতে পারো। তুমি নিজেই ত বললে ডেপুটি প্রিফেক্টরের ওখানে সবাই রবিবারের পোশাক পরেছিল। এমন একটা দিনে পায়জামা পরা মানে অত্যন্ত অবাধ্যতা।

সীমা জবাব দেয় না।

মাদাম বলেন : শুনতে পাচ্ছ ? গলার স্বর না জড়িয়ে কথাগুলিতে জোর না দিয়েই তিনি বলেন।

সীমা বললে : আচ্ছা, মাদাম।

সীমা বাধ্যতার ভাণ করে। তার অন্তর কিন্তু বিজয়-গর্বে উল্লসিত। প্রসপার খুড়ো চিরদিনই সীমা ও মাদামের মধ্যে একটা গোপন সংঘর্ষের বস্তু। মাদাম চিরদিনই খুড়োর প্রকৃতিতে পীয়্যর প্ল্যানকার্ডের যেটুকু গন্ধ আছে তা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এখন নিজের কীর্তির ফলে সীমা খুড়োর ওপর এক অপরিহার্য সিদ্ধান্ত চাপিয়েছেন। এখন প্রসপার খুড়ো পীয়্যর প্ল্যানকার্ডের ভাই বলে পরিচয় দিতে পারবেন। সারা জগৎ জানবে যে খুড়ো প্ল্যানকার্ড পরিবারের একজন।

টেলিফোনের ঘণ্টা সরবে বেজে উঠল। উভয়েই সচকিত হয়ে উঠলো। মাদাম হুকুম করলেন—যাও গিয়ে জবাব দাও।

মাদামের দৃঢ় বাসনা টেলিফোনে জবাব দেন, কিন্তু তার ভয় হয় যদি কিছু অবান্তর কথা বলে ফেলেন। নিজেকে সংযত রেখে তাই সীমাকে নির্দেশ দেন—বোলো যে আমি শুয়ে পড়েছি, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল।

সীমা ডেপুটি প্রিফেক্টরকে বলল: মাদামকে যা বলার আছে আমাকে বলুন। ডেপুটি প্রিফেক্টর ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর বললেন: ওঁকে কোনোরকম চিন্তা করতে মানা কোরো, কোনও ভাবনা নেই, শুধু কারফিউ হয়েছে বলেই মঁসিয়ে প্ল্যানকাড বাড়ি যেতে পারলেন না।

তাঁর গভীর, গম্ভীর অথচ ভাঙা গলার আওয়াজ টেলিফোনে ভেসে এল।

সীমা জবাব দেয়—ধন্যবাদ মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফেক্ট। মাদাম কি উদ্বেগে সময় কাটাচ্ছেন সীমা তা অনুমান করে বলে মঁসিয়ে প্ল্যানকাড এখন কোথায় আছেন জানতে পারি?

ডেপুটি প্রিফেক্ট জবাব দেন—মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ড এখন আমার বাড়িতে। তারপর আবার ইতস্ততঃ করে সযত্নে কথা নির্বাচন করে বলেন—মাদামকে বোলো তাঁর এই নিদারুণ দুঃখে সকলেই গভীর বেদনা অনুভব করছে।

সীমা পুনরায় বলে—ধন্যবাদ, মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফেক্ট, মাদামকে আর কিছু বলার আছে?

ডেপুটি প্রিফেক্ট বল্লেন: মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ড সকাল হলেই সর্বাগ্রে বাড়ি ফিরবেন।

মাদাম বেরিয়ে হলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে দাঁড়াবার তাঁর শক্তি নেই। সীমা বোঝে কি ভাবে তাঁর মনের ভিতর দ্বন্দ্ব চলেছে।

নিজেই এসে টেলিফোন ধরবেন কিনা ভাবছেন। সীমা টেলিফোনে প্রশ্ন করে—মঁসিয়ে প্লানকার্ড কি স্বয়ং টেলিফোনে আসতে পারেন না?

ডেপুটি প্রিফেক্ট পুনরায় ইতঃস্তত: করেন। তারপর তাঁর সরকারী ভঙ্গীতে বলেন: না তা হয় না। তারপর যেন এই কঠোরতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই—গুড নাইট, মাই ডিয়ার। বলে রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

মাদাম তাঁর বিরাট মাংসল মুখখানি এগিয়ে আনেন। সীমা তাঁকে কোনোদিন এত অসহিষ্ণু দেখেনি। তার সমস্ত মুখখানি উদ্বেগাকুল প্রত্যাশায় কম্পমান। সীমা তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোনের আলোচনার সংবাদ দেয়। সব কথাগুলি যথাযথ বলতে হয়। মাদাম বারবার এক কথা প্রশ্ন করেন। "কিভাবে কথাগুলি বল্লেন?" বললে—"সবাই গভীর বেদনানুভব করছে? ঠিক এই কথা?" সীমা তাঁর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। সব কথাই তার মনে আছে, আর সব কথাগুলি ওজন করেন। মাদাম সীমার কাছে যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, সীমা মনে মনে সন্তানের জন্য মাদামের আন্তরিক আকুলতা উপলব্ধি করে। যদি নেহাৎই বোকামো না হত, তাহলে সে সব কথাই বলত, বলত—ভাববেন না, ওর কিছুই হবে না, আমিই একাজ করেছি, আর কাউকেই আমি তার জন্য ভুগতে দেব না।

মাদাম মঁসিয়ে কার্ডেলিয়র প্রেরিত সংবাদটুকু বিবেচনা করেন, আর শান্ত ও শ্রেষ্ঠত্বের খোলস পরে থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাঁর জীবনের যা সব চেয়ে প্রিয়তম সম্পদ তা হারাবার আশঙ্কায় বৃদ্ধার প্রাণে গভীর আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। সহসা তাঁর উদ্বেলিত ক্রোধ প্রকাশ হয়ে পড়ল একটু ঘোরালো হয়ে—ঐ ফিলিপে, ঐ বোকাটা!—নরমভাবে বললেও প্রচ্ছন্ন ক্রোধ প্রকাশ পেল। ও যদি সাবধানী হত বুঝতাম। ছেলেবেলা থেকেই ও ভীষণ ভীরু। তবে

আমাকে আরো একটু ত' বলতে পারত, একটু সোজাসুজি বললেই ত' হত। সবাই নিদারুণ বেদনানুভব করছে। তার মানেটা কি? ওর মানে অনেক কিছু হতে পারে, আবার কিছু না হতেও পারে। তার জন্য আমাকে টেলিফোন করার কি ছিল! আর জানো—সবাই আমার ছেলেকে ঘৃণা করে।—করুণভাবে নরম গলায় মাদাম বলেন—ওর কিছু হলে সবাই খুশি হয়। সবাই ওকে ঈর্ষা করে—যত সব ছোটলোক—নীচু নজর। হয়তো কোন ট্রাক ডাইভারের এই কাণ্ড--ওরা বলবে রাজনৈতিক কারণে একাজ করেছে। স্বদেশের জন্যে করেছে। আমি সবাইকেই কিন্তু জানি। আসলে ঘৃণা আর ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। যত সব ছোটলোকের ঈর্ষা থেকেই এই কাণ্ড ঘটলো—কারণ আমার ছেলে সবাই-এর চাইতে বড়ো। জীবনে সে উন্নতি করেছে। ওর সাফল্যে তারা ঈর্ষান্বিত, তাই আজ সুযোগ পাওয়া মাত্র এই ক্ষতিটা করেছে।

এখন তিনি অত্যন্ত নীচু গলায় কথা বলছেন কিন্তু মাঝে সুর অতি চড়া রেখেছেন, কণ্ঠস্বরে তিক্ততা অসীম।

আর কেমন শত্রুতা করে সমস্ত ব্যাপারটা ওরা ভেবে রেখেছিল—এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে—ওরাই চাবিটা চুরি করেছিল।

মাদাম এবার ভীষণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে সোজাসুজি তাকালেন—চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে। নিষ্ফল আক্রোশে উনি ফুলছেন।

সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে একটু আত্মস্থ হয়ে মাদাম তাঁর যথারীতি নম্র গলাতেই বললেন: আমার মনে হয় তুমি এখন ডিসগুলো ধুয়ে শুতে যেতে পারো - তবে তার আগে একটা সিগারেট দিয়ে যাও।

সীমা ওঁকে একটা দেশলাই দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দোরগোড়ায় গিয়ে পিছনে ফিরে তোষামোদের দৃষ্টিতে মাদামের পানে তাকায়।

ঢাকাহীন আলোর নীচে বিরাট দেহ নিয়ে উনি একা বসে আছেন—আর নীরবে ধূমপান করছেন।

সাত

প্রথম প্রতিক্রিয়া

প্রত্যুষ হতেই সীমা অসহিষ্ণুভাবে প্রস্‌পার খুড়োর প্রত্যাবর্তন আশা করেছিল, ডেপুটি প্রিফেক্ট বলেছিলেন, "সকাল হলেই সর্বপ্রথম উনি বাড়ি ফিরে যাবেন।" বেলা বেড়ে চলে। দশবার বাগানের যে অংশ থেকে রাস্তা দেখা যায় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু দশবারই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে।

গতকাল মাদাম এমনই করেছিলেন, আজ এখনও হয়ত তাই করছেন, সীমাও এখন ডেপুটি প্রিফেক্টের কথাগুলির ওজন বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রস্‌পার খুড়োর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মাদামের দুশ্চিন্তায় সে যোগ দিতে পারেনা; সীমা এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যে মঁসিয়ে কর্ডেলিয়ারের বাণী শূন্যগর্ভ সান্ত্বনার বাণী নয়। তার কাজ সম্পর্কে প্রস্‌পার খুড়োর মনোভাব কি সেই সংশয়টুকু তাকে পীড়িত করে তোলে। এই সন্দেহটুকুকে সে মাথা তুলতে দেয়না। সীমা একরকম নিশ্চিন্ত যে তার এই কাজ নিশ্চয়ই খুড়ো আন্তরিক আগ্রহে গ্রহণ করেছেন; মঁসিয়ে কর্ডেলিয়ারের ইঙ্গিতে প্রমাণ হ'ল যে সারা শহর ঘটনাটির সম্পর্কে যথোচিত বিচার করেছে এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝেছে। কিন্তু ভিলা মনরেপোর মনোভঙ্গীর সঙ্গে সারা শহরের মনোভাবের প্রভেদ আছে, মাদামের মৃদু অথচ কটু কথাগুলি সীমার কানে নিয়তই বাজছে। প্রসপার খুড়োর ওপর বিদ্বেষবশতই গ্যারাজে আগুন দেওয়া হয়েছে এই মিথ্যা অভিযোগ পীড়াদায়ক। মাদামের কথাগুলি যেন মাকড়সার মত সীমার বিশ্বাসের ওপর ঘুরে বেড়ায়।

অবশেষে টেলিফোন বেজে উঠলো। সীমা তখনই গিয়ে ধরল। হ্যাঁ, প্রস্‌পার খুড়োই বটে। তিনি অভিবাদন জানিয়ে বললেন: গুড্

মর্নিং। ভিলা মনরেপোর খবর কি—যেমন বরাবর বলে থাকেন তেমনই কথা কইলেন। সীমার মনে কষ্ট হল, সে আশা করেছিল তিনি অন্ততঃ কিছু অ-সাধারণ কথা তাকে বলবেন। তবে হয়ত জার্মানরা শুনে ফেলতে পারে এই ভেবে টেলিফোনে সোজাসুজি সব কথা বলা উচিত নয় মনে করেছেন। কয়েকটা মামুলী কথা বলে মাদামকে ডাকতে বললেন।

সীমা মাদামকে ডেকে দেয়। মাদাম ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছেন। বারন্দায় একপাশে দাঁড়িয়ে সীমা মাদামের জবাব শোনে। মাদাম হাঁ, না করে জবাব দিচ্ছেন, তাঁর কথা থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া আলাপও অতি সংক্ষিপ্ত। সীমার আশা ছিল মাদাম অন্ততঃ তাকে বলবেন, কিন্তু মাদাম নীরব থাকায় সে অবশেষে প্রশ্ন করে – খুড়ো ভালো আছেন ত'—? জবাবে মাদাম বললেন : হাঁ ভালো আছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পরও খুড়ো ফিরলেন না, সীমা যথারীতি শহরে বেরোবার জন্য তৈরী হল। সীমা জানত তার এই বাইরে যাওয়াটা মাদামের অভিপ্রেত নয়, তবে সেও গ্রাহ্য করে না। সে নীল রঙের ডোরাকাটা ছিটের জামা পরে ঝুড়ি আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শহরের প্রবেশ পথে পথরোধ করে একটা আড়াল সৃষ্টি করে জার্মান সেনারা পাহারা দিচ্ছে।

এই দৃশ্য সীমাকে আহত করলো। সীমা জানতো 'বসেরা' এখন এখানে আছে, হাজার বার সে মনে মনে ভেবেছে কেমন ওদের আকৃতি। কিন্তু এখন রক্তে মাংসে ওদের দেখে সে চমকে ওঠে, যেন নতুন ও অপ্রত্যাশিত কিছু দেখেছে। তবু জার্মান সৈন্যরা বয়সে তরুণ ও তেমন অনিষ্টকর নয়, মুখে উদাসীনতার ছাপ। তারা সীমার দিকে একটুও তাকালো না। পথচারীদের জন্য সামান্য পথ খোলা আছে, বিনা বাধায় তাদের সেখান দিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

সীমা আড়ষ্ট ভঙ্গীতে শহরের পথ ধরে চলে। চতুর্দিকে জার্মান সেনা। সীমার বোধশক্তি বলে এই হল রূঢ় বাস্তব, কিন্তু তার অন্তর কিছুতেই তা স্বীকার করতে চায় না। এই বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই তার মন থেকে যায় না। সত্যি কি ওরা ঐখানে বসে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে দুর্বোধ্য বর্বর ভাষায় কথা বলছে।

বিদেশীদের চরিত্র সম্পর্কে তার এতটুকু ধারণা ছিল না। সে শুধু আশা করেছিল অশুভ যা কিছু ঘটার সম্ভাবনা তার বাহ্যিক অশুভ আকৃতিতেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সীমার বিশ্বাস ছিল আক্রমণকারীদের নিষ্ঠুর মুখ ও বন্য ব্যবহারেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের প্রভেদ সহজেই বোঝা যাবে। কিন্তু অবস্থা মোটেই তা নয়। শত্রু-সৈন্যরা তরুণ, ফুর্তিবাজ ও উচ্চকণ্ঠ এই পর্যন্ত। সীমা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে সহজেই বুঝেছিল তবু তার মনে হল শত্রু সৈন্যরা অসহ্য রকমের উদ্ধত প্রকৃতির। তাদের উপস্থিতটুকু সীমার অন্তর বেদনা ও রাগে ভরে দেয়।

বসেরা বেশ আরামে আছে। হোটেলের সামনে পার্কে, কাফের মধ্যে তারা বেশ সহজ ভাবে বসে আছে, গরমের জন্য সার্টের বোতাম খুলে ফেলেছে,—ওরা উচ্চৈস্বরে কথা বলছে আর হাসছে - প্লাস সভিনির ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ছে। যে রকম সহজে স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে তারা রয়েছে যেন নিজেদের বাড়িতেই আছে, এই সহজ ভাবটাই সীমার কাছে চরম নৃশংসতা বলে মনে হয়।

আগের চাইতেও অনেক বেশী দোকান খুলেছে। সেণ্ট মার্টিনের অধিবাসীরা অবশ্য (যেটুকু তাদের দেখা গেল) অত্যন্ত ভীরু ভাবে পথে চলাফেরা করছে, চুপিচুপি কথা বলছে, অতি দ্রুতক্ষেপে বাড়ির দিকে চলেছে। নিজের দেশে যেন তারা পরবাসী। অতি পরিচিত ঘোরানো পার্বত্যপথে চলতে সীমারও আপনাকে বিদেশী বলে মনে হল। শুধু

শত্রুদের কাছেই সে পরদেশী নয়, সারা সেণ্ট মার্টিনের অধিবাসীদের কাছে সে অচেনা বিদেশী, তার কাজ, তার গোপন কথা ওরা জানে না। সত্যি, তার মনে হল স্বদেশবাসীরাও মনে মনে তাকে অপরিচিত মনে করছে, যেন অসাধারণ কিছু।

সে ইতিয়েনের বাড়ির পাশ দিয়ে গেল, ঐ কীর্তি করার পর অন্তরঙ্গদের কাছেও সীমা কোনো কথা বলেনি, ইতিয়েনের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে। সঙ্কেতের সুরে সে শিষ দেয়। সীমা ভাবে ও যেন বাড়ি থাকে। সীমা তার প্রতীক্ষায় থাকে। যেন সে একটা চূড়ান্ত রায়ের আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে ইতিয়েন এল।

তার সরল, তীক্ষ্ণ মুখে সব কিছু ভাবাবেগ পরিস্ফুট। বোকার মত তাকে স্বপ্নের কথা বলার পর সীমা এই রকমই অবশ্য আশা করেছিল। তাকে বলেছে বলে সীমার অনুতাপ হয়, তবে বলেছে বলেই ত এখন বেশ স্বচ্ছন্দে কথা বলা যাবে।

আগের দিন মত, যেন পূর্বপরিকল্পনানুসারে ওরা পার্ক স্থ কাপুসিনের দিকে এগিয়ে চলে। খেলার মাঠে কয়েকটি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, দুজন জার্মান তাদের খেলা দেখছে আর হাসছে। তার জন্য অবশ্য সীমা ও ইতিয়েনের বেঞ্চে বসে পড়ার কোনো বাধা রইলো না।

ইতিয়েন সীমার মুখের পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সশ্রদ্ধ আবেগে তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে, সে বলে—আমি বরাবরই জানি, গোড়া থেকেই জানি, তুমি একদিন একটা বিরাট কাণ্ড করে বসবে।

সীমার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। সে ঘামছে। এই অস্বস্তি-কর অবস্থায় কোন্‌দিকে তাকাবে ভেবে পায় না, তাই বেঞ্চে হেলান দিয়ে রাখা বাইসিকলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মনে মনে সীমা কিন্তু আনন্দ ও গর্বে ভরপুর। কিঞ্চিৎ বেয়াড়া ভাবেই সে বলে—তাহলে সত্যি, তোমার মতে আমার কাজটা ঠিকই হয়েছে?

আবেগভরে ইতিয়েন বলে ওঠে—ঠিক হয়েছে? অপূর্ব! অদ্ভুত! চমৎকার! তোমার বন্ধু বলে আজ আর আমার গর্বের সীমা নেই। তোমার স্বপ্ন অপরূপ!

সীমার মুখ রক্তিমতর হয়ে ওঠে। সে নীরব। কি জবাব দেবে! কিছুই ভেবে পায় না।

কিছুক্ষণ পরে নম্রভাবে মৃদু হেসে ইতিয়েন বলে,—সবাই কিন্তু জানে একাজ তোমারই।

সীমা চমকে ওঠে, প্রশ্ন করে, সে কি! কি করে তারা জানলো!

সে জবাব দেয়,—এ ত' স্পষ্ট কথা! তুমি ত' পারী প্ল্যানকার্ডের মেয়ে,—নয় কি না বলো!

সীমা বলে, কিন্তু কারো কি মনে হয় না, এটা প্রস্‌পার খুড়োর কীর্তি! ইতিয়েন সবিস্ময়ে বলে—মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ড! না—আমার মনে হয় না কেউ সে কথা ভাবে।

সীমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে ইতিয়েন। সে বলে, কেউ জানুক তা বুঝি তুমি চাওনা? কেন? আমার ত' মনে হয় সকলেরই জানা উচিত। তবে ঐ জার্মানদের সামনে অবশ্য তারা যে জানে তা বলা উচিত নয়।

সীমা একটু চিন্তা করে—ছেলেরা হট্টগোল করে খেলছে। সৈনিকরা চলে গেছে।

মনে মনে সেও তাই চাইছিল। সীমা বলল,—শোনো ইতিয়েন, তোমার কথাই ঠিক। সকলেরই জানা উচিত। তবে তারা যে জানে সে কথাটা অপ্রকাশ থাকাই প্রয়োজন। আমি নয়। আমার নাম

না হওয়াই উচিত। আমি সারা সময় শহরেই ছিলাম। সবাই আমাকে দেখেছে। আমি ডেপুটি প্রিফেক্টের অফিসে ছিলাম। আমার বাইসিকলও সেখানেই ছিল। বুঝলে?

ইতিয়েন সপ্রশংস কণ্ঠে বলল,—বাঃ তুমি দেখছি, সব কিছুই ভেবেছ নয়।

ওরা আবার শহরের ভিতর ফিরে চলে। সীমার মনে হয় সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। ওর মনে হয় যেন ওর গায়ে পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু তাতেও শান্তি আছে। সীমা যে এখন একা নয়, সঙ্গে ইতিয়েন আছে একথা ভেবেও সে খুশি। বেশ আত্ম-সচেতন হয়ে সে ইতিয়েনের সঙ্গে গল্প করছে।

ওরা প্লাস-সেণ্ট লাজারের পথ ধরে চলে। মরিস এলম গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চে বসে ছিল। সঙ্গে তার সেই লুইসন। সে চেঁচিয়ে বলে—, 'হ্যালো, সীমা, কি খবর? আজ আমাদের কাছে আসবেনা? নিশ্চয়ই দুচার কথা এখন বলা যায়।'

দ্বিধাভরে সীমা বলে,—কি জানি!

মরিস জবাবে বলে,—আমি জানি! তোমার বন্ধুটিকে এখন ছাড়ো। উনি না হয়ে আমার লুইসনকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসুন। সত্যি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ইতিয়েন বলল,—মঁসিয়ে, তার কণ্ঠস্বরে মৃদু তিরস্কার সুস্পষ্ট। মরিস বলে ওঠে,—ঘাবড়াবেন না মঁসিয়ে। আপনার সীমার কিছু সদুপদেশ প্রয়োজন। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

মরিস এভাবে হুকুম চালাচ্ছে ভেবে সীমা বিরক্ত হয়। অপর দিকে আবার এই ভেবে আনন্দ হয় যে এখানে অন্ততঃ এমন একটি প্রাণী আছে যে তার এই জটিল পরিস্থিতিতেও সহায়তা করতে চায়।

সে অনুনয়ের সুরে বলে,—ইতিয়েন ওঁর সঙ্গে একটু কথা কইতে দাও ভাই !

লুইসন উঠে দাঁড়িয়ে ওর পানে চেয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে হাসে।

সীমা তার দিকে তাকায় না। মরিসের পাশে বসে পড়ে। মরিস বলল,—'আবার আমরা একত্র হলাম।'

তারপর উভয়ে নীরব।

মরিস বলে, তারপর খুকী, বেশ একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ। একেবারে চেংড়ার উৎসাহ !

মরিসের কথায় তিক্ততার সুর। সীমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। মরিস আবার বলে, জানো, তোমার এই দেশপ্রেমের উচ্ছাসের দুর্ভোগ সর্বপ্রথম আমাকেই ভোগ করতে হ'ল। আমাকেই অপরাধী মনে কর'ছ।

সীমা বলল—সে কি! তা কেন হবে? ওরা কারা? মরিস জবাব দেয়, কারণটা তেমন স্পষ্ট নয়, আমাকে ডেপুটি প্রিফেক্টের অফিসে ডেকেছিল, ডিস্ট্রিক্ট এটর্ণী লেফেবর ফ্রেঞ্চেভিল থেকে এসেছিলেন, তা ছাড়া ম'সিয়ে জাভিয়ের ও আর একজন জার্মান অফিসরও ছিলেন। জার্মান অফিসারটি ত' আমাকে ইঁদুর মনে করেছিলেন হয়ত, অবশ্য ভাগ্যক্রমে তাঁর ফাঁদটি পাতেন নি।

সীমা বলে—তাহলে, সবাইকে ছেড়ে ওরা সত্যি তোমাকেই সন্দেহ করছে।

এই ব্যাপারে মরিস বেচারা এমন বিজড়িত হয়ে পড়েছে জেনে সীমার দুঃখ হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ভেবে মনে ক্ষীণ সান্ত্বনা জাগে যে মরিসও এখন সীমার কাজের ফলে কেমন জড়িয়ে পড়েছে।

মরিস বলে—তোমার কি ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? কিন্তু এমনই ত' হবে।

সীমা আগ্রহভরে দৃঢ়গলায় বলে—কিন্তু আমি তোমাকে এমন বিপদে ফেলতে চাইনি। ওরা যদি কিছু করত তোমায় ?

মরিস মন্তব্য করে—এটা তোমার অনুগ্রহ।

মরিসের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল তাতে সীমা অসন্তুষ্ট হল না। সীমা জানতে চায়—কিন্তু কি করে বেরিয়ে এলে !

মরিস বলল—তা বাজী রাখতে পারো, ব্যাপারটা ঠিক এনজোয়ান নয়। ওরা কি বলতে চায় জানিনা, আর কেউ বিপদে পড়ুক সে ইচ্ছাও আমার ছিল না। মিথ্যাকে ঘোরাতে আমার অনেক সময় লেগেছে। জার্মানরা মাত্র দুটি বিষয় জানতে চেয়েছিল। প্রথমতঃ—কাণ্ডটা ঘটেছে কখন ! কারণ ওরা এখানে এসে পৌছে ধ্বংসাত্মক ব্যাপারের শাস্তি ঠিক করার পূর্বেই যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে আইনতঃ তা দণ্ডনীয় নয়। ওরা কিন্তু ভেতরকার খবরটাই বেশী করে জানতে চায়। জানতে চায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে দেশপ্রেমিক কারা ! কারা ওদের গোপন শত্রু ! কোথায় তাদের পাওয়া যাবে ! এই সব খবরের প্রয়োজন বেশী। ওরা বেশ জটিল এবং কূট প্রশ্ন করছিল। প্রথমটা আমিও অনেক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছি। অবশেষে মঁসিয়ে জাভিয়ের আমাকে ঠিক পথ বাৎলে দিলেন।

অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে সীমা বলে, আচ্ছা ওদের জেরার ধরণ কি খুবই বেয়াড়া মরিস ?

মরিস বলল—অসতর্ক কথা বলে আমি অবশ্য কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না, তবে আমার নির্দোষীতা প্রমাণে বেশী বেগ পেতে হয়নি।

সীমা আন্তরিকতার সুরে বলে—তোমার যে কিছু করতে পারেনি তার জন্য আমি ভারি খুশি মরিস !

তারপর বলে,—"ওরা যে তোমার কিছু করতে পারেনি, তার জন্য আমি খুশি।" সেই সঙ্গে সগর্বে বলে—"কিন্তু তুমি বাজী হেরে গেছ।"

সবিস্ময়ে মরিস প্রশ্ন করে—"কিসের বাজী?" তারপর নিজের ভুল সংশোধন করে বলে,—"ও হ্যাঁ! তা দিয়ে দেব, যে কোন সময় আমার কাছে এসে তোমার মদ আর সিগারেট নিয়ে যেও। কিন্তু আমি শুধু ভদ্রলোক বলেই বাজীটা দিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমার কথাই ঠিক, তোমার কথাই ভুল।"

প্রতিবাদ করে সীমা বলে—"সে কি! তুমি ত' বলেছিলে প্রস্পার খুড়ো কখনই গ্যারাজ ছাড়বেন না।"

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে মরিস বলে—"তাই নাকি! তোমার খুড়ো এত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন! তুমি ওঁর অনুমতি নিয়েই কাজ করেছ?"

মরিসের ধূর্ত মুখে জটিল হাসির রেখা।

সীমা রেগেছে। নির্বোধের মত সে প্রতিবাদের সুরে বলে—"তুমি কি করে বলতে পারো একাণ্ড আমার করা?"

মরিস অট্টহাস্য করে ওঠে,—তারপর বলল, "জানো খুকী, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে এত বড় ছেলেমানুষী কাণ্ড করার মত আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। জানো ত' আরো অনেক উপায় ছিল,—অনেক সহজ উপায়। যেমন ধরো' পেট্রলে চিনি ঢেলে দিতে পারতে। সেটার প্রতিক্রিয়া অনেকদিন অবধি চলত। কিন্তু বুঝিনা যখন একথা মানতেই চাওনা তখন তুমি এই কাণ্ডটা কেন করতে গেলে। সমস্ত কাণ্ডটা কি, একটা হুঁসিয়ারী ছাড়া আর কি? না ভেবেছিলে মঁসিয়ে প্লানকার্ডের পেট্রল-গুদাম নষ্ট করে সমগ্র জার্মান বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবে?"

বেদনা নিবিড় নীরবতায় আকুল হয়ে রইল সীমা। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে শিশুর মত প্রশ্ন করল—"তাহলে আমার কাজটা কি অন্যায় হয়েছে মরিস?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মরিস তার দিকে তাকিয়ে রইল। সীমা একটু

বেয়াড়াভাবে চুপ করে বসে রইল। যেন ঠিকমত কাজ শেখার জন্য বিনীত ছাত্র গুরুর মুখের পা'ন তাকিয়ে আছে। মরিসের তূণে আর বাণ নেই। সে নিরস্ত্র। তার কণ্ঠে মানবিক উষ্ণতা, সে বলে—"অন্যায়? না ঠিক অন্যায় নয়। তবে সুবিধার চাইতে বিপদের পরিমাণ অনেক বেশী।"

এই সর্বপ্রথম মরিস তার সঙ্গে আন্তরিকতার সুরে প্রকৃত বন্ধুর মত কথা বলছে। সীমার মনে আনন্দ জাগে। ওর কাজটা ছেলেমানুষী বলেছে বা ওকে শিশুর মত মনে করছে বলে মরিসের ওপর তার এতটুকু অভিমান নেই। মরিসের বিচারশক্তি ও বিরাট জ্ঞানে সীমা বিশ্বাসী। যদিও তার কাজটা মরিস অনুমোদন করেনি তবু বিষয়টি সে বুঝেছে। এখন অন্ততঃ সীমা জানতে পেরেছে যে তার এই কাজে মরিসও উদ্বিগ্ন।

পুনরায় সে আলোচনা শুরু করে। সে বলে, "তোমার কি বিশ্বাস হয়, সব'াই ব্যাপারটা জানে, এমনকি জার্মানরা পর্যন্ত!"

"নিশ্চয়ই।" মরিস জবাব দেয়।

সীমা বলল—"আচ্ছা জার্মানরা যখন জানবে তারা এসে পৌঁছানোর আগেই ঘটনাটা ঘটেছে তখন হাঙ্গাম মিটবে। তাই না? তুমি ত' তাই বল্‌লে।"

মরিস বলল—"ঠিক তা বলিনি সীমা, প্রথমতঃ জার্মানরা যে কোনো সময় তাদের সুবিধানুসারে কেসটা তুলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান বিপদ জার্মানদের দিক থেকে আসচে না! আসচে অন্যদিক থেকে।"

তার মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকে সীমা।

উঁচু গলায় মরিস বলে ওঠে—"হা ভগবান! এতই তুমি ছেলেমানুষ! এত সরল! তুমি কি বুঝছ না এই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার বসেদের চাইতেও বেশী ক্ষেপিয়ে তুলেছে আমাদের স্বদেশী ফ্যাসিস্তদের?

স্ট্যাটালিন আর জো ব্লো কোনোদিন তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এরা কি কারণে জার্মানদের দেশে ঢুকতে দিয়েছে মনে কর? যা কিছু ওদের চোখে অন্তর্ঘাতি বলে মনে হয় তা দমন কবাই ওদের উদ্দেশ্য। আর তুমি কিনা দেশপ্রেমের খাতিরে ওদের ডিঙিয়ে ওদেরই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে? এত' রীতিমত বিদ্রোহ। বিশেষ করে আবার তুমি পীয়্যর প্লানকার্ডের মেয়ে এই ঘটনার নায়িকা। একেবারে লা কম্যুন। বিপ্লবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। দেখ, যুদ্ধ সবে শুরু হচ্ছে, এখন ভিলা মনরেপোয় আর গোলাপের বিছানা মিলবেনা।"

ওর এই ব্যঙ্গের পিছনে সীমা ওর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝে। উজ্জ্বল আলোয় একা বসে মাদাম ধূমপান করছেন, এই ছবি সীমার মনে ভেসে ওঠে। তার সারা অঙ্গে শীতল শিহরণ বয়ে যায়। মনে মনে সে বোঝে মরিসের কথাই ঠিক, যুদ্ধ সবে আরম্ভ হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। নিছক বিদ্বেষ আর ঘৃণার বসে মরিস এই সব কথা বলছে। চিরদিনই প্রসপার খুড়ো সম্পর্কে ও অবিচার করে। সে দৃঢ় গলায় বলে "তুমি যা বলছ সব ভুল। অন্ততঃ প্রসপার খুড়োর সম্বন্ধে একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি—তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না।"

মরিস ওর পানে তাকিয়ে শুধু হাসল, কাঁধ নেড়ে শুধু বলল—"বেশ ঐ আনন্দেই থাকো।"

সহসা সীমার ভঙ্গিমা পরিবর্তন হয়ে যায়, সে দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, —"কিন্তু যদি ওরা কিছু করে আমাকে, তাহ'লে মরিস তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না?"

মরিস হেসে বলল—"বড় মজার প্রশ্ন! একটা লরী ড্রাইভার সমগ্র জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমাকে কি সাহায্য করবে?"

সীমা নরম গলায় বলে—"কিন্তু তুমি যে বললে বিপদ জার্মানদের তরফ থেকে আসবে না?"

মরিস মৃদু হেসে বলল—"ওঃ এই কথা! তাহলে তুমি যতটা বোকা সেজে থাকো ততটা বোকা নও। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সাহায্য করব।" মরিসের কথার সুরটা সাধারণ বটে কিন্তু তাতে একটা দৃঢ়তার আমেজ আছে। সে বলে উঠল—"আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি জানবে।"

"ধন্যবাদ মরিস।" সীমা অসীম স্বস্তি অনুভব করে।

"এখন কিন্তু তুমি যাও।"

"কেন? যাব কেন?" সীমা মনে মনে ভাবে এখনও ত' বেশী বেলা হয়নি, তবু একথা বলছে কেন, আমাকে কি তাড়াতে চায়।

মরিস জবাব দেয়—"তুমি যা ভাবছ সময় যে তার চেয়ে একঘণ্টা বেড়ে গেছে, তাকি জানোনা? জার্মানরা এসে নতুন সময় বেঁধে দিয়েছে। ওদের সময়ের হিসাবে এখন যে একঘণ্টা আগেই সন্ধ্যা হয়।"

সীমা চুপ করে যায়। এখন তাহলে সেণ্ট মার্টিনে জার্মান সময় চলছে।

মরিসের কাছে বিদায় নেয়। শহরের ভিতর বাইসিকল নিয়ে চলার সময় সীমা বুঝলো সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ওর পিছনে কথা বলছে।

সীমা বাড়ি ফিরল। মরিস যে ওর বন্ধু তার জন্য আনন্দের অন্ত আর সীমা নেই। কিন্তু এই সম্পর্ক তেমন মধুর নয়। প্রসপার খুড়ো সম্পর্কে অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে সে কথা বলেছে। ওর কথা ঠিক নয়। সীমা চায় না ওর কথা ঠিক হোক।

ভিলা মনরেপোয় পৌঁছে সীমা দেখল প্রসপার খুড়োর হ্যাটটা টাঙানো রয়েছে। তাহলে উনি ফিরেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানা যাবে, সীমা বুঝবে মরিসের ধারণা কত ভুল। সীমা দেখল প্রসপার খুড়ো মাদামের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন, মাদামের

উপস্থিতিতে সে কথা বলতে চায় না। ওঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে হবে।

পোশাক বদলিয়ে সীমা প্রতিদিনের মত ডিনার তৈরী করতে লেগে যায়। প্রসপার খুড়োর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল সীমা। মাদাম রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন। সীমার রান্না পরীক্ষা করলেন মাদাম। তারপর যথারীতি ভদ্রতাভরে অথচ ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—"যে সব ঘটনা ঘটছে তার ফলে তোমার জন্যে কয়েকটা নিয়ম বেঁধে দিতে চাই সীমা। এখন কিছুদিন তুমি শহরে যাও আমার ছেলে তা চায় না। সুতরাং উপস্থিত কিছুদিন তোমার বাড়ি থেকে বেরোনোর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এখন কিছুকাল আমার এবং আমার ছেলের কিছু গোপনীয় আলোচনাও খাওয়ার সময় হবে। সুতরাং যতদিন কিছু না আর বলছি তুমি রান্নাঘরেই খানা খাবে, আমাদের সঙ্গে নয়।"

তৃতীয় খণ্ড

সিদ্ধি লাভ

এক

প্রসপার খুড়োর মুখ

সীমা বাগানে কাজ করছিল। তার পরণে একটি মোটা ওভারল আর মাথায় বড় স্ট্র হ্যাট। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তবু গরম খুব বেশী।

মাদাম তাকে প্রস্পার খুড়োর টেবল থেকে নির্বাসিত করে প্রকৃতপক্ষে বন্দিনী করার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। বহির্জগতের ঘটনার সঙ্গে এই সপ্তাহের সংযোগ নেই। সীমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি, কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি তাকে, কোনো অনুমতি দেয়নি তাকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার, তাকে শুধু অবহেলিত অবস্থায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। মাদাম শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশটুকু দিয়ে থাকেন, প্রসপার খুড়োকে মাদামের সঙ্গেই যা দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে গোপনে কোনো কথা কওয়ার সুযোগ নেই সীমার।

সীমা কিছুই খবর রাখেনা, শহরে বা দেশে কি ঘটছে কে জানে। কোনো সংবাদ যাতে সে না পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার সেই কাণ্ড সম্পর্কে সেণ্ট মার্টিনের লোকজনের কি মনোভাব সে খবরও তাকে দেওয়া হয়নি। গ্যারাজ ধ্বংসসংক্রান্ত তদন্তের কি ফলাফল হল কে জানে? তদন্তের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিছু? জার্মানরা কি প্রসপার খুড়োর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেছে। ওঁর কারখানা কি বাজেয়াপ্ত করেছে?

এই সংবাদ সম্পর্কে অন্ধকারে থাকা একরকম অসম্ভব। তার যে কি হতে পারে সীমা তা ভাবে কিন্তু কোনো কিছুই ভেবে পায় না।

একটি কথা অবশ্য সুনিশ্চিত, মাদাম তার শত্রু! মাদাম যে ওকে তিরস্কার করেন নি, অথচ একটা শীতল নীরবতার ভাব বজায় রেখেছেন

তার অর্থ এই যে তিনি মনে মনে একটা মতলব আঁটছেন সীমার বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রসপার খুড়ো, তাঁর কি খবর? মনোভাব গোপন করতে তিনি অপারক, স্পষ্ট কথা বলতেই ভালোবাসেন, তাতেই তাঁর রাগ প্রকাশের সুবিধা হয়। তিনিও মৌন থেকে কখন-সখন এক আধবার তার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে বিব্রত ভঙ্গীতে তাকান, সে সব নিশ্চয়ই মাদামের নির্দেশ, কখনই এ তাঁর নিজস্ব মনোভাব নয়। সীমার বক্তব্য না শুনেই যে খুড়ো মাদামের দলে ভীড়েছেন, এইটুকুই অতি দুঃখের কথা।

নিঃসঙ্গ নীরবতা ও বন্দীদশার এই সপ্তাহটিতে সীমার বয়স যেন আরো বেড়ে গেল, সে কঠিনতর হয়ে উঠল। বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে একটা হিসাব-নিকাশ করে নিজের ওপরই তাকে কতখানি নির্ভর করতে হবে তা স্থির করে নেন। সীমার বাসটিড, মঁসিয়ে জাভিয়ের, ইভিয়েন কেউ তাকে সাহায্য করার মত চতুর নয়, সীমার প্রতি তাদের ভালবাসা প্রবল বটে, তাদের প্রচেষ্টাও মহৎ হবে, কিন্তু তবু ওরা পারবে না। মরিস অবশ্য তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, তবু, কেউ যদি পারে ত' মরিসই তাকে সাহায্য করতে পারবে। সে কি চায় সীমা জানে, সে একটি খাঁটি পুরুষ। এলম গাছের ছায়ায় মরিসের পাশে বেঞ্চে বসে যে সব কথা শুনেছিল তাতে ওর বুক ফুলে উঠেছিল। দুঃখের কথা, সেই একবার মাত্র মরিসের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিল সীমা।

বাগানের পশ্চিম কোণের পাচিলের ধারে সীমা কাজ করছিল। পাহাড়ে জমির ওপর বাগানটি তৈরী, আয়তন বিরাট হলেও, বাড়ি থেকে বাগানটা বেশ দেখা যায়। পশ্চিম প্রান্তের এই কোণটি কিন্তু জানলা থেকে দেখা যায় না। অন্য সবখানেই, কি বাড়িতে, কি বাগানে সর্বত্রই মাদাম তার ওপর নজর রেখেছেন। বাগানের এই অঞ্চলটুকু

কিন্তু তাকে মাদামের চোখ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সারাদিন ধরে সীমা এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে, স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে কখন এইখানে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবে সেই কথা ভাবে।

প্রাচীর খুব উঁচু। কিন্তু পাথরটার ওপর উঠে দাঁড়ালে সীমা রাস্তার অনেকখানি দেখতে পাবে। নইরেট যাওয়ার সরু পার্বত্য পথ,—কদাচিৎ সে পথে কাউকে দেখা যায়। তবু সীমা বার বার পাথরটার ওপর উঠে দাঁড়ায়, হাত দিয়ে পাঁচিল আঁকড়ে ধরে, তার হাত লাল হয়ে যায়,—তবু সে পথের ওপর তাকিয়ে থাকে।

সীমা সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে পাঁচিল ধরে দাঁড়িয়ে দূর পথের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চিন্তাভরা গভীর মুখ প্রত্যাশায় কঠোর হয়ে উঠেছে। একটা চেনা মুখ, কোনো পরিচিত বন্ধুর দর্শন পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার মনে। তার কৃতকর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাই তার এই বন্দীদশার দুর্ভোগ সে অসীম ধৈর্যে সহ্য করছে। সবটাই কিন্তু এমনই নিঃসঙ্গভাবে সইতে হবে তা সে ভাবেনি। প্রতিদিন পাঁচিল ধরে দাঁড়িয়ে পরিচিত বন্ধুর দর্শন পাবে ভেবেছে। কেউ কিন্তু এলোনা। মাদাম কাউকেই কাছে আসতে দেন না। মাদাম তাকে সর্বদা পাহারা দিচ্ছেন।

মাদামই প্রসপার খুড়োর সঙ্গে কথা কইতে দিচ্ছেন না। মাদাম যদি প্রসপার খুড়ো সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতেন তাহলে কিন্তু এভাবে তাঁকে সীমার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করতেন না। মাদামের নিশ্চয়ই আশঙ্কা আছে যে এত শত ঘটলেও প্রসপার খুড়ো সীমার কাণ্ডটা বুঝেছেন, এমন কি তা সমর্থন করতেও পারেন। মরিস যা খুশি বলুক না কেন, প্রসপার খুড়ো কিন্তু সীমার শত্রু নন।

যখনই চোখে চোখ পড়ে প্রসপার খুড়োর রুষ্ট অথচ বিব্রত মুখ দেখা যায়। তিনি ওকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু শুধু সীমার জন্যই তিনি

এমন কাণ্ড করতে পারছেন। সীমাও দাম্ভিক; সীমা খুড়োর অবস্থা সহজ করে দিয়েছে। সীমা ভাবে ওর উচিত ছিল জোর করে তাঁর সঙ্গে কথা বলা, তাঁকে কোণঠাসা করা।

দীর্ঘ দেহা, কৃশ সীমা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। সেই বিবর্ণ পাজামা-পরা সীমাকে অত্যন্ত হতাশ দেখাচ্ছিল। তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটি নিবিড়ভাবে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। শূন্য পথের পানে কাঙাল নয়ন ঘুরে মরে। প্রসপার খুড়োকে আর এই ভাবে সে পাশ কাটিয়ে যেতে দেবে না। তাঁকে একটা জবাবদিহি করতেই হবে।

সীমা জানে মাদাম এখন ওপর তলায়। খুড়ো এখন 'ব্লুরুমে' বসে আছেন, খেয়ালভরে রেডিয়োর ডায়াল ঘোরাচ্ছেন। সীমার ওপর হুকুম কাজ না থাকলেও চিলে কোঠা ছাড়া আর কোথাও যেতে পারবে না। সীমা এই হুকুম আর মানবে না। পাজামা পরা অবস্থায় এই আকৃতি নিয়েই সে খুড়োর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ওকে দেখে খুড়ো তার দিকে সাবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

সীমা নির্ভয়ে বললে—"আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে!"

তিনি বিষাদভরে ওর মুখের পানে তাকালেন। তারপর বললেন—"কিন্তু আমি ত' তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না, তুমি—" এই পর্যন্ত বলে শেষের অপমানকর উক্তিটা চেপে গেলেন।

সে দৃঢ় গলায় বলে—"আপনাকে কথা বলতেই হবে। এভাবে এখানে থাকার চেয়ে আমি বরং জার্মানদের কাছে গিয়ে বলব আমিই করেছি।"

আরাম কেদারায় বসে খুড়ো সীমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সীমার মুখে সাহসের ছাপ; সে এখন সব করতে পারে।

খুড়ো বললেন—"যাই হোক, কি চাও এখন বলো ত'! ওরা যে

তোমাকে এসে ধরেনি তার জন্যই তোমার ঠাণ্ডা থাকা উচিত। এত সহজে ছাড়া পেয়েছ তার জন্যই সন্তুষ্ট থাক।" তারপর রাগে গলার স্বর আরো চড়িয়ে বললেন— "আমার চাবি চুরি করেছ! আমার গোপন দেরাজের চাবী! কি শঠতা! চোর! ঘরের শত্রু বিভীষণ! আমার ভাইয়ের মেয়ের এই কাজ!"

ওভাবে চাবি নিতে সীমাকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছে। স্বভাবতঃই সীমা যথেষ্ট সৎ প্রকৃতির, তা ছাড়া কে জানে আগুন লাগানো গর্হিত পাপ। কিন্তু সব ছেড়ে প্রসপার খুড়ো এই সামান্য একটা কথার ওপর জোর দেবেন এই কথা ভেবে সীমার মন ঘৃণাভরে রাগে ভরে যায়। সীমা কথার জবাব দেয় না, কিন্তু মুখও সরিয়ে নেয় না, খুড়ো অবশ্য সেই রকমটাই আশা করেছিলেন। এবং সে সোজাসুজি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইল, যেন এই সর্বপ্রথম তাঁকে দেখছে।

এ পর্যন্ত, এমন কি মাঝে মাঝে সে যখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তখন খুড়ো মহৎ হয়েই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার দৃঢ়, আশ্চর্য সামর্থ্যব্যঞ্জক মুখ শ্রদ্ধার বস্তু। এখন কিন্তু উনি অন্য কিছু। না এই মুখের সঙ্গে ওর মৃত পিতার মুখের মিল নেই। এই খুড়োর কোনো মহৎ কাজের শক্তি নেই। ভাবাবেগ বোঝার সামর্থ্য নেই খুড়োর। সীমার কাজের মধ্যে উনি চাবি চুরিটাই দেখলেন, আর কিছু পেলেন না। এই লোকটা নিজেকে নিয়ে কি লুকোচুরিই না খেলছে। এক সময় তিনি সীমার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তাকে উনি ভালবাসতেন। আরও অনেককেও সাহায্য করেছেন। এত বড় ব্যবসা ফেঁদেছেন। কিন্তু যখন একটা প্রকৃত অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখনই পরাজিত হয়েছেন। খুড়োর মুখটা মুখোস, - ওই মুখোসের ভিতর থেকেই দেখা যাচ্ছে খুড়ো অসার্থক।

খুড়ো প্রশ্ন করলেন—'আমার মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' সীমা জবাব দেয় না। কিন্তু খুড়ো হয়ত বুঝেছেন অপরাধ সম্পর্কে সীমার সঠিক কোনো ধারণা নেই। উলটে সে এসেছে অভিযোগ করতে, দাবী জানাতে। চাবির কথা আর উনি তুললেন না। বললেন,—"তোমার এখনও দেখছি আক্কেল হয়নি। কি করেছ তার ধারণা নেই। কয়েকটা গাড়ি শুধু নষ্ট করেছ তা নয়, তুমি আমার সারা জীবনের কঠোর সাধনা ধ্বংস করেছ।"

এ ঠিক মাথা মোটা বুড়োর কথা নয়। সীমা তবু শান্ত গলায় ওঁর মুখের পানে তাকিয়ে বলল—"আপনি ত' জানতেন পেট্রল আর গাড়ি জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। মসিয়ে কর্ডেলিয়র আপনাকে এই কথা বলেছিলেন। আপনিও বলেছিলেন যথাসময়ে যথা কর্তব্য করবেন।"

এসপার খুড়ো হাসলেন—"যথা সময়। সারেণ্ডার করার দু মিনিট আগেই কি সেই যথা সময়। তোমার কি ধারণা ছিল ওগুলো ধ্বংস করে শান্তি-চুক্তি রদ করতে পারবে!"

সারেণ্ডার! আর্মিসটিস! শান্তি! আত্মসমর্পণ! সীমার মুখ ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল।

খুড়ো বললেন—"অন্ধতেও বলতে পারে আর্মিসটিস ক'দিনের মামলা! ফিলিপে যা বলেছিল সে হ'ল তোতা পাখীর মত ওর ওপরওলা কলমবাজের বুলি আউড়েছে। এসব কথার গুরুত্ব সে বিচার করেনি। মা ঠিকই বলেছেন। সময়টা বড় খারাপ। যে সব লোক বেশী মূর্খ তারা ভাবে সব জানে আর আমাদের বাড়ির চালে আগুন লাগায়।"

সীমার কানে এ সব কথা পৌঁছয়নি। আর্মিসটিস! সারেণ্ডার! তাহ'লে—সব শেষ।

ইতিমধ্যে প্রসপার খুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে ভারী পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করছেন আর বলছেন—"তোমার একতিল বুদ্ধি নেই। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, প্লানকার্ডদের ব্যবসা তুমি চিরতরে নষ্ট করেছ।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠলেন—গলার স্বর অতি তীক্ষ্ণ—"অথচ সব কিছুই বেশ সহজে মিটে যেত, আর্মিসটিসটা খারাপ—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্শাল পেঁতা একজন মহাপুরুষ। জার্মানরা ওঁকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, তিনি আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। কাজ—স্বদেশ—আর পরিবার—এই তিনটি কথার আশ্রয়েই আমরা বাঁচব। মার্শাল যতকাল রাষ্ট্রের নায়ক ততকাল জার্মানদের সঙ্গে আমাদের ভালোই বনবে।

সীমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি বললেন, "আমরা মানে 'আমি' নই। আমার সঙ্গে জার্মানদের মিল হবে না। যদিও ওরা কিছু সুবিধা দিতে পারে—তবু তাদের নাকের ডগায় যে মানুষ কারবার জালিয়ে দিয়েছে তাকে ওরা সাহায্য করবে না। কেনই বা করবে!" ক্ষিপ্ত হয়ে খুড়ো কথাটা বললেন, "ওরা নিশ্চয়ই আমার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের দিকেই হাত বাড়াবে। ইতিমধ্যেই ডিজোনের ফুজিনে ব্রাদাররা নাকি আবেদন পাঠিয়েছে। এর পেছনে অবশ্য স্ট্যালিন আছেন। আমি যদি ওঁর মদ না বয়ে নিয়ে যাই, উনি নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন। শুধু চাওয়ার অপেক্ষা, উনি চাইলেই জার্মানরা অনুমতি দেবে। তখন আমার ড্রাইভাররাই ওঁর গাড়ি চালাবে, আমার তৈরী রাস্তাতেই ওঁর গাড়ি যাবে। তোমার কি ধারণা জার্মানদের ক্ষতি করেছ! তুমি সর্বনাশ করেছ আমার! আমাকে ধ্বংস করেছ। স্ট্যালিনকে সুযোগ দিয়েছ আমার ব্যবসাটি কেড়ে নেওয়ার। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।"

'সারেণ্ডার' কথাটি সীমার মনে প্রথমটা যে আঘাত এনেছিল ত র

থেকে সে এখন অনেক মুক্ত। মন দিয়ে সে খুড়োর বিলাপ শুনছিল, কিভাবে ব্যবসা ধ্বংস হল, কি তার ভবিষ্যৎ। সীমাও বোঝে সব। আঘাতটা খুড়োর কাছে প্রচণ্ড। তবু সীমা যা করেছে ভালোই করেছে। জার্মানরা যে ট্রাকগুলো পায়নি ভালোই হয়েছে। ওর কাজটা ঠিকই হয়েছে। সে বলল, "আমি অবশ্য কিছু করেছি, আপনি তা ভালো করেই জানেন।"

ব্যঙ্গভরে খুড়ো বললেন—"নিশ্চয়ই, তুমি ইঙ্গিত করেছ, আলো দেখিয়েছ, কিন্তু তোমার সে ইঙ্গিত কি কার্যকরী? তুমি আমাকে আর আমার ব্যবসাকে ধ্বংস করেছ, এ ছাড়া আর কিছু করোনি। মা ঠিকই বলেছেন। কেন যে পাগলের মত তোমাকে বাড়িতে রেখেছিলাম!"

সীমা ভালভাবে তার সর্বাঙ্গ দেখে বলল—"আমার ধারণা আমার বাবার খাতিরেই রেখেছিলেন।"

খুড়ো একটা ভীষণ জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, চেপে গেলেন। ক্রোধভরে বললেন—"তোমার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"তুমি কি জানোনা ব্যবসা ভিন্ন আমার বাঁচার রাস্তা নেই? আমি ব্যবসায়ী লোক। এছাড়া আর উপায় কি আছে আমার!" এবার নূতন উত্তেজনায়, কথা বলেন তিনি,—"কিছু লোক শিল্পী হয়ে জন্মায়, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার, আমি ব্যবসায়ী হয়েই জন্মেছি। জীবনে ঐ একটিই আমার জায়গা, পা থেকে মাথা অবধি আমি ব্যবসায়ী। ব্যবসাহীন জীবন আমি কল্পনাই করতে পারিনা।"

শূন্যগর্ভ কথা নয়। এ হ'ল স্বীকারোক্তি, সীমাও তাই মনে করে। প্রসপার খুড়ো কিভাবে ব্যবসায় লিপ্ত সীমা জানে। লোডিং ইয়ার্ড, প্রাইভেট অফিস, ব্যাঙ্ক একাউন্ট, মঁসিয়ে লা রোস, বুক কীপার মঁসিয়ে

পেক্স সব কিছুই খুড়োর দেহের অংশ বিশেষ। এছাড়া উনি বাঁচতে পারেন না। ব্যবসা ছাড়া উনি বাঁচবেন না।

সীমা আগেও তা জানত, তবু আজ যেন নতুন করে জানল। সে বলল—"একদিন জার্মানরা আবার চলে যাবে। হয়ত খুব শীগগির, তখন আপনি আপনার ব্যবসা আবার পাবেন। তখন প্লানকার্ডরা যে কর্তব্য করেছে তার প্রশংসা পাওয়া যাবে, জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছে।"

প্রসপার খুড়ো আবার ব্যঙ্গভরে বললেন, "একদিন জার্মানরা চলে যাবে। কবে? দুবছর না তিন বছর পরে? না পাঁচ! নিশ্চয়ই প্লানকার্ড কোম্পানী অন্য কারো হাতে যাওয়ার আগে নয়—তারপর আমি কি ভাবে সেটা আবার গড়ে তুলব! আমার মত ব্যবসার জন্য সব রকম সংযোগ প্রয়োজন। বহু ব্যাপারেই মাথা গলান চাই। বাসের কারবারে শুধু দেশপ্রেমিকতায় কাজ চলেনা।"

সীমা প্রশ্ন করে,—"আপনি কি জার্মানদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চান? আপনি কি জার্মানদের মাল, সৈন্য বহনের জন্য গাড়ি দিতেন? পেট্রল দিতেন?" খুড়ো নীরব।—সীমা আবার বলল—"আপনি বড় ব্যবসায়ী কিন্তু আপনি একজন ফরাসী।" তারপর ধীরে ধীরে বলে—"জার্মানরা যদি আমাদের ট্রাকে অস্ত্র বোঝাই করত, আমাদের পেট্রলে তাদের ট্যাঙ্ক ভর্তি করত—তাহলে কি করতাম আমি? দেয়াল থেকে বাবার ছবিটা মাটিতে টেনে ফেলে দিতাম।"

প্রসপার খুড়ো চুপ করে ঢোঁক গিললেন—বললেন,—"তোমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই।" তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দুই

নিদারুণ প্রতীক্ষা

সেই রাতে বিলে কুটীরীতে শুয়ে সীমা এই আলাপাচারের কথা স্মরণ করে।

সে আজ বিজয়িনী। রণে পরাজিত হয়ে প্রসপার খুড়ো ব্লু কানে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এই আনন্দ নেই। একথা সীমা অবশেষে বুঝেছে যে পীয়ার প্লানকার্ডের ভাই হিসাবে যে মর্যাদায় সে খুড়োকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, তা সে পারেনি।

এখন হয়ত উনি ওকে অনেক মিষ্টি কথা শোনাবেন - পুরোপুরি মাথামোটা মানুষ। সম্ভবতঃ মাদাম নিমেরেলস ফিরেছেন, খুড়ো তাঁর কাছে হয়ত পরামর্শ নিচ্ছেন।

তবু খুড়োকে মধ্যস্থ করে মাদাম আর ওর মধ্যে যে নীরব দ্বন্দ্ব চলেছে তার অবসান হতে অনেক দেরী। মাদাম তাকে বন্দিনী করে রেখেছেন, খুড়োর সঙ্গে কোনো কথা কইতে দেননা।—প্রসপার খুড়োর মন সীমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এত বিষাক্ত কথা দিয়েও মাদাম সীমার কাজকে অর্থহীন করে তুলতে পারেন নি। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ায় প্রসপার খুড়ো যতই চটে থাকুন, ও যখন আসল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে তখন তিনি কোনো জবাব দিতে পারেন নি। যে অপমানে সীমাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিলেন সেই অপমান নিজেই আকণ্ঠ পান করেছেন। সীমার চোখে তিনি অবশ্য আর তেমন মহৎ ব্যক্তি নন বটে তবু নরিসের ধারণানুযায়ী তিনি অতখানি ছোটলোকও নন।

মাদাম বহুবিধ বাঁধনে খুড়োকে বেঁধেছেন। ব্যবসা, সামাজিক মর্যাদা, ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট,- সবই মাদামের হাতে। সীমার আছে

শুধু পিতৃনাম আর তাঁর স্মৃতি। মাদাম কিন্তু একটা ভুল করেছেন। তিনি তার তূণ থেকে সব কটি শর নিক্ষেপ করেছেন। মাদাম তাকে সাধারণ দাসীর চোখে দেখেন, তাকে তিনি ঠেলে ফেলেছেন, এই একটি কারণেই সীমার উপস্থিতি খুড়োর কাছে অবিরাম তিরস্কারের আকার নিয়েছে।

অন্ধকারে শুয়ে আছে সীমা, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, ব্যাঙের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। সীমা মনকে প্রবোধ দেয় একই চিন্তায় বারবার পীড়িত হওয়া ঠিক নয়। ওর এখন ঘুমানো উচিত। মনকে বোঝায় সামনে এখন ভয়ঙ্কর দিন, উপস্থিত কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু খুড়োর সম্পর্কে তার আহত বিশ্বাসকে জোড়ার চেষ্টা করে। চোখে আর ঘুম আসে না।

অবশেষে আলোটা আবার জ্বালিয়ে জোন অব আর্কের সম্পর্কিত বইগুলি বার করে। অনেক ছবিওলা লাল বইটি বেছে নেয়। সীমার বান্ধবহীন জীবন এই গ্রন্থগুলির সাহচর্যে ধন্য হয়েছে, এই ত' তাদের সঙ্গে সংযোগ-সেতু। এই দুর্দিনে সে বার বার বই পড়েছে, পেয়েছে অসীম প্রেরণা, সান্ত্বনা, আর আশ্বাস।

আবার সে টান হয়ে শুয়ে পড়ে বই পড়ে। মাথার ওপর মৃত ন্যাপোলিয় আর তাঁর গ্রেণেডিয়ার দল, সেণ্ট মার্টিন আর সীমার মৃত পিতার ছবি টাঙানো রয়েছে।

সেই বছরের কথা পড়ছিল সীমা, জোন অব আর্কের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-গৌরবের রেইমে ডাফিনের অভিষেকের পরবর্তী দশমাসের কথা। সেই বছরই শেষের দিকে কম্পিনে অধিকৃত হয়। সে বছর এক হিসাবে কর্মচাঞ্চল্যহীন, কিছু সফলতা আর কিছু ব্যর্থতায় বছর কাটলো। এই বছরেই বন্ধুর ছদ্মবেশে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল জোন। আধো আলো আর আধো অন্ধকার কাল—নিষ্ফল চেষ্টার বছর।

ওরা রেইমে এসে পৌঁছল; সেই ওদের প্রথম সাফল্য। ডাফিন চার্লসের সম্রাট হিসাবে অভিষেক হল। এখন তিনি শান্তিতে থাকতে চান, সাফল্যের পরিপূর্ণ সুখ উপভোগ করতে চান। যদি আলস্য ও আরামে দিন কাটানো না যায় তবে রাজা হয়ে লাভটা কি হল? জোন কিন্তু চায় অভিযান চালিয়ে যেতে, সে তখনই যেতে চায়, আর বিলম্ব না করে পারী নিয়ে নিতে চায়! সোজাসুজি তাকে বাধা না দিলেও, জোনের সকল প্রচেষ্টাই অন্তর্ঘাতী চক্রান্তে নষ্ট করছেন, তার নানা অজুহাত, আর তিনি সংগ্রাম করতে চান না।

এই লোকটিকে জোন মুকুট পরিয়েছে, ওর জন্যই আজ সম্রাটের সব কিছু। লোকটি অবশ্য ওর শত্রু নন কিন্তু মিত্রও নন। বৈচিত্র্যহীন মানুষ, কাজে-কর্মে কেমন শিথিল ভাব! এমন একটি লোকের কাছে নিয়ত টিকটিক করে বলে জোন নিশ্চয়ই বিরক্তিকর, ও অস্বস্তিকর। সে ত' নিয়তই আক্রমণ করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে। উনি তাকে এড়িয়ে চলেছেন। একথা-ওকথা বলছেন, বলছেন এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি, মহালগ্নে উনি ঠিক আক্রমণ শুরু করবেন। হায়রে! সীমাও এসব ভালোই জানে।

ডাফিনের ছবিটা সে নিরীক্ষণ করে, লম্বা কোমল মুখ, মাথায় পালকের সাধারণ টুপি, লম্বা ভোঁতা নাক, চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়, ফাঁকা। বোকার মত ভ্রূযুগ! প্রকাণ্ড হাঁ,—তার মধ্যে পেটুকত্ব ও কামুকের লক্ষণ বিদ্যমান। চওড়া কান ওপর দিকে ছুঁচলো। সীমা পড়ে যায়— চার্লস অতি শৈশব থেকেই আদর ও আবদারে মানুষ। সমসাময়িকদের মতে সপ্তম চার্লস অতি ক্ষুদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিলেন।

অভিষেকের পরেই সম্রাট কি ভাবে শত্রুদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিলেন, সীমা পড়ে তার ইতিহাস। জোনের দুঃখ বেদনা ও ঘৃণা তাতে বেড়ে যায়। উনি শান্তির চেষ্টা করছিলেন, ব্যবস্থানুযায়ী

শান্তি-চুক্তির আয়োজন। প্রচণ্ড শত্রু ডিউক অব বার্গেণ্ডির সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিলেন শান্তির জন্য। বহু ফরাসী ধনী তাদের সম্রাটের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন—যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা যতই প্রবল থাকনা কেন, ওরা সবাই বিজয়ের চাইতে শান্তিচুক্তির দিকেই আগ্রহশীল ছিল বেশী। ডিউক অব বার্গেণ্ডি ওদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। চার্লস কিন্তু শান্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জোন অব আর্ক আর সেই সঙ্গে সীমাও বুঝতে পারেনা কেন এই সব ফরাসীরা ফ্রান্সের মঙ্গলের চেয়ে নিজেদের মঙ্গলের দিকেই অত ঝুঁকে ছিলেন।

সীমা পড়ে চলে জোন তবু সম্রাটকে বলে কয়ে প্যারী আক্রমণের একটা তোড়জোড় করে। ওরা জোনের সৈন্যদলের অধিকাংশকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ নয়, আর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল।

সীমা বইটা নামিয়ে রাখে। ফ্রান্সের এই সম্রাট কি ফরাসী ছিলেন না? সীমা খুড়োকে বলেছে "আপনি বড় ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু আপনি একজন ফরাসী।" প্রসপার খুড়ো যদি চার্লসের স্থানাভিষিক্ত হতেন তা হলে কি ব্রীজ ধ্বংস করতেন! না, তা অসম্ভব। যাতে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে হবে ফ্রান্সের জন্য—সে কাজ করতে তিনি নারাজ। তবে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যে কিছু করতে পারেন সে প্রশ্নই ওঠে না।

সীমা আবার বই পড়া শুরু করে। সীমা পড়ে জোন অব আর্ককে সম্রাটের দরবারে দেশের সঙ্কট-ত্রাণকারিণী হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছিল, যুদ্ধের ভার তার হাতে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে বন্দিনী।

জোন না জানি কত উদ্বেগই না সহেছে। গভীর দুঃখে সীমা পড়ে কিভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার নির্ধারিত সময় নষ্ট করতে হয়েছে।

অনেক শত্রু ছিল জোনের। রাজমাতা ইসাবো সংক্রান্ত গ্রন্থে

তার বৃত্তান্ত পড়ছিল সীমা। রাজা ও জোনের তিনি ছিলেন প্রবল শত্রু। সেণ্ট চেনিসের কেথিড্রালের সমাধি-ফলকে তাঁর যে মূর্তি দেখা গিয়েছিল তারই একটি ছবি এই গ্রন্থে রয়েছে। ব্যাভেরিয়ার রাজকন্যা ফ্রান্সের রাণী, এই প্রতিভাশালিনী লালসাময়ী ভয়ঙ্করা রমণীকে এমনই দেখতে ছিল। বহু সন্তানের জননী, বহু মানবের অঙ্কশায়িনী এই স্ত্রীলোকটি সারা জীবন অধিকতর ক্ষমতা, অধিকতর আনন্দ ও অধিকতর অর্থের সন্ধানে ঘুরেছেন। চওড়া মুখ, মসৃণ কপাল, ডাগর চোখ, উদার মুখমণ্ডল, সুদৃঢ় সোজা নাক। সীমা পড়ে যায়, এই রমণীটি তাঁর স্বামী অর্থাৎ জোনের ডাফিনের পিতাকে ভালোবাসতেন। অনেকগুলি সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যখন তিনি উন্মাদ হয়ে যান তখন রাণী তাঁর যত্ন নিয়েছেন, তাঁর কাছেই থাকতেন। সীমা পড়ে রাণী তাঁর স্বামীর ভাইয়ের ওপর আসক্ত হন—সেই মানুষটির রূপে অনেকেই আকৃষ্ট হত। প্রচুর বিলাস ব্যবস্থা ও পৃথিবীর সম্পদ না হলে রাণী ইসাবোর চলতো না, তাই তিনি তাঁর স্বামীর শত্রুর কাছে লোভের বশীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সীমা পড়ে যায় হাত থেকে ইসাবো তার সন্তানকে ফেরত চান, তখন সেই আনজুর আইলেয়ানথের কাছ থেকে জবাব এসেছিল, "তোমার ছেলেকে স্নেহ মমতা দিয়ে মানুষ করেছি তোমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে তার ভায়েদের মত হত্যা করতে বা তার বাপের মত পাগল করে দিতে বা তোমার নিজের মত ইংরেজ করে তুলতে নয়। ওকে আমি রাখলাম। যে স্ত্রীলোকের প্রেমিক রয়েছে তার সন্তানের প্রয়োজন কি? সাহস থাকে এসে নিয়ে যাও।"

পরে এই স্ত্রীলোকটি সরকারী কাগজপত্রে নির্লজ্জের মত তার এই পুত্র সম্বন্ধে লিখেছিল—এই তথাকথিত ডাফিন বিবাহ-বন্ধনে জাত সন্তান নয়। তার অবশিষ্ট জীবন তিনি ডাফিনের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সন্তানের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা আর সেই সঙ্গে লোভ ও লালসা বেড়ে গেছল। সীমা পড়ল একদা পরমা সুন্দরী এই রমণী দিনদিন মোটা হয়ে উঠলেন। মাদামের কথা মনে না করে সীমা পারে না। ঐ চেয়ারে বসে তাঁর স্বামী আর সং ছেলের—করছেন, যাদের তিনি পোষ মানাতে পারেননি তাদের ঔদ্ধত্যের জ্বালায় জ্বলছেন।

সীমা বিশদ বিবরণ পড়ে যায়—১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ, অপরাহ্ন তখন পাঁচটা। একটা বার্গেণ্ডীয় ডিভিসনকে হটাবার জন্য জোন অব আর্ক অল্পসংখ্যক সৈন্যের একটা বাহিনী নিয়ে চলেছেন। ধূসর অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে আছেন জোন অব আর্ক—পরণে তার স্বর্ণ রঞ্জিত রক্তাম্বর। বার্গেণ্ডীয় সেনারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিস্মিত। মনে হল এই অভিযান জয়যুক্ত হবে। কিন্তু সহসা বার্গেণ্ডীয়দের সাহায্য করার জন্য এলো আরো প্রবল সৈন্যদল—জোন ও তার সৈন্যবাহিনীর চাইতে সংখ্যায় তারা অনেক বেশী।

জোনের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করে, জোন কিন্তু কথার নড়চড় করতে রাজী নন। তিনি চীৎকার করেন · "ফরোয়ার্ড!" সৈন্যরা কিন্তু বলল: "যে যার সে তার"—তারা পালালো। কম্পিন শহরকে এই রণক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রয়েছে ওইস নদী, নদীর উপর শহরে যাওয়ার সেতু। অধিকাংশ পলায়মান সৈনিক সেতুর ওপর পৌছল, বাকী কিছু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অধিকাংশ শহরে আশ্রয় পেল। সবাই যখন নগর প্রাচীরের ভিতর চলে গেছে তখন কমাণ্ডাণ্ট গুইলায়ুম দ্য ফ্লাভি সেতু উঠিয়ে নিয়ে গেট বন্ধ করে দিলেন। জোন কিন্তু প্রাচীরের বাইরে—সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে।

পঠিত অংশটুকু চিন্তা করে সীমা। জোন বললো "ফরোয়ার্ড", সৈন্যদল বলে "যে যার সে তার"। সীমা আতঙ্কে শিউরে উঠল। কি করা ঠিক আর কি ঠিক নয় তা জেনে কি লাভ! কি লাভ "ফরোয়ার্ড"

বলে হেঁকে এগিয়ে গিয়ে আর কেউ যদি অনুসরণ না করে? সবাই বলে উঠল "যে যার সে তার" তারপর পালিয়ে গিয়ে সেতুটা উঠিয়ে নিল, জোন একা পড়ে রইল।

কম্যাণ্ডাণ্ট দ্য ফ্লাভি কেন সেতু উঠিয়ে নিয়ে গেট বন্ধ করে দিলেন সে বিষয় তিনখানি বিভিন্ন গ্রন্থে তিন রকম মত পাওয়া যায়। প্রথম গ্রন্থ বলে হয়ত সামরিক কারণ ছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থের মত—হয়ত কুমারী জোনকে ধ্বংস করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল। এরকম সন্দেহ করার কারণ আছে যে সুযোগ পাওয়ামাত্রই জোনকে বিনষ্ট করার জন্য হয়ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল। সোনার জলে বাঁধানো প্রাচীন বইটি কিন্তু শুধু লিখেছে—"কুমারী জোনের অসীম সাহস, সে সেতুর কাছে পৌঁছল। কিন্তু জোনের খ্যাতিতে ঈর্ষাকাতর নিষ্ঠুর ক্যাপ্টেন সেতু উঠিয়ে দিল।"

কারণ যাই হোক, জোন নগর-প্রাচীরের বাইরে পড়ে গেল। তার সঙ্গে জন বারো লোক – চতুর্দিক থেকে ইংরেজ আর বার্গেণ্ডীয়রা এসে তাকে ঘিরে ফেলল। একজন তার জামাটা টান দেয়, অপরে তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামায়। আর কোন আশা নেই,—জোন কিন্তু পদাতিক হিসাবেই লড়াই চালিয়ে যায়, অবশেষে সে পরাভূত হয়ে ধরা পড়ল।

তিন

মুক্তির ডাক

পরণে ছিন্ন ওভারঅল, বাগানের কাজ করে নেওয়া হয়ে গেছে, মাথায় ‘কাণ্ড স্ট্র-হ্যাট, সীমা পাঁচিলের ধারে উঁচু টিলাটায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। গত কয়েক দিন ধরে সীমা এই কার্য করছে তার কারণ সে কিছুই হারাতে দিতে চায় না, এটা তার কর্তব্যবোধের ফল। সীমার আর আশা নেই যে কোনো বন্ধু এই সময় এই পথে আসবে।

অনেক দূরে, শহরের দিক থেকে, কি যেন আসছে; একজন বাইসিকল চড়ে এদিকে আসছে, তাই মনে হল। তৎক্ষণাৎ তার ক্ষীণ আশা প্রবলতর হয়ে ওঠে। সীমা মনে মনে ভাবে এই লোকটি যেন তারই লোক হয়। সাইকেলওলা আরো কাছে এল, এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সীমার নিশ্চিত মনে হয় এ কোনো বন্ধু-জন। সীমার মনোবাসনা এতই প্রবল যে অন্য কিছু হতেই পারে না।

সাইকেলারোহী অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে; পথ ও সময় তার গতিবেগে মিলিয়ে যায়। পাঁচিলের কাছে এসে লোকটা নেমে সোজাসুজি ওপরে উঠে আসছে, এক হাতে সাইকেল ধরে আছে, আর হাতে হাঁটুটা ধরে আছে। লোকটা বললে···“এই যে আমি এসেছি ”

আনন্দ ও উত্তেজনায় সীমা আত্মহারা, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে—গলা থেকে কিন্তু একটা কর্কশ ঘড ঘড শব্দ বেরোয়। সেই পাথরের টিলায় দাঁড়িয়ে আছে সীমা। দেয়ালের ধার পর্যন্ত বাহু বিস্তার করেছে সীমা। উঁচু পাঁচিল, শুধু ওর মুখটা বাইরে থেকে দেখা যায়। মুখে তার মনের আবেগ ফেটে পড়ছে,— আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখে ছেলেটি বলে—"বড় অসুবিধা হচ্ছে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে না ? আমি কি কাছে যাবো না ? না তুমি নেমে আসতে পারো ?—আমরা দুজনে একত্রে ধরা পড়লে বিপদ হতে পারে—না ?"

ইতস্ততঃ করে সীমা! নিশ্চয়ই বিপজ্জনক! তবু ওর সঙ্গে সীমার কথা বলতেই হবে, সময় অতি কম। নয়ত ওরা সত্যই ধরা পড়বে। এত বেশী কথা জিজ্ঞেস করার আছে। কোথা থেকেই বা সে শুরু করবে ? তাছাড়া এভাবে আসার জন্য সীমা যে ওর কাছে কত কৃতজ্ঞ, কত খুশি তাও বলতে হবে। কিন্তু এই অবস্থায় কি করে কথা বলবে, দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে শুধু মুখটুকু বার করে কথা,—ওর হাত দুটি ইতিমধ্যেই অবশ হয়ে এসেছে।

কিন্তু এত সব ভেবে শেষ করার আগেই ছেলেটা ওপরে উঠে এসেছে। একেবারে এসে পাঁচিলের ওপর বসে পড়েছে। পা দুটো বাইরে ঝুলছে, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে, পালাতে পারে। এখন ওর হাসিমাখা মুখ সীমার মুখোমুখি—এখন ওরা কথা বলতে পারবে।

সীমা ভালো ভাবেই জানে ঝলঝলে ওভারঅল আর এই স্কু-হ্যাট পরে মানুষের সামনে বেরোন যায় না। দেখাচ্ছেও বিশ্রী, গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে, মুখে নেই মাধুরী। শেষে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে সেই সেণ্ট মার্টিনে ঠিক সংঘাতের আগে আর পরে—তখন ওকে আরো ভালো দেখতে ছিল, আরো প্রাণবন্ত। এখন আয়নার সামনে গেলেই নিজের কঠিন রুক্ষ চিন্তাক্লান্ত মূর্তি দেখে সীমা শিউরে ওঠে। আরো যেন বয়স বেড়ে গেছে, আরো কুৎসিৎ হয়েছে তার মুখ।

ছেলেটি হাসে। দেয়ালের ওপর বসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর মেয়েটি সেই পাথরে-টিলার ওপর বেয়াড়া ভাবে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে, সবই কেমন বিশ্রি ও অদ্ভুত।

ছেলেটি বলে—"তারপর, বোকা মেয়ে!" কিন্তু গলার স্বর আরো বন্ধুত্বপূর্ণ। "কেমন, আমি তোমাকে বলিনি, একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছ! এখন ত' ফাঁদে পড়েছ, কে তোমাকে বাঁচাবে? মরিস ছাড়া আর কোন মিঞা আছে?" তারপর তার কাহিনী শুরু হয়। সেণ্ট মার্টিনে ওর অবস্থা কাহিল। জার্মানরা দীর্ঘদিন থাকার বন্দোবস্ত করছে, এখন কিছুকালের মধ্যে শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপর আহ্লাদভরে বলে ওঠে—"আমার কথা আবার ঠিক হল,—নাৎসী আর আমাদের স্বদেশী ফ্যাসিস্তদের মিতালীর গাঁটছড়া ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে; নেকড়েরা পরস্পরকে না গিলে এখন শুধু গর্জন করছে। আমি আবার তিন বোতল পেনরদ মদ বাজী রাখছি এই আর্মিস্‌টিস এখন অনেকদিন চলবে; আর আমার নিজের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে।" তারপর সংক্ষেপে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, "এখানে আর আমার কাজ কি, আমি পালাচ্ছি। অনধিকৃত অঞ্চলে চলে যাবো, সেখান থেকে এলজিয়ার্সে। ঐখানেই হয়ত সংগ্রাম চালু রাখা সম্ভব হবে।"

ওর কণ্ঠস্বর শোনে সীমা, যদিও তা তেমন মধুর নয় তবু তার মধ্যে যে সুর আছে তা প্রাণে উৎসাহ জাগায়। যে কথা মরিস এখন বলল তা অবশ্য প্রচণ্ড আঘাতের মত বাজছে, ও যদি আলজিয়ার্স যায় তাহলে সীমা একা পড়ে যাবে। নিজেকে সহসা এমনই দুর্বল মনে হয় তার যে পাঁচিলটা আরো চেপে ধরে।

মরিস সেটা বুঝতে পারে, সে বলে, "বেশ আরাম করে দাঁড়াও মামজেল, অসুবিধে হচ্ছে না? ওরা আর তোমার কি ক্ষতি করবে? কি আর বাকী আছে?" এই বলে বাড়ির দিকে আঙুল দেখায় মরিস।

সোজা পাঁচিলের ভেতর লাফিয়ে পড়ে মরিস একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে বলে, "নেমে এস মামজেল, ভালো হয়ে এখানে বসো, কয়েকটা কথা বলার আছে।"

বিনীত ভাবে পাঁচিল থেকে সরে এসে ওর পাশের জায়গাটিতে বসে পড়ে সীমা। ওর মাথা থেকে সেই প্রকাণ্ড স্ট্র হ্যাটটা খুলে নিয়ে মরিস বলে, "তারপর ?"

"হঠাৎ লড়ায়ের খেয়াল হ'ল যে ?" সীমার গলার স্বর আগের মত তেমন সুদৃঢ় নয়। "এখন ত সব প্রায় ঠাণ্ডা, প্রথমটায় কিছুই করতে চাওনি, এখন হঠাৎ এত উৎসাহ ?"

অসহিষ্ণুভাবে মরিস বলে, "এত জলের মত সহজ কথা! প্রথমটা এই যুদ্ধ আমাদের ছিল না, এখন এটা জনযুদ্ধ। তখন জানতাম আমাদের ফ্যাসিস্তরা আমাদের মালমসলা সমেত জার্মানদের হাতে তুলে দিতে চায়। এখন সব বদলে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্র এখন সহজ, ফ্রান্সের যে নিরেট বোকা সেও জানে কে ফ্রান্সের শত্রু। কাজ, পরিবার, মাতৃভূমি, নাৎসীরা, ভার্হ্বেনের পরাজয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন সেই পেতা আর সব কটি ফরাসী ফ্যাসিস্ত একদিকে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা আর সারা পৃথিবীর ফ্যাসি-বিরোধীরা অপর দিকে।"

সীমা সব শোনে, সবটা হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু ঠিক অনুভব করে না। একটি কথা সে বোঝে, ও বলে যাচ্ছে। অতি নরম গলায় সে প্রশ্ন করে, "তুমি কবে যাচ্ছ মরিস ?"

"কাল! কাল রাতে যাচ্ছি। তাই ত' আজ এলাম। আমি পালাবার আগে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে চাই।"

কাল! কি ভয়ানক! সীমা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাল, তাহলে কাল থেকে সে একা। চেষ্টা করে সীমা প্রশ্ন করে, "আর কারো সঙ্গে দেখা করেছ ?"

সে মধুর হেসে বলে, "অর্থাৎ তোমার সেই ছোকরা বন্ধু ইতিয়েন ? ওকে আবার চাটিলোঁয় পাঠিয়েছে ওরা। দেশে এখন কড়া নিয়মানুবর্তিতা। দাস ব্যবসায়ীরা চাবুক হাঁকাচ্ছে, জার্মানদের ট্যাঙ্ক ওদের

সাহসী করে তুলেছে। ওঃ তাছাড়া তোমার সেই দপ্তরী বন্ধু পাগলা বুড়ো পেরী বাসটিড আছে। সেও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। সে ত বুক ফুলিয়ে এসে হাজির, ভাবখানা যেন সে সব বুঝেছে। এখানে এসে তোমার কথা বলে, বলে কয়েকটা বই পড়তে দিয়েছিল ফেরৎ চায়, ওঁরা দুঃখিতচিত্তে বলেছেন তুমি নাকি এখানে নেই। তাকে ভেতরেই ঢুকতে দেয়নি। ডেপুটি প্রিফেক্টরের তোমার সেই বন্ধুর কপালেও এর চেয়ে ভালো কিছু জোটেনি। তখন আমি চেষ্টা লাগালাম। হিসাব করে দেখলাম মামজেল যখন বাগানে কাজ করবেন তখনই বরং দেখা করার সুযোগ মিলবে,—তখন অন্ততঃ মাথামোটা বুড়ো তাড়াতে পারবে না।"

সীমা খুশি মনে হাসে। বরাবর আসল জায়গাতেই ও ঘা দেয়। সীমা অভিভূত হয়ে পড়েছে। একথা সে ভেবে আনন্দিত যে এমন বন্ধু আছে যাঁরা তাকে সাহায্য করার জন্য উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে—আর সব চেয়ে বড় কথা ওকে না বলে মরিস যেতে পারছে না।

মরিস একটা সিগারেট ধরায় তারপর বলে: "শোনো তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। তোমার অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠছে বোধকরি। ডেপুটি প্রিফেক্টরের তোমার সেই বন্ধুটিরও এই মত।" তারপর মরিস স্বভাবসিদ্ধ ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট ভঙ্গীতে পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করে। অসামরিক পরিবাহন বিভাগ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। মাত্র দুটি বাস আছে সেণ্ট মার্টিনে যাতায়াত করার। তার মধ্যে একটা মরিস চালায়। ডেপুটি প্রিফেক্টর চেষ্টা করবেন প্লানকার্ড কোম্পানীকেই যানবাহন ব্যবস্থা সংগঠনের ভার দেবেন। জার্মানরাও মঁসিয়ে প্লানকার্ডের দক্ষতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তারা ওঁকে বিশ্বাস করে না, তাই ওর ব্যবসাপত্র বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। মঁসিয়ে প্লানকার্ডের জন্য যদি কিছু করা যায় তা স্যাটালিনই পারে। জার্মানদের

ওপর স্ট্যালিনের খুব প্রভাব। এসব কথা মরিস মঁসিয়ে জাভিয়েরের কাছে শুনেছে।

সীমা মন দিয়ে শোনে সব। মরিস বলে যায়, এই অবস্থায় সীমা সম্পর্কে 'মাথামোটা' বুড়োর কী যে মনোভাব তা মরিস কিছুটা বোঝে। সে মোটামুটি একটা সমাধান ঠিক করে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত স্ট্যালিনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জার্মানদের সঙ্গে মাখামাখি করছেন, লোকটি চালাক, তাই আরো দুচারজনকে দলে টানতে চান, অন্ততঃ যতক্ষণ না জার্মানদের সঙ্গে ওঁর সহযোগিতার ইচ্ছাটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ ওরা ঐ মাথামোটা প্লানকার্ডের কারবার সম্বন্ধে ফিরিয়ে দেবেনা। মরিস প্রশ্ন করে "ব্যাপারটা বুঝছ? না মাথায় ঢুকছে না?" মরিস আবার বলে, "আচ্ছা মাথামোটা কিভাবে ওর সহযোগিতায় সদিচ্ছা প্রমাণ করতে পারে? সব চেয়ে ভালো হল পীয়ার প্লানকার্ডের মেয়েকে অস্বীকার করে ত্যাগ করা, বোকা, বিদ্রোহী, দেশপ্রেমিকা। ওকে যদি সরিয়ে দেয়, যদি উনি ফ্যাসিস্টদের দলে ভীড়ে যান তাহলেই ওঁর সহযোগিতার সদিচ্ছা প্রমাণিত হবে। সুতরাং উনি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেবেন।"

যতক্ষণ মরিস ব্যবসা সম্পর্কে তার এই সব সিদ্ধান্তের কথা বলে যাচ্ছিল ততক্ষণ সীমা নীরবে শুনেছে বেশ শান্তভাবে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছে। কিন্তু এখন যখন ওর মুখে এই নোংরা কথা শুনলো তখন আর যুক্তির কোনো বালাই নেই। সে নিজেই যে খুড়োকে অবিশ্বাস করেছে মনে মনে সে কথা ভুলে গেল। আবার ওর মনে প্রসপার খুড়ো ওর বাবা পীয়ার প্লানকার্ডের ভাই হিসাবেই ফুটে উঠেছেন, আর মরিস হয়েছে লোডিং ইয়ার্ডের সেই দুষ্ট, হিংসুক লোকটা। প্রসপার খুড়োকে কলঙ্কিত করার জন্য যে কথা ও বানিয়েছে তা বিষাক্ত নোংরামি ছাড়া আর কি!

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে সীমা বলে, "আমি স্বীকার করি এখন সব কিছু অবশ্য প্রসপার খুড়োর বিরোধী, কেননা ট্রাক তিনি স্বহস্তে ধ্বংস করেন নি। হয়ত পারেন নি। কিন্তু সেই কারণে তিনি অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, এমন নোংরা কাজ করবেন, এ কথা বলা অন্যায়।"

মরিস কোনো জবাব দেয় না, শুধু ধূমপান করে যায়. ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্লেষভ া হাসি হাসে। রোষভরে সীমা বলে "তোমার মুখের ঐ নোঙরা হাসি মুছে গেল মরিস। সাধারণতঃ তুমি স্মার্ট বটে কিন্তু খুড়োর সম্বন্ধে যা কিছু বলো তা নির্বোধের উক্তি। ওঁকে শুধু কারখানায় দেখছ, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানোনা তুমি। আমি ওঁকে গত দশ বছর দেখছি। প্রতিবারই উনি বিদেশ থেকে ফেরার সময় আমার জন্য কিছু না কিছু এনেছেন, সেটা সাধারণ বস্তু নয়। রীতিমত ভালো জিনিস। আমার যখন সেবার জ্বর হল, উনি এমনই চিন্তিত হয়ে ছিলেন যে ওঁর মুখ শুকিয়ে গিছল। যা তুম বলছ মরিস সব বাজে কথা। উনি কখনো আমার ক্ষতি করবেন না।"

সেই ভাবে হেসে জবাবে মরিস বলে, "হয়ত উনি তোমাকে ভালো-বাসেন, কিন্তু ব্যবসাটাও ওঁর কম প্রিয় নয়। কুকুর যেমন হাড়ের টুকরোয় লেগে থাকে উনিও তেমনই ব্যবসায় আসক্ত। কাউকে তিনি সুযোগ দেবেন না ওকে সেই স্থান থেকে সরাবার। দু'শ পরিবার ওদের ছেলেদের এই যুদ্ধে ও আগের যুদ্ধে পাঠিয়েছে বটে, ছেলে গেছে তাদের, টাকাটা কিন্তু নষ্ট হতে দেয়নি।"

কথাগুলি মরিস গম্ভীর মুখে বলে।

সীমার কানে বাজে। কুকুর যেমন হাড়ের টুকরোয় লেগে থাকে, ওর আসক্তি তেমনই ব্যবসায়।—কথাটা সীমার কানে বাজে। সেই সঙ্গে বাজে প্রসপার খুড়োর মুখনিসৃত উক্তি -"আমি ব্যবসাদার মানুষ

সেই আমার শিক্ষা, জীবনে ওই আমার জায়গা, ব্যবসা ভিন্ন আমার অস্তিত্ব আমি ত' ভাবতেই পারি না।"

ইতিমধ্যে মরিস বলতে শুরু করেছে—"যদি কোনো মতলবই নেই, তাহলে তোমাকে এমন করে এখানে আটকে রেখেছে কেন?" মরিস কথাগুলি আস্তেই বলছে—কিন্তু সীমার কানে সে কথা বাজছে।

"কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না কেন? নিজেই সেটা ভেবে দেখ,—ওর ভেতরই মরা ইঁদুরের গন্ধ পাবে।"

সীমা এক মুহূর্ত ভেবে বলে, "মাদাম আমার ওপর ভীষণ চটা। আমাকে তাঁর সহ্য হয়না। কিন্তু তদ্দারা প্রমাণিত হয় না যে প্রসপার খুড়ো আমাকে নিয়ে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতার মতলব করেছেন।" যুক্তিহীনভাবে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে সে বলে, "কেন তুমি নিজেই ত' বলেছিলে জার্মানেরা আসার আগে কাণ্ডটা ঘটেছে তাই বিশেষ ভয় নেই। বলেছ কি না বলো?"

শান্ত হবার চেষ্টা করে মরিস বলে, "যতটা বোকা তুমি তার চেয়েও বোকা সাজতে যেওনা, তুমি নিজেই জানো বেশ ভালোভাবে ওর সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো যোগ নেই। বেশী সময় নেই।" সংক্ষেপ করে মরিস বলে ওঠে—"জানিনা কতদিন তোমাকে ওরা শান্তিতে থাকতে দেবে। হয়ত আজই কিছু ঘটতে পারে। যাওয়ার আগে আমি দ্বিতীয়বার আর আসতে পারবো না। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে, তোমার অবস্থা বেশ বিপজ্জনক, অতি শীঘ্রই কিছু একটা কাণ্ড হবে। একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে। আজ, এখনই। আমি একটা মতলব দিতে পারি, আমার সঙ্গে অনধিকৃত অঞ্চলে চলো।"

কথাটা যথাসম্ভব উদাসীন ভঙ্গীতে বলে মরিস, ওর দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

সীমার অন্তরে অসীম আনন্দ ও গর্ব! ওর সঙ্গে মরিস লুইসনকে

নিচ্ছেনা, আর কোনো মেয়েকে নিচ্ছেনা, যারা ওর সঙ্গে ঘোরে তাদের ও নয়। সীমা মরিসকে অন্ততঃ এইটুকু বিশ্বাস করিয়েছে যে তাকে নিয়ে সঙ্কটের মুখে যাওয়া যায়।

সীমা বলে, "তুমি যা করতে চাও আমার জন্য তা অ ব।" পাথরে বসে আছে সীমা, ঠোঁটে তার অল্প হাসি। কল্পনা-নেত্রে দেখে ওর সঙ্গে সে ক্রান্সে বেড়াচ্ছে, রাতেও চলেছে ওর ওপর বিশ্বাস নিয়ে। অনধিকৃত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য ওদের হয়ত লয়র অতিক্রম করতে হবে। গোপনে ওর সঙ্গে একত্রে নৌকায় নদী পার হচ্ছে, কল্পনা করে সীমা। হয়ত শত্রু গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু ও যতক্ষণ কাছে আছে কিছুই হবেনা। হয়ত ওরা দুজনেই নদী সাঁতরে পার হবে। ভাগ্যে ভালো সাঁতার জানে সীমা। কি মজাই না হবে!

কিন্তু ও চলে গেলে এখন কি হবে? মরিস নিজেই ত' বলল স্যাটালিন ও অন্যান্য ফ্যাসিস্তরা—যে কোনো উপায়ে খুড়োকে দলে টানবে। ও যদি পালায়, ওরা বলবে খুড়ো নিজেই আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছিল, ওর পলায়ন ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন তিনিই। নিশ্চয়ই ওরা তাকে জব্দ করবে. অন্ততঃ চিরতরে ওর ব্যবসাটা নষ্ট করে দেবে।

না, নিজের কৃতকর্মের জন্যে আর কাউকে ও কষ্ট দেবেনা। ভালো মন্দের ভাগ ওকে নিতেই হবে। এইভাবে পালিয়ে গিয়ে খুড়োর ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করা চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। মাদামের তীক্ষ্ণ তিরস্কার যেন ওর কানে ভেসে আসে "পালিয়ে গেল, বরাবরই জানি, ও বেরিয়ে যাবে।"

মরিস বলছে আগামী কাল রাতে সে ডেপুটি প্রিফেক্টরের মোটর সাইকেল নিয়ে আসবে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার পাল্লা, বেশ সহজেই ওরা পালাতে পারবে। লয়র পার হয়ে ওকে বিশ্বস্ত বন্ধুদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজে নদী পার হবে।

সীমা অর্ধেক শুনছে মাত্র,—মোটর সাইকেল। ওর গায়ে থাকবে চামড়ার জ্যাকেট, রাতে ওকে জড়িয়ে বসে থাকতে হবে সীমাকে, ওর ভয় করবে না মোটে। সবই বেশ চমৎকার, লোভনীয়। কিন্তু যেতে পারেনা সীমা। উপায় নেই যাওয়ার। প্রাণপাত খুড়োকে নিজের স্বার্থের খাতিরে দুরাত্মা বানাতে পারবে না সে। মরিসের সঙ্গে পলাবার মজায় খুড়োকে বিপদে ফেলতে পারবে না। ওর কৃতকর্মের ফল খুড়োকে ভোগ করতে দেবে না।

মরিসকে না বলতে হবে। কিন্তু এখন নয়। এখন মাত্র দু' মিনিটের জন্য, এক মিনিটের জন্য ওর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত আনন্দটুকু ও উপভোগ করুক। স্বপ্ন দেখে রাতে ওর সঙ্গে মোটর সাইকেলে ছুটবে—ছুটে যাবে আরো স্বাধীনতার সন্ধানে।

সে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা মরিস আমাকে উদ্ধার করার জন্য তোমার এই আগ্রহ কেন?" যেন নিজেকেই সে প্রশ্ন করছে, অতি কোমল মিঠা গলায় সহাস্যে সে প্রশ্ন করে। এমনই তার প্রশ্ন যে মরিসকে বলতে হয়—"অর্থাৎ? কি বলছ তুমি?" .

তেমনই যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সীমা বলে—"আমাকে বাঁচিয়ে তোমার লাভ কি মরিস?" এবার বেশ জোর গলায় বলে: "যাই হোক তোমার ধারণা আমি যা করেছি সব বাজে কাজ,—সব ভুল, কেমন কিনা?"

মরিস তখনই জবাব দেয়—"নিশ্চয়ই ভুল। কিন্তু তোমাকে এখনও শিক্ষা দেওয়া যায়। এখন তোমার শেখার সুযোগ এসেছে। এখনও একটা কিছু হতে পারো তুমি!" উঠে পড়ে মরিস বলে—"আচ্ছা, তাহলে কাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। এই পাঁচিলের ধারেই থাকবো। সামান্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ো। ছোট্ট একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগই যথেষ্ট। বুঝলে!".

এখন সীমাকে জবাব দিতে হবে। আর ইতস্ততঃ করা চলেনা, এখন ওকে স্পষ্ট বলতে হবে। সে আবার প্রশ্ন করে "তুমি ত' বুঝিয়ে দিলে স্তাটালিন ও অপরাপর ফ্যাসিস্তরা প্রসপার খুড়োকে শাস্তি দেবে আমাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।"

চটে উঠে মরিস বলে, "বাঃ একথা কখন বলেছি। আমি বলিনি। তুমি কি কিছুই বোঝো না?" ওর এই তিরস্কারভরা প্রশ্নে সীমা উত্যক্ত হয়ে ওঠে—বিশেষ করে ওকে না বলতে কতখানি আত্মত্যাগ করতে হবে তা কি ও বোঝে!

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "হাঁ, তুমি বলেছ, ঐ কথাই ত' বলেছ তুমি!"

অসহিষ্ণু মরিস বলে, "একথা একশোবার বোলো না।" কিন্তু আবার সংযত হয়, বলে—"দেখ, ঝগড়ায় সময় নেই। ঠিক ঐজন্যে এখানে আসিনি। কাল তাহলে রাত সাড়ে বারোটা—" মরিসের কথাটা যেন অনুনয়ের মত শোনায়।

সে বলে, "কিন্তু আমার কৃতকর্মের জন্য প্রসপার খুড়োকে আমি বিপদে ফেলতে পারিনা।" তারপর দৃঢ় গলায় বলে, "এইভাবে এখানে এসে আমাকে সাহায্য করার কথা বলে আমাকে সত্যি কৃতজ্ঞ করেছ মরিস। তোমাকে যেভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইভাবে ধন্যবাদ কাউকে কোনোদিনই আমি দিইনি। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবো না,—যেতে আমি পারিনা—পারবো না।"

কথাগুলি বলার সময় দুঃখে ভেঙে পড়ে সীমা এই ভাবে একা ওকে ছেড়ে দিতে হবে, আবার এদিকে সে খুশি—ওর শত্রু মরিসকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে সে তাকে সাহায্য করতে চায়।

মরিস কাঁধ নেড়ে রাগ করে বলে, "বেশ—তুমি যদি তোমার খুড়োমশায়ের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস রেখে নিজের সর্বনাশ করতে চাও করো। যার যা অভিরুচি। আমাকে মাফ করো মামজেল, তোমাকে

বিরক্ত করলাম।" কথাগুলি অত্যন্ত বিনীতভাবে শেষ করে মরিস। তারপর আবার তাড়াতাড়ি যোগ করে, "এই শেষবার তোমাকে বলছি —কাল রাতে আসব সাড়ে বারোটায়—তুমি থাকবে? হাঁ-না—না?"

যাই কি না যাই সিদ্ধান্ত করতে পারছেনা সীমা। সীমা জানে এই মুহূর্তে যা সিদ্ধান্ত সে করছে তা ওর ভবিষ্যৎ জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেবে, যা ও প্রত্যাখ্যান করছে তার নামই সুখ। কিন্তু এই মুহূর্তে পিতৃব্যকে ত্যাগ করাটা হবে ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

সীমা উঠে দাঁড়ায়। শীর্ণ, দীর্ঘছন্দ-দেহ সীমা ছিন্ন ওভারঅল পরে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুধু বলে—"না, মরিস।"

এই 'না' টুকু বলতে তাকে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে। কি নিদারুণ আঘাত, জ্বালায় জ্বলছে সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

মরিসকে কিছু বলতে হবে। ওর জন্য সে বিরাট দায়িত্ব ও বিপদের ঝুঁকি নিতে চায়! ওর এই আবরণ সে হয়ত পাকামি মনে করছে। কোনো রকমে চোখের জল সামলে অতি মধুর গলায় সীমা বলে—"ধন্যবাদ মরিস! তোমাকে অসীম ধন্যবাদ।"

একটু বেয়াড়া ভাবেই দেয়ালের দিকে দু' পা এগিয়ে যায় মরিস, তারপর কাঁধ নেড়ে বলে, "বেশ, যাবেনা তাহ'লে"—আবার পিছিয়ে ওর খুব কাছে এসে দু' হাতে সীমার হাতটি ধরে বলে, "সত্যি তাহ'লে আসবে না?" ওকে ধরে ঝাঁকানি দেয় মরিস—বেশ সজোরেই ধাক্কা দেয়। কিন্তু সীমার লাগেনা।

সীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, এখন আর চোখের জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই তার, "আমার যে উপায় নেই মরিস। তোমার মঙ্গল হোক।"

পাঁচিলের ওপর বসে পড়ে মরিস বলে, "আচ্ছা, তাহলে গুডবাই, বোকা মেয়ে। তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা কারো নেই।" তারপর

কিঞ্চিৎ বিষাদভরে বিস্ময়কর ভদ্রতার সঙ্গে বলে—"আচ্ছা সীমা বিদায়।" পথে লাফিয়ে পড়ল মরিস।

সীমা আবার উঁচু টিলায় উঠে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবে সে এসে দাঁড়িয়েছে জানেনা। মরিস সাইকেলে উঠে পড়েছে, এইবার সে চলল। সীমা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর প্রশস্ত পিঠ দেখা যাচ্ছে। ওর সঙ্গেই সীমার যাওয়া উচিত। এই ওর একমাত্র সুযোগ। মরিসের কথাই ঠিক, একশোবার ঠিক। সীমার ইচ্ছা হয় চীৎকার করে বলে,—"মরিস, আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।" এখনও চেঁচিয়ে বললে মরিস শুনতে পাবে। এখনও ..এখনও। কিন্তু আর শুনতে পাবে না। কিন্তু ঐখানে গিয়ে যখন নেমে পড়ে সাইকেলটা ঠেলতে হবে তখন নিশ্চয়ই আর একবার পিছু ফিরে দেখবে মরিস। তারপর যদি পাঁচিলে উঠে পড়ে ইসারা করে—পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই মরিস দাঁড়াবে। তখন সীমা বলবে—ওর সঙ্গেই সে যাবে।

এতক্ষণে মরিস সেই চড়াইটার কাছে পৌঁছেচে। এইবার সাইকেল থেকে নামল -ঠেলতে হবে সাইকেলটা। এইবার পিছু ফিরে দেখবে। এখনও সময় আছে। এই একটি মুহূর্ত। মরিস হাত তুলে অভিবাদন জানায়—অপেক্ষাও করে একটু। এই শেষ মুহূর্ত। কিন্তু সীমা পাঁচিলে উঠে দাঁড়ায় না। তেমনই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত দিয়ে পাঁচিলটা ধরে আছে। হাত অবশ হয়ে আছে তার আর সাড়া নেই। একটিও পেশী নাড়াবার ক্ষমতা নেই সীমার।

এইবার ঘুরে দাঁড়ায় মরিস। চলল আবার সাইকেল ঠেলে। পৃথিবীতে যা কিছু সীমার কাছে বরণীয় ছিল সবই যেন সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হ'ল। একটু পরেই মিলিয়ে যাবে মরিস,—ওর পিঠটাও দেখা যাবে না আর, আর কখনও ওর দেখা পাওয়া যাবে না।

এখন সীমা বিপ্লবী নায়িকা—ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ বোকা মেয়ে।

অতি ধীরে পাথরের টিলা থেকে নামে সীমা। তার পিছনে পাচিল - আর এই পাঁচিল চিরদিনের মত মরিস আর বহিপৃথিবীর সঙ্গে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। ঐ পাচিল ডিঙিয়ে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারত সীমা, কিন্তু সে না বলেই দিয়েছে। শূন্য উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে সীমা। ওর মত অতখানি বিষাদভরা মুখ আর কোনো মানুষেরই নেই। যা কিছু করেছে সীমা সবই ভ্রান্ত আর নির্বোধের কাজ। সে অতি অকিঞ্চিৎকর নায়িকা।

বড় স্ট্র-হ্যাটটা মরিস ওর মাথা থেকে খুলে দিয়েছিল—সেটি হাতে ঝুলিয়ে নেয় সীমা। যন্ত্রচালিতের মত পরিচ্ছন্ন ভাবে বাগানের যন্ত্রপাতি ছায়া ঘেরা ঘরে রেখে দেয়। বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘরটিতে ঢুকে পড়ে, —কাপড় চোপড় কেচে, পোশাক পরিবর্তন করলো সীমা—সবই যান্ত্রিক গতি।

তারপর রান্নাঘরে গিয়ে নৈশ-আহার রান্নার আয়োজন শুরু করে।

মাদাম রান্নাঘরে এলেন। মৃদু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "শুধু আমাদের দুজনের মত খাবার কোরো, কালও তাই। তোমার জন্য আমার ছেলেকে ফ্রেঙ্কেভিল যেতে হয়েছে।"

চার

বিশ্বাসঘাতকতা

রাত এল, পরদিন এবং আর এক রাত। সমস্ত সময় ধরে সীমা কেবল প্রসপার খুড়োর মনোভঙ্গীর কথা ভাবে। তাঁর ফ্রেঞ্চেভিলে যাওয়ার অর্থটা কি! হয়ত জার্মানরা ওর বিরুদ্ধে একটা কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে, প্রসপার খুড়ো প্রিফেক্টার ও জার্মান হেড-কোয়ার্টার্সে গেছেন সীমার জন্য আবেদন-নিবেদন জানাতে। এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সমগ্র শক্তি দিয়ে সীমা এছাড়া আর কিছু যে হওয়া সম্ভব সেই সন্দেহ দূরে রাখে।

কিন্তু ওর মাথায় সন্দেহ যেন এক টুকরো পাথরের মত বাসা বেঁধেছে।

সত্যই যদি সীমার অবস্থা বিপজ্জনক হয় তাহলে প্রসপার খুড়ো কি করতে পারেন। উনি যদি ওর জন্য ওকালতি করেন তাহলে তাঁরই বিপদ তাতে বাড়বে বেশী। মরিসের অনুগমন করলেই ভালো হ'ত কি? কিন্তু মরিসের সঙ্গে গেলে শুধু যাওয়াটাই খুড়োকে বিপন্ন করে তুলতো।

বিছানায় শুয়ে আছে সীমা সেই অন্ধকার চিলে কুঠরিতে। আজ দ্বিতীয় রাত্রি, তার চিন্তা একই বেদনাদায়ক বৃত্তপথে ঘোরে।

মরিসকে হাঁ বললে কি যে হ'ত ভাবে সীমা। এখন হয়ত সাড়ে এগারোটা। এই ত' সময়। এখনই উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে হবে, জিনিসপত্র নিতে হবে। যে ব্যাগটায় শহর থেকে জিনিসপত্র আনত সেই ব্যাগটাই ও নেবে।

প্রসপার খুড়ো কেন ফ্রেঞ্চেভিলে গেছেন? মরিসকে কি শেষ পর্যন্ত হাঁ বলা উচিত ছিল? সীমার মনে হয় রাত যেন আরো কালো হয়ে আসছে, গরম যেন ক্রমেই বাড়ছে। আর সহ্য হয়না। গরম বা এই অন্ধকার কিছুই যেন আর সহ্য করা চলে না।

তারপর অনুতাপও সহ্য হয়না। কারণ প্রসপার খুড়োর ফ্রেঞ্চেভিল গমন যে কারণেই ঘটে থাকুক, মরিসকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে বড়ই খারাপ হয়েছে, সেই কারণে মনে ক্ষোভের, খেদের আর সীমা নেই সীমার।

এখন হয়ত মধ্যরাত্রি। এলার্ম ঘড়ি টিকটিক করছে, বাজছে যেন ওর বুকেই। একটা অসহ্য উত্তেজনায় ওর হৃদয় আন্দোলিত হয়। সে আলো নিভিয়ে দেয়। সময় এখন নিকটে এসেছে। মরিস এখনই যাবে। অনধিকৃত অঞ্চলের উদ্দেশেই তার অভিযান, তারপর—নিরুদ্দেশ যাত্রা।

হয়ত সে ওর আপত্তি বিশ্বাস করেনি। হয়ত সে এখানে আসবে, পাঁচিলের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে—স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিন্ত হবে সীমা এসেছে কিনা।

ধীরে ধীরে উঠে পড়ে সীমা। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেয়, ঘন-নীল পাজামা আর একটা ব্লাউজ পরে। পরিবর্তনের উপযোগী দু' একটা পোশাক আর একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস সঙ্গে নেয়। একজোড়া মজবুত জুতো সঙ্গে নিল, কিন্তু পায়ে দিলনা। খালি পায়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। বুকটা এমনি জোরে কাঁপছে যে মনে হয় যেন মাদাম শুনতে পাবেন। ভাঁড়ার থেকে বাজারের ব্যাগটা তুলে নিয়ে তাতে জিনিসগুলি বোঝাই করে। অতি সাবধানে সে দোরের দিকে এগিয়ে যায়, কব্জাটায় তেল দিয়ে রাখলে হ'ত, কিন্তু সে কাজ শুধু প্রসপার খুড়োর সহায়তায় সম্ভব। অতি সাবধানে সে চাবি খোলে, —দোরের অতি অল্প আওয়াজ শোনা যায়।

সে বাগানে এসে পৌছায়। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা ও অন্ধকার। প্রকাণ্ড বাগানের সমস্তটা অতিক্রম করে—পাঁচিলের ধারে এসে পৌছায়। যে মাটি ও ঘাসের ওপর দিয়ে সে হাঁটে তা ভিজা, পায়ের নীচে বেশ

লাগে। দ্রুত পায়ে নরম ভিজা ঘাসের ওপর চলে অবশেষে পাঁচিলের ধারে এসে পড়ে।

পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ে রাস্তার দিকটায় বসে সীমা, তারপর তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে সেই মোটা জুতা আর মোজা বার করে পরে নেয়। মরিস এলে আর হাতে এক মুহূর্তও সময় থাকবে না। ওর পাশে বসতে কি মজাই না লাগবে। ওর কাঁধে হাত রেখে অন্ধকার হিম শীতল পথে মোটর বাইকে ছুটে যেতে কি মজাই না হবে।

রাস্তার ধারটিতে পুঁটলিটা নিয়ে চুপ করে প্রতীক্ষায় বসে থাকে সীমা। মরিস হয়ত আসবে। এখন যে কোনো মুহূর্তেই মরিস এসে পড়তে পারে। যে কোনো মুহূর্তে। অন্ধকারে সে যেন মোটর সাইকেলের আওয়াজটা শুনতে পায় যেন ভুল না করে। চুপ করে সেই শব্দটুকুর প্রতীক্ষায় বসে থাকে সীমা।

দীর্ঘ একমিনিট সময় কাটলো, -দুই তিন। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে ব্যাঙ ডাকছে। রাতটা বড়ই অন্ধকার। অনেক তারা আকাশে—আলো কিন্তু বড় কম। শাদাপথ অতি ক্ষীণ দেখা যায়। তবু ত' শুদ্ধ পথ, মরিসের আগমনধ্বনি অনেক দূর থেকেই শোনা যাবে।

অবশ্য আশাটা ওর পক্ষে মূর্খতা। সে অতি জরুরী তাগিদ দিয়েছিল কিন্তু সীমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তবু সীমা বসে আছে মরিসের আগমন প্রতীক্ষায়।

পনের মিনিট কেটে গেল, আধ ঘণ্টা কাটলো। সীমার অঙ্গে কেমন কাঁপন লাগে—অন্তহীন দুঃখ তাকে ঘিরে আছে। এ অপরাধ তারই, এর জন্য সেই দায়ী। তার নির্বুদ্ধিতা আর দম্ভই এর জন্য দায়ী।

মরিস চলেছে এক স্বাধীন জগতের সন্ধানে। ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে আর প্রসপার খুড়ো ফ্রেঞ্চেভিলে গেছেন ওর সর্বনাশ করার উদ্দেশ্যে। সীমা এইসব নিজেই ঘটতে দিয়েছে। তাকে সতর্ক করে

দেওয়া হয়েছে, মুক্তির উপায় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিজেকে সে বাঁচাতে পারত, তবু সে সুযোগ সে নেয়নি। শুধু দর্প আর বোকামির ফলেই এই কাণ্ড হল।

স্তব্ধ সীমা সোজা হয়ে চুপ করে বসে থাকে, কতক্ষণ যে সেই শীতল অন্ধকার রাতে জ্যোতিহীন তারাভরা আকাশের নীচে বসে ছিল সীমা তার হিসাব নেই।

এইবার আবার বাড়ির দিকে ফেরে সীমা। অতি ধীর তার পদক্ষেপ। তার পায়ে এখন আর শিশিরের স্পর্শ অনুভূত হয়না, গাছের ডাল-পালা গায়ে লাগলেও সে বুঝতে পারেনা। যান্ত্রিক গতিতে, অতি সাবধানে দরজা খুললো আর বন্ধ করলো। অতি লঘু-পদে চিলেকুঠরিতে ওঠে সীমা। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এখন এর পিছনে ফেরার সময় নেই।

যতক্ষণ না প্রসপার খুড়ো তাঁর দুর্জ্ঞেয় সফর থেকে ফিরছেন ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে, সেই সঙ্গে অদৃষ্টে যা আছে তার সংবাদও আসবে। এখন আর যা ঘটবে তার কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি!

মৃতের মত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সীমা, তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, চোখে বেদনা, গা-হাত-পা কামড়াচ্ছে। চোখে ঘুম নেই। ঘুমকে ভুলিয়ে আনার চেষ্টা করে সীমা—জোর করে ঘুমানোর চেষ্টা করে—উপুড় হয়ে শোয়, আবার পা দুটো টান করে দেয়। তাতে এখনও উপকার হয়। অনেক কসরৎ করে ঘুমের জন্য,—ন'শ' বার গণনা করল তাতে পনের মিনিট সময় কাটলো।

ঘুম আসেনা—কেবল তিক্ত-চিন্তা।

সীমা আলো জ্বেলে দেয়,—মাদাম দেখলেন ত' বয়ে গেল। সীমা

তার বইগুলি টেনে নেয়। বইগুলি অবশ্য তার মনোবাসনা পূর্ণ করে, যা চেয়েছিল তাই হ'ল,—তার মধ্যে ডুবে গেল সীমা। গ্রন্থোক্ত কাহিনী তাকে অধিকতর আচ্ছন্ন করে রাখে,—তাকে অরলিনের কুমারী জোনের চরিত্রে রূপায়িত করে।

জোনের কারাবাসের কাহিনী পড়ছিল সীমা। কার হেপাজতে বন্দিনীকে রাখা হবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক। পাঁচজন বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে চায়। যে সৈনিক তাকে ধরেছে, কাপ্তেন আছেন, ভঁাদোমের সেই কাপ্তেন। তাদের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার—লাকসেমবার্গের কাউণ্ট জন। ইংলণ্ডের সম্রাট, সব ফরাসী বন্দীর ওপরই নাকি তাঁর অধিকার। তারপর যোভাই-এর বিশপ রয়েছেন, তাঁর ধারণা ওকে যখন তাঁর গির্জা এলাকায় ধরা হয়েছে, তখন বিচারের অধিকারও তাঁরই।

জোনের শত্রুরা কিভাবে দর কষাকষি করছে সীমা তা অধীর আগ্রহে পড়ে যায়। টাকার প্রশ্নটাই বড়, তাও তেমন বেশী টাকা নয়। দু'হাজার লিভর পরিমাণ সোনা লাকসেমবার্গের কাউণ্টের জন্য আর ভঁাদোমের কাপ্তেনের জন্য তিনশ লিভর সোনা। সীমা হিসাব করে, সেটা কতটাকা হতে পারে। হিসাব করে দেখে সীমা প্রায় কুড়ি মিলিয়ন ফ্রাঁ। স্যাটালিনের সমস্ত সম্পত্তির চাইতেও অনেক বেশী। কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোকদের কাছে সেটা অনেক টাকা, কি করে তাঁরা দেবেন। জোন অব আর্ক, যাকে সবাই 'মেড' বা দিব্যলোকের কুমারী বলে, তার মূল্য স্বরূপ এই অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা একটা বিশেষ ট্যাক্স ধার্য করলেন।

সোনার জলে বাঁধানো প্রাচীন কাহিনী-পুস্তকে সীমা সকৌতূহলে পড়ে সাধারণ লোকের চোখে জোনকে নিয়ে এই দর কষাকষি কেমন লেগেছিল।

সীমা পড়ে যায়, বোরভয়র প্রাসাদে হাউস অব লাকসেমবার্গের

বৃদ্ধা কাউন্টেস, তাঁর কন্যা, প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে জোনকে রাখা হয়েছে। সেখানে বোভাই-এর বিশপ এলেন, ইংরেজদের হয়ে কুমারী জোনকে তিনি কিনতে এসেছেন। লাকসেমবার্গের বৃদ্ধা কাউন্টেস কিন্তু ছেলের পায়ে ধরে অনুনয় করছেন জোনকে যেন বিক্রী না করা হয়। কিন্তু কাউন্টের অর্থবল নেই, বিশপ তা জানেন, তাই তিনি বারবার আসছেন। তিনি দর কষাকষি করছেন। প্রথমত তিনি ৩৭,০০০ ফ্রাঁ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাকসেমবার্গের জন বললেন, "এমন এক স্বর্গীয় কুমারীর পক্ষে ও টাকা যথেষ্ট নয়। বিশপ আরো বেশী দিতে চাইল অবশেষে দর বাড়িয়ে ৬১,০০০ ফ্রাঁ পর্যন্ত উঠল। তারপর লাকসেমবার্গের জন বললেন, "রীতিমত একটা দাও।"

সীমা অবাক হয়ে ভাবে শুধু জোনের শক্রতাই কেন তাকে কিনতে চেয়েছিল কে জানে। সীমা পড়ে রীতি অনুসারে বন্দী বা বন্দিনীর বন্ধু-বান্ধবেরা মুক্তিমূল্য প্রদান করে অনেক সময় উদ্ধার করে থাকেন। সীমা কল্পনা করে জোন হয়ত বন্দীশালায় বসে ভেবেছে কেউ তাকে মুক্ত করতে আসবে। কোথায় তার সেই বন্ধুরা? যে সম্রাটকে সে রাজমুকুট পরিয়েছে তিনি কি তার বাঁধন খোলার জন্য এগিয়ে আসবেন না। তিনি তার মুক্তির বিনিময়ে টাকা, নগর, এমন কি ইংরাজ বন্দী পর্যন্ত দিতে পারতেন। ওঁর বন্দীদের মধ্যে অনেক বড় বড় ইংরেজ-লর্ড পর্যন্ত ছিলেন যথা জেনারেল টালবট। হয়ত ইংরেজরা জোনকে ছাড়ত না। কিন্তু তিনি কি একটা চেষ্টাও করেননি? না, তিনি কোন চেষ্টাই করেননি?

এই সপ্তম চার্লস লোকটা কিরকম? সীমা ঠিক বোঝে না তাঁকে! শ্বাসরুদ্ধ করে সীমা পড়ে যায়—কারাগারে জোনের জীবন আরো জ্বালাময়, আরো বেদনাদায়ক হয়ে উঠছিল দিন দিন। তার পা শৃঙ্খলা-বদ্ধ, রাতে শোয়ার সময় বিছানায় তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত।

পাঁচজন পেশাদার ইংরেজ তার রক্ষী, তারা অতি নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে অতি রূঢ়ভাবে জোনের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে। রাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলে—"যাও উঠে পড়ো, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।" কিংবা বলে—"উঠে পড়ো ডাইনী, সময় হয়েছে, এইবার তোমাকে পোড়ানো হবে।" জোন যখন এসব কথা বিশ্বাস করত তখন ওরা অট্টহাস্য করে উঠত।

এখন পর্যন্ত সীমা কখনও জোনের বিচারের বিশদ বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। সে জানত বংশগত শত্রু ইংরেজরা জোনকে বিচার করে শাস্তি দেয়। এখন পড়ে অবাক ও আতঙ্কিত হয়ে গেল তারা মোটেই ইংরাজ নয়। ধর্মযাজকদের যে আদালত জোনের বিচার করেছিল তারা সবাই ফরাসী। বিরাট উপাধিওলা বাহত্তরজন বিচারক বিচারে বসেছেন, তার মধ্যে পারী য়ুনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষও আছেন।

ক্রুদ্ধ সীমা যেভাবে সহায়হীনা বন্দিনীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ওরা জেরা করেছে তা পাঠ করে। এক প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নে গিয়েছে ওরা, এমন সব কথা যার হয়ত অর্থ জোন ঠিক মত বোঝেনি। একটা কথা থেকে কথান্তরে চলে গেছে, এত দ্রুতগতিতে এবং বিভ্রান্তিকর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেছে সবাই প্রায় একই সঙ্গে যে জোনকে বলতে হয়েছে—"ভদ্র মহোদয়গণ, একে একে কথা বলুন, এক সঙ্গে বলবেন না।"

এই বিচারের রাজনৈতিক অর্থ ও উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল সে কথা প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল। এ হল ধর্মযাজকদের ধর্মাধিকরণ, এখানে শুধু ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্ন। জোনের বিশ্বাস আর অবিশ্বাস—তার সম্পর্কে জনশ্রুতি নিয়েই বিচার চলছে।

আদালত কি ভাবে তার রায় দিল সীমা তাও পড়ল।

বোভায়ের বিশপ রায়ের দু রকম ভাগ করেছেন—একভাগে বলা হয়েছে পাষণ্ড-পিশাচী, আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে—পিশাচী যদি অনুতাপ করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে আর জীবন ভিক্ষা দেওয়া হবে।

যথারীতি তিনবার কুমারী জোনকে ওরা অনুরোধ করলে দৈববাণী সম্পর্কে তার উক্তি প্রত্যাহার করতে—সম্রাটকে অস্বীকার করতে। তিনবারই কুমারী জোন তা প্রত্যাখ্যান করলো।

তৃতীয়বার এইভাবে প্রত্যাখ্যান করার পর বিশপ তাকে বহিষ্কৃত করার আদেশ পাঠ করলেন এবং অনুতাপহীনা ডাইনীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বারবার ওকে বলল—প্রত্যাহার করো, অনুতাপ করো, নইলে মৃত্যু। পুড়িয়ে মারা হবে।

ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে জোন, অবশেষে সে বলে ওঠে—বেশ আমি প্রত্যাহার করছি, আমি বলব যে দৈববাণী বা স্বপ্ন আর আমি বিশ্বাস করিনা,—এখন থেকে আমি বিচারক আর গির্জা বিশ্বাস করি, তাদের শ্রদ্ধা করি। বিচারকরা দলিল এগিয়ে দিলেন, তাতে সই করার জন্য পালকের কলম এগিয়ে দিলেন,—জোন তাতে সই করল।

সীমা বোঝে কি নিদারুণ ক্লেশ আর অপমানে জর্জরিত হয়েছে জোন। পুরোহিতদের কথায় বিশ্বাস করে জোন ভেবেছিল এইবার তার ক্লেশের অবসান হবে তাকে হয় ত গির্জায় রাখা হবে ভদ্র পরিবেশে। কিন্তু তাকে সেই অন্ধকূপে পেশাদার ইংরাজ চৌকিদারের খবরদারিতে রাখা হল।

পরবর্তী সন্ধ্যাগুলির খবর তিক্ত আনন্দে পড়ে যায় সীমা। এই সব ঘটনা আগেও পড়েছে সে, আজ কিন্তু নবতর উৎসাহ তার প্রাণে, নূতন উদ্দীপনা।

জোন অবশেষে বিশপকে বলল—আপনারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি তাই আমিও কথা রাখিনি।

বিশপ বললেন এখনও কি দৈববাণী শুনতে পাও।

জোন বলে - হ্যাঁ, শুনেছি। তাঁরা বলছেন আমি আত্মরক্ষার জন্য সত্যকে বলিদান দিয়েছি। বিধাতাকে অস্বীকার করে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি। যখন বলেছি স্বয়ং বিধাতা আমাকে পাঠাননি তখনই আমি নিজেকে ঘৃণিত করেছি। আমি প্রত্যাহার আর অনুতাপ করে অন্যায় করেছি। বিধাতা আমাকে পাঠিয়েছেন একথা সত্য। শুধু আগুনে পুড়ে মরার ভয়ে আমি অনুতাপ করে প্রত্যাহার করেছি আমার বিশ্বাস।

পুরোহিত সব কথা লিখে মন্তব্য করলেন: মারাত্মক জবাব।

৩০শে মে ১৪৩১, বিরাট মঞ্চের উপর জোনকে বেঁধে দাঁড় করিয়ে তার তলায় কাঠ সাজিয়ে রাখা হল। সামনে বিচারকরা বসে আছেন, —একটা কাষ্ঠ খণ্ডে লেখা হয়েছে—"জোন, ভণ্ড, প্রতারক, ডাইনী, কলঙ্কবতী, রক্তপায়ী, দানব-উপাসিকা, পিশাচী।"

সেই চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল, জোন চীৎকার করে—যীশু, যীশু—···সাতবার এইভাবে উচ্চারণ করার পর তার মাথা টলে পড়ল —তার মৃত্যু হল!

সীমার সেই সোনালী বই-এ লেখা আছে—"তেল, গন্ধক, কয়লা প্রভৃতি দেওয়া ছিল তবু যে ঘাতকের ওপর জোনকে পোড়াবার ভার ছিল সে বলে জোনের হৃদয়টা পুড়ে উজ্জ্বল জ্যোতিপিণ্ডের মত সেটা জ্যোতিশ্চ্ছটা বিতরণ করছিল। অনেক চেষ্টা করেও ঘাতক সেটা নষ্ট করতে পারল না। ইংলণ্ডের কার্ডিনাল এই ইন্দ্রজালে বিস্মিত হয়ে একটা আন্দোলনের আশঙ্কায় সেটা নীল নদীতে বিসর্জন দিতে আদেশ দিলেন।

ঘাতক বলতে লাগল—আমি দেবীকে পুড়িয়ে মেরেছি, আমার অনন্ত নরক বাস হবে। রুঁয়ের একজন ধর্মযাজক বললেন—আমি যদি জোনের স্বর্গলোক যেতে পারতাম। সবাই বলল—'মেয়েটি সতী ছিল বটে।'

ইংলণ্ডের রাজার সেক্রেটারী মহাফুর্তি নিয়ে এই শাস্তি দেখতে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন বেদনা আর শোকে অনুতাপ করে বললেন, "আমাদের সর্বনাশ হবে। আমার স্বর্গের দেবীকে পুড়িয়ে মেরেছি।"

পাঁচ

ফাঁদ

দুদিন পরে প্রায় ভোরের দিকে প্রসপার খুড়ো সফর থেকে ফিরে এলেন।

সীমা তখন সবে 'ব্লু-রুম' গোছানো শুরু করেছে। হলঘরের দরজা খোলা, সীমা খুড়োকে আসতে দেখলো। সীমা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সে নড়ল না এতটুকু। হ্যাট-কোট খুলে হলঘরের দেরাজে স্যুটকেসটা রাখলেন খুড়ো, তারপর তাঁর ঘরে চলে গেলেন। খুড়ো ওকে দেখতে পেলেন কি না কে জানে।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক খুড়ো ওর সঙ্গে কথা বললেন না। কোনো শুভেচ্ছা জানালেন না,—এক রকম এড়িয়েই গেলেন। এ বিষয়ে সীমা নিঃসন্দেহ। এতে সীমার হতাশা বেড়ে যায়-মরিসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর মনে যে জ্বালা ছিল, তা আরো বাড়ে।

সারাদিন খুড়ো কি করলেন সীমা লক্ষ্য করলো। তিনি বাইরে গেলেন না, ভিলা মনরেপোয় রইলেন। উনি সেণ্ট মার্টিনেও গেলেন না। মুখোমুখি দেখা হ'ল খাওয়ার সময়, সীমা তখন পরিবেশন করছিল। বেশীর ভাগ সময় তিনি রইলেন মাদামের ঘরে। ঘরটা দূরে, লুকিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। নিঃসন্দেহে ওরা তার কথাই বলছে। সীমার অদৃষ্ট নির্ণয় করছে।

পুনরায় সীমার সুপ্ত আশা পুনরুজ্জীবিত হয়। এখনও তার অদৃষ্ট নিয়ে এতকথা চিন্তা করার আছে, এ এক ভালো লক্ষণ। হয়ত ফ্রেঞ্চেভিলে প্রসপার খুড়ো ওকে জার্মানদের হাত থেকে বাঁচাবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন। হয়ত এই মুক্তির দাম অনেক বেশী পড়বে। হয়ত এবং সম্ভবতঃ তাই তিনি এখন মাদামের অনুমতি চাইছেন।

সন্ধ্যার দিকে আহারের কিছু পূর্বে মাদাম রান্না ঘরে এলেন। সীমা ডিনারের জন্য কি রেঁধেছে পরীক্ষা করলেন। স্যুপে আর একটু পেঁয়াজের রস দিতে বললেন। তারপর তিনি হঠাৎ বললেন, "কিন্তু ওসব করার আগে একবার ব্লু-রুমে যাও, আমার ছেলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

সীমা আর কোনো কিছুকেই ভয় করবেনা। স্থির করেছে. আর কিছু আশাও রাখেনা। এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ওর হাঁটু যেন কেমন দুর্বল, প্রসপার খুড়োর সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে এই কথা মনে হতেই সে কাতর হয়ে পড়েছে। ওর চিলে কুঠরীতে উঠে পড়ে চেহারাটা একটু ভব্যযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল তার। মাদাম কিন্তু বললেন—"যেভাবে আছ ঐভাবেই যেতে পারো।"

রান্নাঘরের পোশাকেই সীমা ব্লু-রুমে গেল।

প্রসপার খুড়ো বাগানের দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সীমা ঘরে ঢুকতেই অন্যমনস্কভাবে তার দিকে তাকালেন, তাঁর ঘন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। পরনে একটা নীলচে-ধূসর স্যুট, বেশ মর্যাদামণ্ডিত দেখাচ্ছে। এই ভাবে রান্না ঘরের পোশাকে ওকে এখানে পাঠানো মাদামের নীচতার পরিচয়।

স্বাভাবিক ভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি লক্ষ্য করা গেল, খুড়ো যেন অতিশয় অস্বস্তি বোধ করছেন। কথা আরম্ভ করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। তিনি পায়চারী শুরু করলেন। তারপর সাধারণতঃ যে ছোটো টেবলটিতে কফি পান করে থাকেন সেই টেবলে বসে পড়লেন। সেই টেবলে এক বোতল পেরনড মদ ও একটি গ্লাস রয়েছে। জানালার একটা ছিটকিনি আলগা হয়ে পড়েছে—সীমা মনে মনে ঠিক করে আগামী কাল এটা ঠিক করে ফেলতে হবে।

কিঞ্চিৎ নার্ভাস ভঙ্গীতে খুড়ো বললেন, "বসো। তারপর আর

গ্লাস পেরনদ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "তোমার আবার এসব চলেনা।" তারপর কৃত্রিম খুশির ভঙ্গী নিয়ে আবার বলেন,—"চোখটা রঙীন হলে কথা বলার সুবিধা বেশী. সব বেশ সহজ হয়ে যায়।"

সীমা জবাব দেয়না। সে ছোট চেয়ারটায় বসে পড়ে। গৃহস্থালী দাসীর মত ভীরু ভঙ্গী।

গত কয়েক বছর সে হাজার হাজার বার এমনই বসেছে। এমনই নোঙরা ও নম্রভাবে। আজ খুড়ো এটা আপত্তিকর মনে করছেন। তিনি শুরু করলেন, "সমস্ত অবস্থাটা একেবারে অসহ্য। আমার বড় ভায়ের মেয়ে তুমি, দাসী চাকরের মত বাড়িতে থাক, এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। মার পক্ষে অবশ্য যুক্তি আছে, আর তাঁর কথা আমাকে মানতেই হবে।"

সীমাও তাই ভেবেছে বরাবর। মাদামের ইচ্ছানুসারেই তাকে টেবল থেকে সরিয়ে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে।

তিনি আবার বলতে শুরু করেন,—"ক'দিন আগে তুমি যে আমার সঙ্গে স্পষ্টাস্পাটি কথা বলেছ, একরকম ভালোই করেছিলে। তবে গোড়া থেকেই কেবল বাজে তর্ক শুরু করলে আর আমাকে কোণঠাসা করলে। ওভাবে ত' আর একটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা চলেনা। আমার ভায়ের মেয়ে চোর, তারপর সে আবার আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছেই কৈফিয়ৎ চায়। আমি বড় ঠাণ্ডা মানুষ, সবায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেই চাই—কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে।"

সীমা নীরব। কিছুক্ষণ পরে খুড়ো আবার বলেন, "একটা জিনিস ভেবে পাইনা, কিছুতেই আমার মাথায় আসেনা, এতবড় একটা কাণ্ড করার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলনা তোমার? এবাড়িতে আজ দশ বছর তুমি আছ। আমাকে ভালো করে জানার সুযোগ পেয়েছ। এটা জানো আমার সঙ্গে কথা বলা এমন কিছু শক্ত

ব্যাপার নয়। কেন তুমি এসে বললেনা—'আমার মতে এখন লোডিং ইয়ার্ডটা ধ্বংস করা উচিত।' তাহলে একটা আলোচনা করা যেত। আমার মতটাও আমি বলতাম। যুক্তিটাও দিতাম। তুমিও বুঝতে। তুমি কিনা চুপিচুপি আমার চাবি চুরি করে এই কাণ্ডটা করলে। আমাদের সর্বনাশ করলে।"

খুড়ো বেশ খোলাখুলি সব বললেন।

সীমা কিন্তু অবাধ্যের ভঙ্গীতে জবাব দেয়, "আপনি কিন্তু জানেন কেন আমি একাজ করেছি।" এ উত্তর সবগ্রাসী। সব যুক্তি মুছে যায়।

খুড়ো বিষয়টা ছেড়ে দিলেন, চটে গিয়ে তিনি জবাব দিলেন, "তোমার মুখে যখন এসব শুনি তখন ভেবে পাইনা কেন আজ ক'দিন ধরে কেবল তোমাকে বাঁচাবার উপায় ভেবে মরছি।"

সীমা বলে, "কিন্তু আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে ত' মনে করিনা। আমার কি কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে?" মরিসের কথা সীমা বার বার ভেবে নেয়—এখন সে খুড়োকে দেখাবে যে তাকে অত সহজে বোকা বানানো যায় না। সে বলল, "আমি ত জার্মানরা এখানে আসার আগেই একাজ করেছি। ডেপুটি প্রিফেক্টরের নির্দেশই আমি পালন করেছি। প্রত্যেক ফরাসী সৈনিকের যা কর্তব্য তাই করেছি। আমার যদি শাস্তি হয়, সব ফরাসী সৈনিকেরও শাস্তি হবে। আপনাকে মাথা ঘামাতে হবেনা। জার্মানরা আমার কি করবে? কিছুই করতে পারে না তারা।"

সীমার কথার যুক্তিযুক্ততায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে খুড়ো এক চুমুক পেরনদ পান করে নিলেন। তারপর বললেন, "কে তোমার মাথায় এ সব ফন্দী ঢুকিয়েছে? একথা নিশ্চয়ই তুমি জানো জার্মানরা যদি কিছু করতে চায় তাহলে আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি তারা মানবে না। তারা

অতশতর ধার ধারে না খুকী। তোমার অবশ্য অদৃষ্টটা ভালো, তারা বর্তমানে আমাদের খুশী করার তালেই আছে। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলবে না। তারা মধু আর হুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একথা ফ্রেঞ্চেভিলে ওদেরই একজন অফিসার আমাকে বললেন। কাল হয়ত ওরা বলবে আমরা আমাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছি। তারা সোজাসুজি গুলি করবে, নয়ত জার্মানীর বন্দীশালায় পাঠাবে। তারাই এখন মালিক, যা খুশি করবে। আর তুমি কি না বলছ : আমার কি বিপদের সম্ভাবনা আছে?"

প্রসপার খুড়োর কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ। মরিসের কথার সঙ্গে অনেক মিল আছে। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সীমার একটু ভয় করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলে। বিপদ প্রসপার খুড়োর দিক থেকে নয়, বিপদ আসছে জার্মানদের কাছ থেকে।

এইবার খুড়ো হেসে শুরু করলেন, "তবে তোমার কথাটাও ঠিকই, কার্যকারণ না জেনে তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার আর বেশী বিপদ নেই, অন্ততঃ আর বেশী দিন নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, একটা ভালো আইডিয়া। আমি ঐ ইডিয়ট ফিলিপেকেও বলিনি। সোজা ফ্রেঞ্চেভিলে গিয়ে প্রিফেক্টকে বলেছি। আমার আইডিয়া তাকে বলতেই তিনি জার্মান সমর দপ্তরে খবর পাঠিয়েছেন আর—" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খুড়ো বলেন, "মতলবটা কার্যকরী হয়েছে। বিপদ কেটে গেছে মনে হচ্ছে।"

সীমা তার সেই ছোট চেয়ারে চিন্তাকুল মুখে বসে আছে। আশ্চর্য, খুড়োর সদিচ্ছা সম্পর্কে সীমার সন্দেহটা জেগেছে, সে ভাবছে খুড়ো কি সত্যই সদিচ্ছার বশে কাজটা করেছেন।

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব থেকে মতলবটা প্রকাশ করলেন।

জার্মানরা যেসব অঞ্চল অধিকার করেছে সেখানকার লোকজনের

বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে খবরাখবর নিয়েছে। সেণ্ট মার্টিনের রেকর্ড ভারী খারাপ শুধু এই লোডিং ইয়ার্ডের জন্যই এই বদনাম। এখন আগুন লাগানোর কথাটা অস্বীকার করা যায় না। তবে কি উদ্দেশ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে বলা যায়। তিনি প্রশ্ন করেন—"বুঝছ ?"

সীমার মনে সন্দেহ জাগে। শুকনো গলায় সে বলে, "হাঁ।"

খুড়ো আবার বলেন, "কথাটা হচ্ছে এই আগুন লাগানোর ব্যাপারটার রাজনৈতিক মতলব বাদ দিয়ে যদি বলা যায় নিছক ব্যক্তি-গত কলহের ফল তাহলে গোলমাল হয়না। জার্মানদের মত হচ্ছে যে সব অংশে জাতীয়-উন্মত্ততা লক্ষ্য করা গেছে সেই সব জায়গায় কড়া শাসন চলবে। কিন্তু যেখানে অধিবাসীরা অধিকারী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক সেইখানে ওরাও সহযোগিতার বাহু প্রসারিত করে রেখেছে। জার্মান স্টাফ অফিসার স্বয়ং প্রিফেক্টকে বলেছেন যে আমি যেভাবে বলেছি সেই কৈফিয়ৎ যদি দেওয়া যায় তাহলে সেণ্ট মার্টিন ও সন্নিহিত অঞ্চলের অনেক বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হবে।"

শুকনো গলায় প্রশ্ন করে সীমা, "ফরাসী কর্তৃপক্ষের হুকুম যদি কোনো ফরাসী নাগরিক পালন করে তার নাম কি উন্মত্ততা ?"

তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণু খুড়ো জবাব দেন—"আমাদের ওসব প্রশ্নের জবাব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? দুঃখের বিষয় যাদের হাতে আমাদের অদৃষ্ট ঝুলছে তাদের কথাই যে আমাদের মানতে হবে।

ঘরে পায়চারী করেন খুড়ো। তাঁর ভ্রূযুগ নার্ভাস ভঙ্গীতে কাঁপছে।

সতর্ক সীমা প্রশ্ন করে, "কাজটা যে ব্যক্তিগত কারণে করা হয়েছে সে কথা কিভাবে বলা যাবে? স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যটা যেখানে রাজনৈতিক ?"

প্রসপার খুড়ো জানলার ধারে আঙুল দিয়ে বাজনা বাজানোর ভঙ্গীতে আঘাত করছিলেন। এখন টেবলে ফিরে এসে এক চুমুক পেরনদ খেলেন।

এইবার হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে তিনি বললেন, "এখন জার্মানরা সহযোগিতার ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। ওরা খানিকটা এক চোখ বুজিয়ে থাকতে চায়। তুমি একটা স্বীকারোক্তি করবে যে, ব্যক্তিগত কারণে মার সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি গ্যারাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।"

সীমার মনে হল কে যেন তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল—সব কিছু তার চোখে অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হল যেন চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই ঘোর অতি অল্পকালের মধ্যে কাটিয়ে উঠল সে—ঘন কুয়াশার মধ্যে যেন সে স্বকণ্ঠনিসৃত ধ্বনি শুনলো—"আমি কখনই এমন স্বীকারোক্তিতে সই করবো না।"

প্রসপার খুড়ো চমকে গেলেন। তাঁর এই অদ্ভুত প্রস্তাব যে সীমা সহজে মেনে নেবে তা ভাবেন নি তিনি। স্বল্পকাল নীরব থেকে তিনি বললেন! "আমি বুঝি,—আমি বেশ বুঝছি তুমি তোমার কাজের পুরো দায়িত্ব নিয়েছ—কিন্তু এটা জেনো যখন করেছিলে তখন এই কর্মের একটা অর্থ ছিল, তখন হয়ত ভেবেছিলে একটা ইন্দ্রজাল প্রভাবে আমরা বাঁচবো। হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাদের সৈন্যদল ওদের রুখতে পারবে। কিন্তু এখন 'আমিশটিস্' সই হয়েছে, শান্তিচুক্তির পর যুদ্ধ থেমে গেছে, কিন্তু এখনও যদি বারবার বলা হয় কাজটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তাহ'লে লাভটা হবে কার! এরকম একগুঁয়েমির ফলে সর্বনাশই ঘটবে। তোমাকে ত' জার্মানরা বন্দী করবে আর সেণ্ট মার্টিন বার্গেণ্ডীর অন্য যে কোনো জায়গার চাইতেও কঠোরভাবে শাসিত হবে। তোমার বন্ধু জাভিয়ের বাস্‌টিডও স্বীকার করবেন শুধু এই নির্বোধ কর্মটুকুর জন্যই আমাদের এই উৎপীড়ন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে খুড়ো আবার বলেন, "আমি স্বীকার করি, কিছু লোক অবশ্য তোমার এই কীর্তিটা অতি চমৎকার বলে স্বীকার করছে,

বিশেষ করে যাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। কিন্তু যাদের এর ফলে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে তারা অনেকেই রেগে আছে। তোমার কোনো ধারণা নেই মানুষের যখন পকেটে হাত পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়। এমন অনেকে আছেন যাঁদের ধারণা তোমার কুকীর্তির মূল্য তাঁদের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। আমি তোমাকে বলছি ওরা একথা বলতেও কুণ্ঠিত হবেনা যে জার্মানরা শান্তির কথা বলার পর তুমি এই অন্তর্ঘাতী কাণ্ডটা করেছ। অনেকেই প্লানকার্ড পরিবারের ওপর অসন্তুষ্ট, বিশেষ করে পীয়্যর প্লানকার্ডের মেয়ের উপর। মামজেল সীমা প্লানকার্ডের বিনিময়ে যদি জার্মানদের করুণা ক্রয় করা যায় তাহলে সেটা এমন কিছু উচ্চমূল্য হবে বলে তারা মনে করেন না। তোমার বিপদ এখন অনেক বেশী। স্যাটালিনকে আমরা সবাই চিনি, তিনি যে কি ধরনের লোক তা তুমি জানো। সময় থাকতে কাজ সেরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আর এক পাত্র পেরনদ ঢেলে নিলেন প্রসপার খুড়ো। তাঁর হাত মৃদু কম্পিত হতে থাকে, মুখভঙ্গী অতি গম্ভীর। তিনি বললেন, "আমি আমার নিজের কথা বলিনা, আমার নিজের ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে গেল সে কথাও আমি বলতে চাই না, আমার জীবনের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে গেল তোমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্য। জার্মানরা যে আমার ব্যবসা হস্তগত করেছে তা নয়, এখানকার স্থানীয় লোকজনের মধ্যে যাদের মতের দাম আছে তাদের কুনজরে পড়েছি আমি। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি—মা বলছেন জার্মানরা যতক্ষণ তোমাকে না ধরে ততক্ষণ চুপচাপ থাকতে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য তা করবো না; আমি স্যাটালিন এবং তার দলবর্তী সকলের সঙ্গেই লড়ব। আমার পীয়্যরের মেয়েকে সে অন্যায় করেছে বলে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারব না। বুদ্ধিমতীর মত এই স্বীকারোক্তিটি সই

করে দাও। এটা একটা আড়ম্বর মাত্র, এই কাজটি করলে স্টালিন জব্দ হবে।"

সীমা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে, "কি থাকবে এই স্বীকারোক্তিতে?"

খুড়ো তৎক্ষণাৎ লঘুভাবে বলেন: "আমি ত' আগেই বলেছি। তুমি ব্যক্তিগত কারণে এ কাজ করেছ। মার বকুনিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তুমি রাগের মাথায় আগুন ধরিয়েছ। যেন একটা ছেলেমানুষী বদ্ খেয়াল!"

সীমা উত্তেজিত হয়ে বলে, "এ সব কথা নিছক পাগলামী। পৃথিবীর কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।"

প্রসপার খুড়ো বললেন, "ঠিক কথা। সেণ্ট মার্টিনের কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু জার্মানেরা এখন সহযোগিতা চায়, তারা এই রকম একটা স্বীকারোক্তি পেলেই খুশি হবে।"

সীমা কয়েক মুহূর্ত ভেবে নেয়, তার পর শুধু বলল, "আমি এরকম কিছুই সই করতে পারব না।"

খুড়োর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে, তিনি বললেন, "তোমার শূয়ারের মত বুদ্ধি। তুমি যা করেছ তা মহৎ কর্ম, যতই আমার ক্ষতি হোক সে কথা আমি কোনোদিনই অস্বীকার করিনি। তবে তুমি যদি এখন ক্ষতি মেরামতের পথটা বন্ধ করে দাও তাহলে তোমার সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

সীমা তার চেয়ারে অবাধ্য ভঙ্গীতে বসে থাকে।

"আমি যদি সই করি তাহলে কি হবে? "জার্মান এবং স্টালিন কি আপনার ব্যবসা ফেরত দেবে?" প্রশ্ন করে সীমা।

খুড়ো এই সোজাসুজি প্রশ্নে একটু চমকে উঠেন, বলেন, "হয়ত দেবে। আর তোমার কিছুই হবে না। এ সব হল একটা নিছক আড়ম্বর মাত্র।"

"ওরা কোনো মামলা আনবেনা আমার নামে ?"

"এ সব ক্ষেত্রে যার ক্ষতি হয়েছে সে অভিযোগ করলে তবেই মামলা ওঠে। তোমার কি মনে হয় আমি তোমার নামে মামলা আনব ?"

সীমা আবার বলে—"আমার কিছু হবে না ?—জেল হবে না ?"

খুড়ো বললেন : "বললাম ত', অভিযোগ না করলে আবার মামলা কিসের। তোমার এই সন্দেহের কারণ বুঝিনা। আমার ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। তোমার জীবন বিপন্ন, আর তুমি বিনা সামান্য একটা স্বীকারোক্তি সই করতে ইতস্তত: করছ।"

সীমা ক্লান্ত,—এই তর্কের স্রোতে সে অতিশয় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার সারা মন বলছে খুড়োর প্রস্তাবটা স্বীকার করতে।

সীমা সমাহিত হয়ে ভাবে। খুড়োর আকৃতি ও যুক্তিজালে বিভ্রান্ত হয়ে আর সে হারাতে চায় না।

খুড়ো যেন ওর মনোভাব বুঝলেন। বললেন, "আমি তোমাকে আর পীড়াপীড়ি করব না। তুমি ভেবে দেখ। নিজের কথাটাই ভাবো।"

সীমা উঠে দাঁড়ায়। খুড়ো ওকে দাঁড় করিয়ে বলেন, "মার সামনে তোমার মুক্তির জন্য কি করা প্রয়োজন এসব আলোচনা আমি করতে চাইনা। আমি স্পষ্টই বলছি—মা প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন, পরে আমি তাঁকে বুঝিয়েছি। এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো গোপন কথা নেই। তুমি সবই জেনেছ। কি করে আত্মরক্ষা করতে হবে তুমি জানো। আমরাও তোমাকে সাহায্য করতে রাজী।" খুড়ো হেসে বললেন, "এখন থেকে আমরা একত্রে থাব।" তারপর ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, "যাও পোষাক বদলে নাও, একটু বুঝে স্বঝে কাজ করো।"

—ছয়—

মত পরিবর্তন

পরদিন অপরাহ্ন, সীমা ঘর পরিষ্কার করছিল, স্বভাব বিরুদ্ধ ভঙ্গীতে মাদাম ব্লু রুমে এসে হাজির।

তিনি এসে তার উইং চেয়ারে বসলেন। বেশ সোজা হয়ে মাথাটি হেলান দিয়ে বসলেন মাদাম, তাঁর চিবুক আরো গম্ভীর দেখাচ্ছে। সীমা নিঃশব্দে কাজ করছে, মাদাম নীরবে লক্ষ্য করছেন।

অবশেষে তিনি তাঁর মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, "গোড়া থেকেই মঁসিয়ে প্লানকার্ডের এই ভাবে সীমাকে জার্মানদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা তিনি পছন্দ করেন নি। মাদামের ইচ্ছানুসারে কাজ হ'লে সীমাকে তার অবাধ্যতার শাস্তি গ্রহণ করতেই হত। মঁসিয়ে প্লানকার্ড কিন্তু অদৃষ্টে যাই থাকুক সীমাকে বাঁচাবার জন্য বদ্ধ পরিকর। আর তিনিই যখন বাড়ির কর্তা, মাদাম শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। জার্মানদের কাছে যে ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথা বলার জন্য তোড়জোড় করা হচ্ছে তাঁর মত বৃদ্ধার সেই অভিনয়ে যোগ দেওয়া সহজ নয়। তবে বাড়ির একতা ভাঙতে বসেছে, পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী এ সবের কাছে ত' নতি-স্বীকার করতেই হবে।

সীমা ধূলা ঝাড়ে আর শুনে যায়। মাদামের কথায় ঘোর-প্যাঁচ নেই। তিনি সোজাসুজি বলে বসলেন জার্মানদের হাতে সীমাকে ধরে দিতে তিনি রাজী ছিলেন।

মাদাম বলছেন, মঁসিয়ে প্লানকার্ড সীমার জন্য এতই নীচু হয়েছেন যা কোনোদিন নিজের ব্যবসার খাতিরেও তিনি করেন নি। ফ্রেঞ্চেভিলের প্রিফেক্টের কাছে অনুনয় করেছেন, জার্মানদের কাছে

মাথা নীচু করেছেন। "আমার ছেলের কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে। কিন্তু সে সফল হয়েছে, তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

সীমা মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে একখণ্ড কাপড় দিয়ে মেঝে মুছছিল, মাদাম তাকে বললেন, "মেতর লেভাতুর আজ সন্ধ্যায় আসবেন। তোমার স্বীকারোক্তি তিনি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করবেন। আজ তোমার সেই কালো সিল্কের পোশাকটা পোরো। আজকের দিন তোমার কাছে অবিস্মরণীয়।"

সীমার স্বীকারোক্তি মেতর লেভাতুরকে দিয়ে স্বাক্ষী দেওয়ান হবে এত অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু কথাটা শোনার সঙ্গে সীমার দেহে শিহরণ খেলে যায়।

সারারাত ধরে সে ভেবেছে সইটা করবে কি করবেনা? পরিষ্কার যুক্তির মুখে খুড়োর কথাই ঠিক। এখন আমিসটিদের পর তার কৃতকর্মের বিষময় ফলভোগটুকুই বাকী আছে। আজকের দিনের হিসাবে ট্রাকগুলি নষ্ট করা নির্বোধের কাজ হয়েছে।

সীমার মন বলে—না-না আমি সই করবো না, কখনই সই করবো না। প্রকাশ্যে সে বলল, "আচ্ছা, মাদাম।" নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে ওঠে সীমা।

ওরা তিন জনে এক সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন সারে। খুড়োর তেমন ক্ষিধে নেই, তবে আজ উনি বড়ই মুখর হয়ে উঠেছেন। সকলের মনে যে প্রসঙ্গ প্রবল হয়ে আছে, সে প্রসঙ্গ উনি এড়িয়ে গেলেন। ব্লু-রুমে এসে তিনি সীমার সঙ্গে কথা বললেন। সীমা তখন পেয়ালায় কফি ঢালছে। খুড়ো বললেন, "মাথা সোজা করে থাকবে সীমা। আজ রাতের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর মনে হবে কিছুই যেন ঘটেনি।"

মাদাম বললেন, "কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে ত'?"

এবং ঘটনাটি সত্যই ঘটেছে -- সীমা গর্বভরে ভাবে অতি তিক্তভাবেই সব কথা চিন্তা করে।

তারপর ডিস ধোওয়া হয়ে যাবার পর, সীমা তার ঘরে গিয়ে পোশাক পরে নেয়।

তার ভঙ্গী শান্ত, কঠিন ও যান্ত্রিক। হাত মুখ ধুয়ে চুলগুলি ঠিক করে নিল সীমা—তারপর সেই কালো সিল্কের পোশাকটি পরলো। পোশাকটি এতদিনে ছোট হয়ে এসেছে।

আধঘণ্টা পরে। প্রসপার খুড়োর পাঠকক্ষে সবাই এসে বসেছে, মেতর লেভাতুর ডেস্কে বসে আছেন—তার সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছেন মাদাম, প্রসপার খুড়ো আর সীমা।

বিরাট ডেস্ক। তার ওপর কাঠের পটভূমিতে টনের হাসপাতালের মূর্তির অনুসরণে 'বেরিয়াল অব ক্রাইস্ট' মূর্তিটি রাখা রয়েছে, ছবিটিতে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তার পাশেই ডেস্কে পড়ে রয়েছে চিঠি খোলার জন্য একটা মস্ত হাতির দাঁতের ছুরি। আর তার পাশে মেতর লেভাতুরের ব্রীফ কেস।

মেতর লেভাতুর সুইভেল চেয়ারে গড়াচ্ছেন। পা দুটো একত্রে জড়ো করা। মোটা সোটা বেঁটে মানুষটি। সব কিছুই বেশ মসৃণ, ভদ্র আর পরিচ্ছন্ন। পাতলা ধূসর রঙের সুটটা গায়ে টাইট হয়ে বসেছে। অতি দ্রুত অথচ ভদ্র ভঙ্গীতে কথা বলেন। তাঁর অনামিকার উজ্জ্বল পাথরের আঙটিটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

মেতর লেভাতুর বললেন, "সোজাসুজি কি তাহলে কাজের কথা পাড়ব?" তারপর নিজের ব্রীফকেসটা খুলে পড়তে শুরু করেন—মনরোপো ভবনের অধিবাসী "মাদাম ক্যাথেরিন প্লানকার্ড আর মঁসিয়ে প্রসপার প্লানকার্ডের উপস্থিতিতে, ঐ বাড়ির অপর বাসিন্দা মামসেল

সীমা প্লানকার্ড নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি করছি। আমি স্বেচ্ছায়, খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে স্বীকার করছি যে ১৯৪০-এর ১৭ই জুন প্রসপার প্লানকার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্যবসায়ে স্বহস্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। আমার এই দুষ্কৃতির কারণ মাদামের কয়েকটি কথা আমার মনে আঘাত হয়ে বাজে এবং তার সমালোচনা আমার অন্যায় বলে মনে হয়েছে। সুতরাং অন্য কোনো পথ না ভাবতে পেরে আমার মানসিক ক্লেশের এই ভাবেই প্রতিবাদ করেছি। আমার বিশ্বাস ছিল এই ভাবেই আমি মাদামের বিশেষ ক্ষতি করতে পারব। এই বিবৃতি পড়ে সই করলাম।"

অত্যন্ত দ্রুত পড়ে গেলেন মেতর লেভাতুর। সীমা দেখে তাঁর গোল মুখ, ছোট দাঁত,—সেই মুখ থেকে নিসৃত হচ্ছে স্পষ্ট এবং চোস্ত বাণী। তাঁর সেই চকচকে সাদা মুখের ডান দিকের কোণের ছোট আঁচিলটা লক্ষ্য করে সীমা। লোকটিকে সীমার এমন খারাপ লাগছিল যে তার মুখ নির্গত কথাগুলি বুঝতে তার কিছুক্ষণ সময় লাগল। টেবিলের ওপরকার সব জিনিসগুলি স্পষ্ট এবং নিখুঁতভাবে দেখতে পায় সীমা, - এমন কি ব্রীফ কেসের চামড়ার গন্ধটাও যেন ওর নাকে লেগে রইল, কোনোদিন আর গন্ধটা ভুলবেনা সে।

মেতর লেভাতুরের কথা শেষ হল—ঘরে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। তারপর প্রশ্ন করে সীমা। আইনজীবি মেতর লেভাতুরের পালিশ করা দ্রুত কণ্ঠস্বরের পর তার কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকমের শান্ত মনে হল। "মেতর লেভাতুর, আপনি কি এই সব বিশ্বাস করেন? যা এই মাত্র পড়ে শোনালেন সে সব বিশ্বাস করেন?"

মেতর লেভাতুর কোনো জবাব দিলেন না। শুধু ভঙ্গীহীন চতুর চোখে সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন! তাঁর বদলে কথা বলেন মাদাম, প্রসপার খুড়োর দিকে না তাকিয়েই বললেন, "দেখছেন ত' ও

আমাদের এতটুকু সাহায্য করতে দিতে চায়না।" মেতর লেভাতুর কিন্তু যেন কেউই কিছু বলেনি এমন ভঙ্গী করে তাঁর সেই আঙটি শোভিত আঙুলটি তুলে দলিলের একটি বিশেষ অংশ দেখালেন। অতি নম্রভাবে শুধু বললেন, "মামসেল এই জায়গাটা,—এইখানে সই করতে হবে, অবশ্য যদি তোমার সেই ইচ্ছা থাকে।"

সীমা সেই আঙটি শোভিত আঙুল আর দলিলের ফাঁকা জায়গা-টুকুর দিকে তাকায়। মেতর লেভাতুরের কথা,—গত রজনীতে উচ্চারিত প্রসপার খুড়োর কথা তার কানে বাজে। সীমা জানে ওরা চায় ওই জায়গাটুকুতে সে নামটুকু সই করে দেয়। হয়ত তাতে অনেকের স্থবিধে হবে। সীমার মনের একাংশ রাজী হতে চায়, সামনে যে কলমটা পড়ে আছে সেটা তুলে নিতে বাসনা হয়। সাদা জায়গাটায় নামটুকু লিখতে ইচ্ছা করে—কিন্তু তার আর একটা অংশ, যে অংশ গভীর ও গহন সে সকল শক্তিতে বাধা দেয়। সীমার মনে হয় এসব যেন সে আর একবার সয়েছে—এই দ্বন্দের সম্মুখীন হয়েছে। আঙুল, দলিলের সাদা অংশ, সই করার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা।

সমাহিত হতে অনেক চেষ্টা করতে হয়। এই আচ্ছন্নভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে সীমা। ঐ চকচকে আঙটিটা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সে অতি মৃদু ভাবে মাথা নাড়ায়, যেন কিছু একটা ঝেড়ে ফেলতে চায়। প্রসপার খুড়োর মুখের দিকে সে তাকায়,—তার চোখ যেন ওঁকে আঁকড়ে ধরেছে, ওর চোখের ভাব ক্রমশঃই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। খুড়োর মুখের দিকে কোমল চোখে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে,—"প্রসপার খুড়ো; আমি কি তাহলে সই করবো?"

এইবার খুড়ো তাকিয়ে দেখলেন। মাথা তুলে তাঁর বড় বড় ধূসর নীল চোখ মেলে সীমার দিকে তাকালেন। আরো জরুরী আবেদন জানায় সীমা, "তাহলে সই করবো কি খুড়ো মশাই?"

মেতর লেভাতুর অনুদ্বিগ্নমনে সোজা তাকিয়ে রইলেন, মুখে বেশ ভদ্রভাব। মনে মনে ভাবছেন এখনও এই নিয়ে কথাকাটাকাটি চলছে। ভিলা মনরোপায় কষ্ট করে আসার পূর্বে অন্ততঃ ওরা এসব ঠিক করে রাখতে পারত। মাদাম তাঁর পুত্রের দিকে তাকালেন, চোখের কোনে সপ্রশ্ন দৃষ্টি, তাতে উৎসাহের আভাস আছে সেই সঙ্গে আবার কি কিঞ্চিৎ ঘৃণাও মেশানো আছে।

খুড়োর মুখ দিয়ে অতি সামান্য কি কথা বেরোল। সে কথার অর্থ হাঁ হয় আবার নাও হয়। যা শুনতে চাও তাই মনে হতে পারে। এই তাঁর একমাত্র উত্তর।

অতঃপর সীমা সই করল!

সেই রাতে নিজের ঘরটির নির্জনে সীমা অনুতাপ করে—

সই করা তার উচিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে লড়েছে—কিন্তু অবশেষে শেষ চেষ্টায় যেখানে শুধুমাত্র একবার না বলার প্রয়োজন ছিল সেখানে সে পরাজিত।

প্রসপার খুড়ো, তার আর সব ব্যবসায়ী সহযোগীদের একত্র করে নিলেও সীমা যা করেছে তার অর্থ ও মূল্য মুছে ফেলা যাবেনা। শুধু সে স্বয়ং নির্বোধের মত সই করে সব মুছে দিয়েছে।

তার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম সে দু পায়ে দলেছে, নষ্ট করেছে, মুছে দিয়েছে। প্রসপার খুড়োর ক্লিষ্ট, উদ্বিগ্ন মুখের সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি সে সইতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েছে সীমা—আর নিজের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে।

সব কিছু ভণ্ডুল করে বসেছে। জীবনটা নষ্ট করেছে। এই সই করার পর সে কিভাবে বাঁচবে? শুধু আপনাকে নয়, তার স্বর্গীয় পিতৃদেবকেও অস্বীকার করেছে সীমা।

কি করবে সে এখন? উপদেশ দেওয়ারও কেউ নেই। একমাত্র যে মানুষটি উপকার করতে চেয়েছিল, তাকেও সে তাড়িয়ে দিয়েছে, ভিলা মনরোপার প্রতি মিথ্যা কৃতজ্ঞতা বোধের ফলে এই নির্বোধের মত কাজ করেছে সীমা।

একই চিন্তা বার বার করতে পারেনা সীমা। সে শেষটায় পাগল হয়ে যাবে।

—শোক ও দুঃখের এই মুহ্যমান অবস্থা থেকে আপনাকে মুক্ত করে আবার তার সেই প্রিয় গ্রন্থগুলি তুলে নেয় সীমা।

আবার সেই বইগুলি সীমার মনের সংশয় অশেষ করুণাভরে কাটিয়ে দেয়। জোনের জীবনের ঘটনার মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে নেয় সীমা, নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা ভুলে যায়। জোন অব আর্কের স্মৃতির কি দুর্দশা ঘটেছিল—তার মৃত্যুর পর যে সব নর-নারীর সঙ্গে তাঁর জীবনের সম্পর্ক তাদের কি হয়েছিল পড়ে যায় সীমা। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পড়ে সীমা—যে সব বন্ধুরা জোনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যারা তাকে ত্যাগ করেছিল, যে সব শক্ররা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল—তারা বেশী সুখ ভোগ করতে পারে নি।

সীমা সেই কাহিনী-গ্রন্থে পড়ে ঈশ্বরের বিচারে যে বিচারকরা নিরাপরাধ জোনকে শাস্তি দিয়েছিল, এই পৃথিবীতেই তাদের সর্বনাশ হয়েছে।

সীমা পড়ল—উত্তর কালে জোনের খ্যাতি দিন দিন বাড়তে থাকে। রাষ্ট্র তার সম্মানার্থে স্মারক বক্তৃতা ও বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসৌধ রচনা করলেন। চার্চ প্রার্থনা এবং অবশেষে সিদ্ধ রমণী ঘোষণা করে তাকে সম্মানিত করলেন। সীমা পড়ল—"ফরাসী জাতি—অবিস্মরণীয় খ্যাতি সম্পন্ন বহু নর-নারীর জন্মদান করেছে—তাদের মধ্যে আছেন সৈনিক, রাষ্ট্রবিদ, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী আর কবির দল। কিন্তু ফরাসীদের

মনের গভীরে স্পষ্ট হয়ে বিরাজ করেন দুজন—ন্যাপোলিয় বোনাপার্ট আর জোন অব আর্ক।"

সীমা বোঝে সেও জানে কথাটা সত্য।

সীমা হাসে,—জোনও তার উক্তি প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু প্রবঞ্চিত দুর্ভাগা নারীর সেই ত্রুটী কেউ স্মরণে রাখেনি। যা আছে তা তাঁর মহৎ কর্ম। তাঁর কাজ হয়ে গেছে, কীর্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কোনো কলমের আঁচড়, মোহরাঙ্কিত কাগজ সে মহৎ কীর্তি মুছে দিতে পারবে না।

বই পড়ে সীমা ভালো করেছে, তার ভয় কেটে গেছে। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তার কাজ রইলো—মেতর লেভাতুরের দলিলে সই করলেও তার কর্ম কেউ মুছতে পারবেনা। কাগজ প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যাবে।

ভয় পেয়েছে সে। একটা সংশয়ে পড়েছে এমন কি এ কথাও মনে করতে হয়েছে যে তার কাজটা ঠিক হয়নি। তার কাজ ঠিকই হয়েছে—যুক্তিতেও ঠিক হয়েছে। তার কর্মের একটা অর্থ আছে। সেই সময়ে তখনও যুদ্ধ চলছে। একটা আশা ছিল আমরা জিতব। সীমা যা করেছে দু হাজার পরিবার যদি তাই করত, শত্রুর কাজে লাগতে পারে এমন সব কিছুই যদি ধ্বংস করত তাহলে ফ্রান্সের পতন ঘটতো না।

আর ফ্রান্সের এখনও পতন হয়নি। আজ পর্যন্ত নয়। বিশ্বাসঘাতকরা যে সন্ধিপত্র সই করেছে তার কোনো মূল্য নেই। যুদ্ধ চলছে। মরিস লোকটার বিচার শক্তি আছে। আশা আছে না জানলে ও কিছুতেই আলজিয়ার্সে পালাত না। সব সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতক নন। এখনও কিছু লোক যুদ্ধে যাচ্ছে। যুদ্ধ চলছে তাই সীমার কাজেরও মানে আছে।

তার এই আত্মোপলব্ধি দেরীতে হয়নি। সে এইভাবে মরিসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বড় ভুল করেছে। সে প্রসপার খুড়োকে সুযোগ দিয়েছে ওর মনটাকে বিগড়ে দেওয়ার। বিগত দশ বছর ধরেই সে এই সুযোগ দিয়ে আসছে। এখন কিন্তু সে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

মরিসের সঙ্গে সে যখন যায়নি তখন একাই যেতে হবে। অনধিকৃত অঞ্চলের পথ খুঁজে নিতে হবে—সম্ভব হলে এলজিয়ার্স। এখনই যেতে হবে তাকে। অপরে এই নির্বোধ দলিলের সুযোগ নেওয়ার আগেই তাকে যেতে হবে।

সীমা উঠে দাঁড়ায়—অতি লঘু পদক্ষেপ। এবারেও সেই আগেকার মত পোশাক। দু' চারটে পোশাক সঙ্গে নিল। সেই ভারী জুতা পায়ে। দোর পর্যন্ত চলে গিয়েও সীমা ফিরে এসে দেরাজ থেকে সোনালি জলে বাঁধানো ছোট বইটি তুলে নেয়। তারপর গতবারের মত এবারও খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল। এবার আর মরিস নেই। নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে। অন্ধকার রান্নাঘরে গিয়ে সংসারের কয়েকটি টাকাও সে সঙ্গে নিল। গুণে দেখল তেমন বেশী নয়। তারপর হলঘর দিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা খুললো—অল্প আওয়াজ হল।

আকাশে ম্লান চাঁদ। তেমন অন্ধকার নেই। সীমা এতটুকু ভীত নয়। পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ে সীমা—। পিছনে কি রেখে গেল ভাবেনা সীমা, সামনের কথাই ভাবে।

সীমা চলে গেল।

সাত

"গ্রে হাউস"

পরদিন সন্ধ্যায় বাসে চড়ে নেভারসে এসে পৌছতেই সীমাকে গ্রেপ্তার করা হল। একটা পুলিসের গাড়িতে করে তাকে ক্রেঙ্কেভিলে নিয়ে এল।

ক্রেঙ্কেভিলের সশস্ত্র পুলিস (জেনডার্মে), গ্রাগুলুই ওর ভার নিলেন। বাক-সংযম করে আছেন তিনি; সীমা যখন প্রশ্ন করল কার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিনি তার জবাব এড়িয়ে গেলেন। তবে তার ভঙ্গী বেশ ভদ্র,—এই দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লেশ লাঘবের তিনি চেষ্টা করলেন।

সেন্ট মার্টিনে সশস্ত্র পুলিস গ্রাগুলুই সীমাকে ডেপুটি প্রিফেক্টের নিয়ে গেল। সীমার পুরাতন বন্ধু, সেই দরোয়ান, সীমাকে দেখে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে, তাকে সসম্ভ্রমে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর দরোয়ান, সশস্ত্র পুলিস আর সীমা তিনজনে মিলে রেকর্ড রুমে পৌছল। সশস্ত্র পুলিশ বেচারী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। দরোয়ন প্রশ্ন করল সীমার জন্য কিছু খাদ্য বা পানীয় আনবে কিনা। গ্রাগুলুই বলল চ্যাটিলোতে আমরা খেয়েছি। তারপর কি খাওয়া হয়েছে তার হিসাব দেয়। ঘরের ভিতরের এই জটিল পরিস্থিতিটা কাটাবার জন্যই এই চেষ্টা। দরোয়ান বলল সব সময়ই খাওয়া যেতে পারে। সীমা তাকে নম্রভাবে ধন্যবাদ জানালো। সে বলল—আর কিছুই খেতে চাইনা, আমাকে একটু একটা থাকতে দিন। সশস্ত্র পুলিসটি দরোয়ানের মুখের দিকে তাকায়। তারপর মনস্থির করে বলে—"আচ্ছা মামসেল।" উভয়ে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করল না।

রেকর্ড রুমে বসে রইল সীমা। এখানকার সব কিছুই ভালো

ভাবে জানে। একটা বড় টেবল রয়েছে, আর আছে কয়েকটা চামড়া ছেঁড়া চেয়ার। চতুর্দিকের সেলফে অসংখ্য নথিপত্র। একটা বুককেসে অনেকগুলি বাঁধান বাৎসরিক রেকর্ড রয়েছে। পেরী বাসটিডের হাতে হলদে চামড়ায় বাঁধান, তার ওপর লাল পট্টি।

বাতাস ঠাণ্ডা বটে তবে গুমোট আছে। ভারী দরজার জন্ত গোলমাল শোনা যায়না। সীমা হেলান দিয়ে বসে চোখটা বুজিয়ে থাকে।

সীমা শান্ত হয়ে বসে আছে। মনে মনে সে কোনোদিন ভাবেনি তার এই পলায়ন সার্থক হবে। মরিসের মত সে চালাক চতুর নয়। কোনো রকম সাবধানতা অবলম্বন করেনি সীমা। সীমা আশা করেছিল মাদাম হয়ত টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ করে তার খবর ছড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এই পলায়নটুকু তার কর্তব্যের মধ্যে।

সে তার কর্তব্য করেছে, আর ঠিকই করেছে। তার এই নিষ্ফলা পলায়নে মাদামের সুবিধে হয়েছে। সীমা কিন্তু কিছুতেই হাল ছাড়বেনা। সীমা বেঁচে থাকবে, মরিস আর তার মত যারা চতুর তাদের প্রচেষ্টা যতকাল সার্থক না হচ্ছে, ততকাল সে বেঁচে থাকবে।

চুপ করে বসে চিন্তা করেছে সীমা। মসিয়ে জাভিয়ের ভেতরে এলেন। তিনি অবশ্য চেষ্টা করছেন গম্ভীর হওয়ার, কিন্তু সে বোঝে কি মানসিক কষ্ট তিনি ভোগ করছেন। সে প্রশ্ন করল, "আমি কি বোকার মত কাজ করেছি মঁসিয়ে জাভিয়ের ?" একজন মিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে সীমা খুশি হয়েছে। মসিয়ের বাদামী চোখ অতি করুণ হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, "তোমার কাজ তুমি ভালোই করেছ সীমা। আমরা যারা পীয়্যর প্রানকার্ডের বন্ধু তারা সবাই তোমার এই কাজে গর্বিত। যদি কিছু খারাপ ঘটে থাকে, দোষ আমাদের। আমাদের আরো আগে, আরো বেশী কাজ করা উচিত ছিল।"

কিছুক্ষণ পরে সীমা কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আমার কি খুব কঠোর শাস্তি হবে? ম'সিয়ে জাভিয়ের পুনরায় বললেন, "খুব সহজ হবেনা। কঠোরই হবে।"

সীমা তার কাঁধ দুটি ওঠাল, আবার প্রশ্ন করল, "আমি কি করব বলতে পারেন?" ম'সিয়ে জাভিয়ের বললেন, "বেশী চালাকী করতে যেওনা, বা কূটনীতি চালিও না। যা তোমার মন বলবে তাই তুমি বলবে। যাই তুমি বলোনা কেন তোমার অবস্থার কিছু ভালো হবেনা, আর এর চেয়ে মন্দও হবেনা। আমাদের কর্তব্য তোমাকে সাহায্য করা—এখন যা অবস্থা আমরা তা পারছি না। কিন্তু যখন সময় আসবে করবো, এ কথা নিশ্চিত জেনো।" অনেকটা বাপের মত কথা বলেন ম'সিয়ে জাভিয়ের। সীমা হাসে—তবে ওঁর কথাগুলি মনে সান্ত্বনা আনে।

কথার সুর বদলিয়ে তিনি আবার বলেন, "কিন্তু কিছু খাও সীমা, শুনলাম কিছুই খেতে চাইছ না। একটু বুঝে চল। সামনে দুটি ঘণ্টা পড়ে আছে, বড় বিশ্রী সময়।" ম'সিয়ে উদাসীনভাবে ঘুরতে থাকেন, আর ক্ষুধা না থাকলেও সীমা বিনীত ভাবে কিছু খায়।

ম'সিয়ে কার্ডলিয়র এলেন—সীমা উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করতেই বললেন, "আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়োনা মা। খেয়ে নাও। বড়ই খারাপ সব ব্যাপার।" এই কথা বলে চেয়ারে বসে পড়লেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ পরে বললেন, "তুমি বেশ সাহসী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাদের পীয়্যর প্লানকার্ডের মেয়ে বটে। এটা একটা আনন্দের বিষয়। তারপর ম'সিয়ে জাভিয়েরের পানে তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "হয়ত আজকের দিনে এভাবে মামজেল প্লানকার্ডের সঙ্গে একত্রে থাকাটা ঠিক নয়।" তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মসিয়ে জাভিয়ের বললেন, "না, ম'সিয়ে লে সুস প্রিফেক্ট, মোটেই নয়।" ডেপুটি

প্রিফেক্ট উঠে চলে গেলেন কিন্তু সেইভাবে বসে রইলেন মঁসিয়ে জাভিয়ের।

কয়েক মিনিট পরে পুরাতন বেলিফ জিন্ন আর সশ্রস্ত প্রহরী গ্রাগুলুই ঘরে এল। বেলিফ বলল, "মঁসিয়ে জাভিয়ের, আপনাকে ডাকছে ওখানে। আপনাকেও ওরা ডাকছে মামসেল।" সীমা তৎক্ষণাৎ বাধ্যভাবে উঠে দাঁড়াল—মঁসিয়ে জাভিয়ের কিন্তু বললেন, "আরো কিছু খেয়ে নাও সীমা, তাড়াতাড়ি কি! তুমি না গেলে ত' আর আরম্ভই হবে না। আমরা একত্রেই যাবো।"

অতি পরিচিত অলিন্দ ঘুরে মঁসিয়ে জাভিয়ের, সীমা, বেলিফ আর সেই সশ্রস্ত প্রহরী চললো। সবাই যখন পাশের ঘরে ঢুকলো তখন সকলেই নীরব। চীফক্লার্ক মঁসিয়ে দেলারবর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বলে, "কেমন আছেন মামসেল সীমা?"

মঁসিয়ে কার্ডলিয়রের অফিসের জানলায় ঢাকা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা। কয়েকটি সুন্দর চেয়ার এই ঘরে আনা হয়েছে, সবুজ বনাত ঢাকা টেবলের চারপাশে সেগুলি রাখা হয়েছে। টেবলের ওপর কিছু সাদা কাগজ আর পেনসিল রয়েছে। এক জাগ জল, তার পাশে কয়েটি গ্লাস। যেন একটা কনফারেন্স হবে এখনই।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে মাদাম, প্রসপার খুড়ো, মার্কুই, আর মেতর লেভাতুর রয়েছেন। সীমা ঘরে ঢুকতে কেউ কোনো কথা বললেন না। বেলিফ জিন্ন তখনই চলে গেল, সশ্রস্ত্র প্রহরীটি রইল। মঁসিয়ে কার্ডলিয়র বললেন, "তোমাকে আর এখন দরকার নেই গ্রাগুলুই।"

সীমা শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো ঘরের চারপাশে ঘুরে গেল।

ডেপুটি প্রিফেক্ট তার নির্দিষ্ট আসনে বসে পেনসিলটা নাড়ছেন আর

ঘোলা চোখটা বুঁজে আছেন। অবশেষে বললেন, "বসো সীমা! বসুন, আপনারা সবাই।" তিনি যেন একটু নার্ভাস হয়েছেন। সবাই বসলো।

তারপর কয়েকবার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মঁসিয়ে কার্ডিনিয়র বললেন. "প্রসপার, সীমা প্লানকার্ডের অভিভাবক হিসাবে তুমি কি ?" কথাটি অসমাপ্ত রয়ে গেল, তিনি আবার পেনসিল নিয়ে খেলা করতে থাকেন।

প্রসপার খুড়ো গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। বললেন, "আমার পক্ষে মোটেই এ.ব সহজ কথা নয়। অতি কঠোর।" সীমার শান্ত মুখের প্রতি খুড়োর দৃষ্টি পড়ে, খুড়ো চুপ করে গেলেন।

মার্কুই আবার বলতে শুরু করলেন, "ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা জানেন মঁসিয়ে কার্ডিনিয়রের অনুরোধে আর জার্মান কর্তৃপক্ষের হুকুমে আমি এইখানে আছি। আমি জানি আপনাদের পক্ষে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা বেদনাদায়ক। কিন্তু যদি এই অবস্থার মীমাংসা না হয় তাহলে এখানকার অবস্থা অতি শোচনীয় হবে। আপনারা আমাদের সকলের স্বার্থে একটু বিবেচনা করে কথা বলবেন।"

চতুর্দিকে একটা বিহ্বল স্তব্ধতা। সবাই মঁসিয়ে প্লানকার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর মৃদু গলায় মাদাম বলতে শুরু করলেন, "আমার ছেলে যখন সব কথা বলতে পারছেন না, তখন আমিই বলি। আমরা সবাই জানি আমার সপত্নী পুত্র পীয়ারের এই মেয়েটির দুষ্কর্মের জন্য আমাদের কি কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। আমাদের যাঁরা স্বদেশবাসী এবং সেই সঙ্গে জার্মানদেরও ধারণা যে এই আগুন লাগানোর পিছনে কিঞ্চিৎ দেশপ্রাণতা আছে। আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলাম কাজটা ঠিক ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য হয়নি। তবু আমরা মেয়েটির এই

রোমান্টিক দেশপ্রাণতার কথাটাই বলেছি, আর আমি এবং আমার ছেলে অন্য কোনো রকম মতলবের কথা বলিনি এতদিন। আমার কিন্তু সন্দেহ ছিল। আমি এই মেয়েটিকে বেশ চিনি। দশ বছর ধরে ওকে আমি মানুষ করার চেষ্টা করছি, ওর দুরন্ত, দুর্বিনীত আচরণকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সফল হইনি। দুঃখের বিষয় এই ঘটনায়—নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে ওর যে কাজ সবাই দেশ-প্রাণতা বলে ধরে নিয়েছে তা ওর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের এক ঘৃণ্য প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

মাদাম থামলেন। বেশ মৃদু গলায় কথা বলছিলেন তিনি। সবাই চুপ করে বসে আছে। সেই ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। মাদাম আবার বলতে শুরু করলেন…"তারপর আমরা বুঝলাম এই একটি মেয়ের দুষ্কৃতির জন্য আরো সারা দেশবাসী কষ্ট পাচ্ছে। মঁসিয়ে প্লানকার্ড আর আমি এক কঠিন সমস্যায় পড়লাম। আমরা জানি একটা ভুল বোঝা-বুঝির ফলে জার্মানরা আমাদের ব্যবসার প্রতি অমন একটা ব্যবস্থা করেছে। সেই ভুল ধারণাটা দূর করা কি আমাদের কর্তব্য নয়। কিন্তু সে কার্য করতে গেলে আমার স্বামীর এই নাতনীটিকে ধরে দিতে হয়—তার অপরাধের জন্য অভিযোগ করতে হয়।"

আবার থামলেন মাদাম—জলের গ্লাসটা খুঁজছেন, ভদ্রভাবে মঁসিয়ে কার্ডলিয়র জল ঢেলে দিলেন। দু'এক চুমুক জল খেলেন, সবাই সেদিকে তাকিয়ে রইল।

"কিন্তু আমার ছেলের মাথায় একটা মতলব এল, সে ফ্রেঞ্চেভিলে সব কথা স্পষ্টভাবে প্রিফেক্টকে জানালো। প্রিফেক্টের চেষ্টায় জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা হয়েছে। জার্মান কর্তৃপক্ষ প্লানকার্ড পরিবারের এই কলঙ্ক প্রকাশ্যে জানাজানি হোক তা চান না। তাঁরা চান আমরা অপরাধীর সাজা দিই। এই কাজটুকু হলেই জার্মানরা

সমগ্র অঞ্চলে যে সব কঠোর বিধি-নিষেধ রেখেছেন তা তুলে নেবেন।"
মাদাম অধিকতর কোমল গলায় বললেন—"আমার ছেলে তবু তার ভাইঝিটিকে এভাবে ধরিয়ে দিতে চায়নি। কয়েক রাত্রি অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। আমার ছেলে আমাদের এই ধারণাটা প্রকাশ করে সাধারণে জানতে দিতে রাজী ন'ন।"

ঘরে অখণ্ড স্তব্ধতা। শুধু মাদামের নিঃশ্বাস শোনা যায় আর একটা মক্ষিকার গুঞ্জন। কাঁচের জানলায় বারবার ধাক্কা খেয়ে গুন্ গুন্ করছে।

মাদাম বলে চলেছেন—"ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটেছে তার ফলেই ম'সিয়ে প্লানকার্ডকে সীমা সম্পর্কিত ধারণা বদলাতে হয়েছে। সীমাকে সে নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছে, আদর দিয়েছে, পারীতে নিয়ে গেছে, ওর সব খেয়াল মিটিয়েছে। সবুজ পাজামা চেয়েছিল তাও দিয়েছে। আর বিনিময়ে সীমা আগে একবার ওর বসবার ঘর থেকে অফিসের চাবি চুরি করেছে—আর এই দ্বিতীয়বার গৃহস্থালী টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এই শয়তান মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সমগ্র ডিপার্টমেণ্ট আমরা নষ্ট করতে চাইনা। তাই ফিলিপে এই মেয়েটিকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। যদি কোনো এজেহার বা সই সাবুদ করতে হয়, আমরা রাজী আছি।"

মাদামের কথা শেষ হল। এমনভাবে এই মিথ্যা তিনি পরিবেশন করলেন যে সবাই যেন নতুন কিছু শুনছে এই ভাবে শুনে গেল। কি প্রহসন যে হবে সবাই অথচ গোড়া থেকেই জানত।

সীমা উঠে দাঁড়াল নোংরা, রোগা মুখ,—অত্যন্ত শান্ত সমাহিত তার ভঙ্গী—পরাজিত সীমা মুখ খোলে। এই নাবালিকার ওপর মাদামের আক্রোশ গোড়া থেকেই অসমান। সীমা যাই বলুক তার অদৃষ্টের পরিবর্তন নেই। সে তা জানে—সবাই জানে। তবু সীমার কথা শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে।

সীমা শুধু বলল, "আমি এ কাজ শুধু জার্মানদের জন্যই করেছি। সবাই তা জানে। সারা সেণ্ট মার্টিন জানে।"

সহজ কথা। নতুন কিছু নেই। মাদামের অভিযোগের জবাব নেই। কিন্তু সীমার মুখই মাদামের কথার জবাব। তরুণীর সেই মুখে অভিযোগ আর তিরস্কার পরিস্ফুট। সীমার কথায় মাদাম অচঞ্চল। মাদামের মুখের হাসি শুধু দেখা যায়, তিনি বললেন– "তাহলে আমি কি মিথ্যাবাদী?" যেন পাগলের সঙ্গে কথা বলছেন এমনই মৃদু গলার স্বর। এই সুরের জবাবে হঁ্যা বলাও শক্ত।

সীমা বলল, "হঁ্যা।"

শান্ত "হঁ্যা"—উদ্ধত নয় বরং ভদ্র জবাব। এর মধ্যে সত্য রয়েছে, তাই মাদামের অভিযোগ যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

শান্ত গলার এই 'হঁ্যা' এমনই জোরালো যে মাদাম হতভম্ব হয়ে গেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বেশ সপ্রতিভ ছিলেন। পৈশাচিক সপ্রতিভতা। এইবার তিনি চালে ভুল করলেন। বললেন —"আপনারা নিশ্চয়ই এই মেয়েটির পলায়নই যে তার অপরাধের সম্যক প্রমাণ তা স্বীকার করবেন। ঐখানে দেশপ্রেমিকা সেজে দাঁড়িয়ে আছে অথচ পালাবার সময় শুধু টাকা নয় অপর একজনের জিনিস নিয়ে যেতেও লজ্জা হয়নি।"

সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে মাদাম বললেন, "একটা চেয়ে আনা বই নিয়ে ও পালিয়েছে।"

এই কথায় সীমা হাসল। মঁসিয়ে জাভিয়েরের দিকে তাকিয়ে বলল, "মাদাম, পীয়্যর বাসটিড যে বইটা আমাকে দিয়েছিলেন তারকথা বলছেন।"

মঁসিয়ে জাভিয়ের আর থাকতে পারলেন না, লাফিয়ে উঠে বললেন, "আমার বাবা সীমাকে স্নেহ করেন। তাঁর বই সীমার নিজের বলে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে।"

মাদাম বললেন, "কিন্তু পীয়্যর বাসটিড একদিন বইটা চাইতে এসেছিল।"

মঁসিয়ে জাভিয়ের বললেন··"আমি বলছি মাদাম, আমার বাবা একথা শুনে খুশিই হবেন। তার বন্ধুর মেয়ের শিক্ষার জন্য কিছু করা তিনি কর্তব্য মনে করেন। ভদ্রমহোদয়গণ বইখানা কোনো হালকা বই নয়। জোন অব আর্ক সংক্রান্ত বই। কি মাদাম আমার ভুল হয়নি ত?"

এই প্রথম রেগে ফেটে পড়লেন মাদাম,—সকলে দেখল ওঁর চোখের ঘৃণার অভিব্যক্তি। মাদাম বললেন, "সবাই জানেন, মঁসিয়ে বাসটিড এই মেয়েটির মাথা খেয়েছেন। ভয়ঙ্কর কথা, অদ্ভুত আইডিয়া সব এই বাচ্চা মেয়ের মাথায় উনিই ঢুকিয়েছেন। তবে আমাদের কোনো রাগ নেই, তাঁর অনেক বয়স হয়েছে।"

বইটার কথা উল্লেখ না করলেই মাদাম ভালো করতেন। এখন ডেপুটি প্রিফেক্টও মুখ খুললেন। বললেন, "আমি ত' বুঝে পাইনা মামজেল যদি একটা দেশাত্মবোধক বই সঙ্গে নিয়ে থাকেন ত' কি হয়েছে! ও কথা ছেড়ে দেওয়া যাক।"

মেতর লেভাতুর একটু এগিয়ে এসে বললেন, "মাফ করবেন, কিন্তু এই সমস্ত আলোচনাটাই নিরর্থক। আমার কাছে মামজেল সীমা প্লানকার্ডের সই করা দলিল আছে।" এই বলে তিনি ব্রীফ কেস থেকে দলিল বার করলেন।

লোকটির কণ্ঠস্বরে সীমা জ্বলে ওঠে। এতক্ষণ সে শান্ত ছিল এইবার সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে—"ওটা কিছুই নয়, সইটা মামুলী ব্যাপার। ওটা জার্মানদের জন্য। এরা সবাই জানেন—"

আইনজীবি লেভাতুর বাধা দিয়ে বললেন, "মামজেল আমাকে সবটা পড়তে দাও। "মাদাম ক্যাথেরিন প্লানকার্ডের উপস্থিতিতে··· আমি স্বেচ্ছায় খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে স্বীকার করছি···"

মেতর লেভাতুর পড়ে গেলেন সবটা, কিছুই বাড়িয়ে বলেননি কিছু বাদ দেন নি। কিন্তু প্রতিটি কথার যেন পৈশাচিক অর্থ।

সীমা বলল, "কিন্তু প্রসপার খুড়ো যে আমাকে বলেছিলেন এটা একটা।"…

মাদাম বাধা দিয়ে বলেন, "মেতর লেভাতুর, সীমা স্বেচ্ছায় এই স্বীকারোক্তি করেছে ত?"

"ও প্রশ্ন ওঠেই না মাদাম—।" বললেন মেতর লেভাতুর। "আমি নিজে সই করে সীল দিয়েছি। স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি বই কি!"

এতক্ষণে সীমা তার অসহায় অবস্থার কথা বোঝে। সে একটা ফাঁদে পড়েছে। সে বলে ওঠে, "কাকা তুমি যে বলেছিলে এসব কিছু নয়—একটা পোশাকি ব্যাপার মাত্র। তুমি কথা দিয়েছিলে…"

প্রসপার খুড়ো চুপ করে বসে রইলেন। যেন ভেঙে পড়েছেন। সীমার দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন না। সীমা অস্বাভাবিক রকমের শান্ত।

মঁসিয়ে জাভিয়ের বললেন, "সীমা বলতে চায় ওকে ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে এই স্বীকারোক্তি সই করানো হয়েছে।"

মঁসিয়ে কার্ডলিয়ার তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীর কথায় কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, "মামজেল প্লানকার্ড তোমাকে কি ভুলিয়ে সই করানো হয়েছে?"

সে উত্তর দেওয়ার আগেই প্রসপার খুড়ো সোজাসুজি সীমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "সীমা আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি কোনো অভিযোগ আনবোনা, আমি তা আনিনি। মাও আনেন নি। এটা আদালতের বিচার নয়, সম্পূর্ণ শাসনগত ব্যাপার।" শান্ত হয়ে বসে তিনি মঁসিয়ে কার্ডলিয়রকে বললেন, "ফিলিপে তুমি একটু বরং বুঝিয়ে বলোনা ব্যাপারটি কি? ওকে বুঝিয়ে দিন ওর জন্য সমস্ত

ডিপার্টমেণ্ট বিপন্ন। আজকের দিনে সবাইকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।"

মসিয়ে কার্ডলিয়র মঁসিয়ে জাভিয়েরের উক্তিতে সাহসী হয়ে রীতিমত সরকারী ভঙ্গী নিয়ে বললেন, "আমি জানতে চাই মামজেল সীমা প্লানকার্ড তোমাকে কি ভঁওতা দিয়ে এই দলিল সই করানো হয়েছে ? তোমার উত্তরে অনেক কিছু নির্ভর করে, বেশ করে ভেবে জবাব দাও।"

মঁসিয়ে জাভিয়েরের উক্তিতে কিঞ্চিৎ সাহসী হয়ে মঁসিয়ে কার্ডলিয়র পুনরায় সরকারী ভঙ্গীতে বললেন, "আমি আবার তোমাকে প্রশ্ন করছি মামজেল প্লানকার্ড, তোমাকে কি কোনোরকম কৌশল করে এই বিবৃতি সই করানো হয়েছিল, তোমার জবাবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে ! ভালো করে বিবেচনা করে জবাব দাও।"

মার্কুইস সহসা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, "মঁসিয়ে লে স্যুস্ প্রিফেক্ট, আপনি যে কি বলতে চান বুঝিনা। বাকী আলোচনায় আমার পক্ষে অংশ গ্রহণ না করাই দেখছি ভালো। আমাদের জার্মান অতিথিরা এই ভাবে একটা লিখিত দলিলের সম্পর্কে এতখানি সন্দেহ প্রকাশ করলে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন। রীতিমত স্বাক্ষরযুক্ত দলিল সম্পর্কে স্বাক্ষরকারিণীকে বলা হচ্ছে প্রত্যাহার করতে। তার অর্থ দাঁড়াবে যে একটা সামান্য ব্যক্তিগত ব্যাপারকে রাজনৈতিক আকার দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

ডেপুটি প্রিফেক্টের মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি তিরস্কারের সুরে বললেন, "মঁসিয়ে লে মার্কুইস —"

ইতিমধ্যে জাভিয়ের সীমার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত কোমল এবং অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন : "সীমা, ওরা কি তোমায় মিথ্যা কথা এবং কৌশল করে সই করিয়ে নিয়েছে ? জবাব দাও ! এটা

জেনো তুমি হাঁ বা না বললে তোমার অবস্থা আরো ভালো বা মন্দ হবেনা। তবু তুমি বলো।”

সীমার পরণে সেই কুঁকড়ে যাওয়া ব্লাউজ আর সেই নীল পাজামা। সে বসে আছে চুপ করে। শান্ত সমাহিত ভঙ্গী। ওরা এখন সত্য কথা বলতে বলছে, ওরাই আবার মিথ্যা বলতেও অনুরোধ করেছে। কিন্তু সত্য কোথায়!

তৎক্ষণাৎ সত্যের সন্ধান পায় সীমা। আবেগ ও বাসনার কুয়াশায় যা ঢাকা ছিল সেই কুয়াশা ছিন্ন হয়েছে। অতীত ঘটনা সহসা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে স্পষ্ট ও নির্মলভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তরুণী ও উদ্দাম সীমা সহসা সেই ঘরের আর সকলের চাইতেও জ্ঞানদীপ্ত হয়ে উঠল।

অবাক বিস্ময়ে চতুর্দিকে অনৃতভাষণের যে জাল রচিত হয়েছে, বেদনার্ত দৃষ্টিতে তার কথা ভাবে সীমা। এই ঘরের সমস্ত কর্ম ও আচরণে ঘিরে আছে সেই মিথ্যাচার। চার পাশের এই জালিয়াতি শুধু তাকে প্রবঞ্চিত করেনি, প্রবঞ্চিত করেছে সমগ্র ফ্রান্সকে, ফ্রান্সের জনসাধারণকে।

সীমা সেই অতলে নামে যার মধ্যে নিহিত রয়েছে চিরন্তন সত্য। দিন নেই, সময় নেই—কালের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে সীমা। তার জীবন আর বিপ্লবী-নায়িকা জোন-অব-আর্কের জীবনধারা একই মহাতীর্থে এসে মিলেছে! সেখানে ওরা এক হয়ে মিশেছে। যে-মিথ্যাভাষণের জালে আজ সে জড়িয়ে পড়েছে, আর পাঁচশো বছর আগে যে জালে জড়িয়ে পড়েছিল জোন অব আর্ক—তা এক এবং অভিন্ন, চিরন্তন।

সীমা গ্রহণ করলো তার অকরুণ ভাগ্যকে, সে জানে এরও প্রয়োজন আছে। সে কঠোর এবং কঠিন হবে স্থির করলো, সে প্রতিহত করবে ওদের এই ঘৃণ্য অভিযান। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় অদৃষ্টকে সে গ্রহণ

করলো তিক্ত মনে। তার মুখে বেদনার ছাপ এমনই স্পষ্ট যে তার মুখটি বিকৃত হয়ে উঠেছে, বয়স যেন সহসা অনেক বেড়ে গেছে। মঁসিয়ে জাভিয়ের তাঁর বেদনা ও বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলেন না, তাঁর মুখ থেকে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারিত হল।

এই শব্দ সীমার আচ্ছন্ন ভাব কাটলো। এক মুহূর্ত আগে তাকে সকলের চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছে—এখন সে শুধু সীমা প্লানকার্ড, সামান্য ষোলো বছরের মেয়ে। প্রসপার খুড়োর মুখের দিকে তাকায় সীমা - খুড়োর চোখ সীমার মুখের দিকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে, যেন কুকুরের চোখ—তিনি কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

হাঁ বা না, সত্য বা মিথ্যা যাই কিছু বলুক না সে তার ভাগ্য পরিবর্তিত হবেনা, মঁসিয়ে জাভিয়ের সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু সীমা বোঝে প্রসপার খুড়োর অদৃষ্টের পরিবর্তন কিন্তু তার কথার ওপরই নির্ভরশীল। এক মুহূর্ত আগেও, উপলব্ধির সেই অপূর্ব মুহূর্তে সীমা হয়ত তাঁকে ক্ষমা করতে পারত, এখন কিন্তু আর ঐ ঘৃণিত মানুষটির ওপর এতটুকু মমতা নেই।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে—"ওরা কি প্রলোভন দেখিয়ে কৌশলে সই করিয়ে নিয়েছে?" সীমা দৃঢ় কণ্ঠে বলে—"হাঁ।" প্রসপার খুড়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে সীমা বলল—"উনি বলেছিলেন এটা একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র, কথা দিয়েছিলেন আমার কিছুই হবেনা।"

প্রসপার খুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে রুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু আমি তোমাকে ত' বারবার বলেছি, এটা বিচার নয়, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়নি। এটা একটা শাসনগত ব্যাপার মাত্র।"

সীমা চেঁচিয়ে বলে—"ওরা আমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না, ঐ কাগজের কথা একবিন্দুও সত্য নয়। সবাই তা জানে। আপনি মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফেক্ট প্রসপার খুড়োকে 'লোডিং ইয়ার্ড' ধ্বংস করতে

বলেছিলেন, প্রসপার খুড়ো তা করতে রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু যথা-কালে কিছুই হল না, তারপর একদম শেষ মুহূর্তে, আমিই সে কাজ করি, কারণ নইলে কেউ সে কাজটুকু করত না। আপনারা সকলে তা জানেন, সারা সেণ্ট মার্টিনের লোক জানে।"

মেতর লেভাতুর সেই দলিলটা দেখালেন, "এই তোমার লিখিত স্বীকারোক্তি—এ কিন্তু অন্য কথাই বলে।" শান্তগলায় শেষ করলেন তিনি কথাটা।

মার্কুইস মঁসিয়ে কার্ডলিয়রের দিকে শ্লেষের ভঙ্গীতে তাকালেন, বললেন, "মঁসিয়ে লে সুস্ প্রিফেক্ট, আপনার চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ আপনার ধৈর্য।"

এই কথায় সোজা হয়ে বসলেন ডেপুটি প্রিফেক্ট—একটা কিছু চূড়ান্ত উক্তি করবার উপক্রম করছেন কিন্তু পারলেন না, আবার অবশভাবে বসে পড়লেন সকলের মুখের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকালেন, টেবলের সবুজ বনাতের ওপর বড় পেনসিলটা নিয়ে খানিকটা বাজালেন। তাঁর এই অসহায়ত্বের ভঙ্গীতে সীমার মনে হল একটা ভয়ানক কিছু আছে তার অদৃষ্টে। সে দৃঢ় গলায় বলল, "আপনারা এইবার শেষ করবেন কি! বলুন আমাকে নিয়ে আপনারা কি করতে চান?" তারপর খুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল—"কাকা! ওরা আমাকে নিয়ে কি করবে?'

ক্ষণিক স্তব্ধতা—তারপর মঁসিয়ে জাভিয়ের বললেন: "ওরা তোমাকে গ্রে হাউসে (শিশু অপরাধীদের কারাগার) পাঠাবে, সীমা।"

এই কথাটিতে সকলের চোখে ভেসে উঠল—'গ্রে হাউসের' ছবি। ফ্রেঞ্চেভিলের সেই সংশোধনী কারাগার। কিছুকাল আগে, আবার এই মাত্র বছর দুই আগে গ্রে হাউস নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারাবাসী ছেলে-মেয়েদের ভয়ঙ্করভাবে উৎপীড়ন

করা হয়, ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হয়। তাই নিয়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এমন কি চেম্বার অফ ডেপুটিতে এই নিয়ে বিতর্ক হয়। গ্রে হাউসের ছবি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, অত্যাচারিত কিশোর কিশোরীদের ছবিও ছাপা হয়েছিল। এখন এই কথাটিতে উৎপীড়িত অত্যাচারিত ছেলেমেয়েদের ছবি সকলের মানসপটে ভেসে উঠল।

তৎক্ষণাৎ কিন্তু একটা তীব্র চীৎকারে সকলে আবার সেই ঘরটিতে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করলেন, সীমা চেঁচিয়ে উঠেছে, শিশুর মত মর্মভেদী আর্তনাদ।

ম'সিয়ে জাভিয়েরের মুখে সংবাদটুকু শুনে, সীমা অতি অল্প কালে মাত্র শব্দটুকু ধরতে পারলো। উপস্থিত সকলের চোখও কি বিব্রত, ও বিশ্রী ভঙ্গীতে তার দিকে ফিরল দেখল সীমা। প্রসপার খুড়োর মুখ দেখা গেলনা, তিনি মাথা নীচু করে বসে আছেন, শুধু কপালের ওপরকার চুলগুলি দেখা যাচ্ছে। পর মুহূর্তেই ম'সিয়ে জাভিয়েরের কথার অর্থ ধরতে পারলো সীমা, সেই সঙ্গে তার কল্পনা প্রবণ মনে ভেসে উঠল 'গ্রে হাউসের' নিষ্ঠুর পৈশাচিক ছবি। গ্রে হাউসের বারান্দায় তার দুর্ভাগা অধিবাসীদের সঙ্গে সেও যেন দাঁড়িয়ে আছে—তারও মুখ যেন ভীত, চকিত, মৃত। আতঙ্ক ও ভয়ে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে,—তার সম্মুখে পড়ে আছে অনাগত কালের অন্ধকার দিন। তার সমস্ত আত্ম সংযম ভয়ের প্রাবল্যে ভেসে গেছে। তাই সে শিশুর মত মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠেছে।

সে চেঁচিয়ে বলে—'না – না, তা হ'তে পারে না। সেণ্ট মার্টিনের মানুষ যা চেয়েছিল আমি তাই করেছি, একথা কি সত্য নয়? আমাকে গ্রে হাউসে পাঠানোর অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা! না—না গ্রে হাউস নয়!"

তার এই আর্তনাদ পাশের ঘরে গিয়ে পৌঁছেচে, কে একজন ভয়

পেয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছে। বাইরের লোক সব চতুর্দিক থেকে আশ-পাশে ভিড় করে ছুটে এসেছে কান্নার আওয়াজ শুনে!

পরিচিত, অপরিচিত সবাইকে লক্ষ্য করে সীমা, সে চীৎকার করে তাদের উদ্দেশ্যে বলে—"এঁরা আমাকে বন্দী করছেন (গ্রে হাউসে)। আমি পেট্রল আর ট্রাক পুড়িয়েছি এই আমার অপরাধ। জার্মানদের সেইসব জিনিসে হাত দিতে দিইনি সেই অপরাধে আমাকে গ্রে হাউসে যেতে হবে। এই দুষ্টু লোকটি—"প্রসপার খুড়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—এই দুষ্টু লোকটি আমাকে কথা দিয়েছিলেন তোমাদের সকলের ভালো হবে আর আমারও কোনো ক্ষতি হবেনা। এখন সে সব কথা ঘুরিয়ে আমাকে গ্রে হাউসে বন্দী করছে। তোমরা তা হ'তে দিওনা। ওদের তা করতে দিওনা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সীমা।

মাদাম তার ঠাণ্ডা গলায় মসিয়ে কার্ডলিয়রকে বললেন, "শেষ করে ফেলনা ফিলিপে।" অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গীতে বুকের ওপর গোঁজা ফুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "অন্ততঃ কেউ একজন দরজাটা বন্ধ করে দাও না"—একজন পরিচারক তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

চেয়ারে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সীমা। তবে বেশীক্ষণ নয়। তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। তার কৃতকর্মকে সে অর্থহীন হ'তে দেবেনা। সে যাবে "গ্রে হাউসে"—বরণ করে নেবে সব কিছু অশুভকে। এই প্রতিজ্ঞায় তার শক্তি সহসা বেড়ে যায়। সে তা অনুভব করে। একবার সিনেমায় দেখেছিল একটা সামান্য বীজ দেখতে দেখতে পত্র পুষ্প শোভিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল, সীমার শক্তিও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ মাত্র বেড়ে গেল।

নোঙরা রুমালদিয়ে মুখ মুছল সীমা। বেশ শান্ত সংযত কণ্ঠে সে

বলে ওঠে—"আমি জার্মানদের জন্য এই কাজ করেছি। আমি জার্মান বিরোধী তাই আমাকে তোমরা বন্দী করেছ, তোমরা জানাতে চাওনা যে একাজ জার্মান বিরোধী। ওরা কিছুতেই আমাকে হত্যা করতে দেবেনা। সেণ্ট মার্টিনের কেউ তাতে রাজী হবে না। সারা ফ্রান্সের লোক রাজী হবে না। আমি বার বার বলছি—একথা সত্য নয়, সত্য নয়। আমি মাদামের ওপর রাগ করে কিছু করিনি, করেছি জার্মানদের জন্য।"

সীমা যখন এই সব বলে চলেছে তখন বিবেচক মঁসিয়ে জাভিয়ের তাঁর জীবনের অবিবেচকতম কাজ করে বসলেন। রাগে ফুলে তিনি ধীর সংযত পদক্ষেপে যে দরজাটি সবে মাত্র বন্ধ করা হয়েছিল সেটি আবার খুলে দিলেন। বাইরে তখন অনেক লোক অপেক্ষা করে আছে। অনেক লোক বেড়ে গেছে।

দোরের কাছে এগিয়ে গেল সীমা কেউ তাকে বাধা দিলনা। যারা বাইরে দাঁড়িয়েছিল তারা চুপ করে আছে। সীমা তাদের বলল, "তোমরা সবাই জেনে যাও, আমি জার্মানদের জন্যই ট্রাকে আগুন দিয়েছি।"

মার্ক্‌ইস মৃদু মাথা নেড়ে মঁসিয়ে জাভিয়েরকে বললেন: "আমি ত ভাবিনি মঁসিয়ে, যে আপনার মত একজন প্রবীণ লোক, এই ছেলে মানুষীতে ভুলে চাকরিটা খোয়াতে পারেন।"

মঁসিয়ে জাভিয়ের তার দিকে তাকালেন না, কোনো উত্তরও দিলেন না। ডেপুটি প্রিফেক্টের ইঙ্গিতে সশস্ত্র প্রহরী গ্রাণ্ডলুইকে ডাকলেন, তারপর বললেন—"এইবার আমাদের কাজ শেষ করতে হয়, আর সীমা! আমি একটা যন্ত্র মাত্র, তুমি আমার অপরাধ নিও না।"

ধীর অথচ অনিশ্চিত পদক্ষেপে প্রহরী গ্রাণ্ড লুই সীমার দিকে এগিয়ে এল। সীমা তাকে বলল—"এক মিনিট মঁসিয়ে—" উপস্থিত সকলের

দিকে তাকায় সীমা,—একে একে সকলকে দেখে। স্তাটালিনের দন্তভরা মুখ, মসৃণ অথচ ধূর্ত মঁসিয়ে লেভাতুরের মুখ—মাদামের স্থূল আকৃতি। ডেপুটি প্রিফেক্টের উদাস মুখ ভঙ্গীর প্রতি নজর করে সীমা। মেতর লেভাতুর অত্যন্ত উদাসীন মাদাম কিন্তু সোজাসুজি সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন সবশেষে সীমা খুড়োর মুখে তাকায়—তাঁর মাথা নীচু করা রয়েছে দেখা যায় না। সীমা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, "প্রসপার খুড়ো, আপনি অতি দুষ্টলোক, ভালো মানুষ নন।" তারপর নিঃশব্দে সশস্ত্র প্রহরীকে অনুসরণ করে।

আর একবার পালেস নইরেটের পরিচিত প্রাঙ্গণ পার হয় সীমা। গ্রাগুলুই বলে, "মামসেল, আমরা বরং পিছনের দোর দিয়ে যাই—সামনে বড় ভিড।"

কিন্তু দরোয়ান গম্ভীর গলায় বলে উঠল…"সেখানেও বড কম ভিড় নেই। সামনের দরজা দিয়েই যাও, গাড়ি সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"

সেও সদর দরজা পযন্ত ওদের সঙ্গে এল। বড় দরজাটা সাধারণতঃ বন্ধ থাকে, পাশের ছোট দোর দিয়েই যাতায়াত করে—হাজার বার সীমা এই ছোট দোর দিয়ে আসা যাওয়া করেছে। আজ কিন্তু মহা-ড়ম্বরে দরোয়ান বড় গেটটি হাট করে খুলে দিল।

ধূসর প্রাঙ্গণটিতে সূর্যালোক এসেছে—সামনের পার্কটি জনতায় ভরে আছে। সাদা ও বাদামী মুখের বিরাট সমুদ্র যেন। বাইরে ফিস ফিস করে কথা বলছিল, গ্রাগুলুইএর সঙ্গে সীমাকে আসতে দেখে সবাই থেমে গেল।

যেখানে গাড়িটা রয়েছে সেখানে যেতে হলে পার্কের একাঞ্চল অতিক্রম করে যেতে হয়। কালো—বন্ধ গাড়ি। সবাই তার ভিতর [illegible] করে দেয়। সবায়ের মাথা খালি—যাদের মাথায় টুপি ছিল তারা টুপি খুলে হাতে করে নিয়েছে।

সীমা জেলের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, পিছনে চলেছে তারই দুচারটি জিনিস নিয়ে গ্রাণ্ড লুই।

একজন বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওকে থামিয়ে দেয়— সে পেরী বাস্টিড। পাকা চুলের ভিতর উজ্জল মুখটি কাঁপছে— সীমার অতি কাছে এগিয়ে এল বাসটিড। বিশ্রী ভঙ্গীতে মোড়কে বাঁধা একটি বই ওর হাতে তুলে দেয় বাসটিড "এই নাও মা। বিদায়।" সীমা বল্‌ল—"বিদায় পেরী বাস্টিড্।"

গাড়ির কাছে পৌঁছল সীমা।—দূর থেকে এক কুৎসিত স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায়।

সীমা ঘুরে দাঁড়ায়। শেষবার সেই সূর্যালোক মণ্ডিত যেন অঞ্জলি ভরে পান করে। দেখে পালেস নাইরেটের বিশাল সৌধ, আর সেই জনতার মুখ। সীমা দাঁড়িয়ে আছে, গ্রাণ্ড লুই জিনিসপত্রগুলি সীমার হাতে তুলে দেয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত যারা নীরব ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সহসা সেই জনতা অচল হয়ে উঠল। তাকে অভিনন্দিত করে শূন্যে সহস্র হাত আন্দোলিত হয়,—মেয়েরা সবাই কাঁদছে—তাকে লক্ষ্য করে সবাই ধ্বনি করে - "বিদায়—সীমা, বিদায়—সীমা প্লানকার্ড! সাবধানে থেকো —আমরা তোমাকে ভুলবোনা। আমরা তোমাকে নিয়ে আসব।"

সীমার সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়—"বন্ধুগণ! বিদায়! আজ আমি অগ্নি-পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবই। আমি পীয়্যর প্লানকার্ডের উপযুক্ত মেয়ে হিসাবেই পরিচিত থাকতে চাই।"

সীমা ভয় পায়নি,—আত্মোপলব্ধিজনিত দৃঢ়তা তার অন্তরে দিয়েছে প্রচণ্ড সাহস ও বাহুতে দিয়েছে অসীম শক্তি।

বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে গাড়িতে গিয়ে উঠল সীমা, সেই কুৎসিত

স্ত্রীলোকটা—ভেতরে বসে আছে। একটা বিশ্রী আওয়াজ করে গাড়িটা ছাড়ল।

প্রতীক্ষাভরা অন্ধকারের অনন্ত নৈঃশব্দে, ডুবে রইল সীমা। তার কানে দৃঢ়তার জয়ধ্বনি বাজছে। সীমার মনে জেগেছে নূতন আশা, নূতন আশ্বাস—

গ্রে হাউসের কষ্ট সহ করতে পারবে সীমা এই তার বিশ্বাস।